



# (সমালোচনা-সংগ্রহ)

তৃতীয় সংস্করণ  
( তৃতীয় মুদ্রণ )



০৪০০৮৮  
২৩/৪/৬৪  
১০৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪৮



Reprint—1589 B.T.—December, 1945—A.

BCU 1328

148955

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY NISHITCHANDRA SEN,  
SUPERINTENDENT (OFFG.), CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,  
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1641 B.T.—September, 1948—E.



# শুচী

## সাহিত্য-প্রসঙ্গ

বিষয়	প্রকাশ-কাল	লেখক	পত্রাঙ্ক
সম্পাদকের মন্তব্য			১/০
গীতিকাব্য	১২৮০	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
পলাশির যুদ্ধ	১২৮২	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	৪
প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি	১২৮৯	অজ্ঞাত	১৫
দশমহাবিদ্যা	১২৮৯	অজ্ঞাত	২৩
সমালোচনা ও সমালোচক	১২৯০	ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৩৮
সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি	১২৯৩	ঐ	৪৭
রাজসিংহ	১৩০০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১
মানসী	১৩০০	প্রিয়নাথ সেন	৫৭
প্রাচীন সাহিত্যালোচনা	১৩০১	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৭০
মহাকাব্যের লক্ষণ	১৩০৯	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৭৭
সাহিত্য সমালোচনা	১৩১০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৮
কথা সাহিত্য	১৩১৫	দীনেশচন্দ্র সেন	৯৪
নাট্যকার	১৩১৭	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১০৪
নাটক	১৩১৮	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১০৭
কবিতার কষ্টিপাথর	১৩২২	বিপিনচন্দ্র পাল	১১১
বাঙ্গালার গীতিকবিতা	১৩২৩	চিত্তরঞ্জন দাশ	১১৬
আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে “মা”	১৩২৩	জিতেন্দ্রলাল বসু	১২৫
সাহিত্যে “রূপান্তর”	১৩২৪	বিপিনচন্দ্র পাল	১৩৩

## কবি-প্রসঙ্গ

রামপ্রসাদ	১২৮২	পূর্ণ চন্দ্র বসু	১৪১
দীনবন্ধু মিত্র	১২৮৩	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৪৭
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১২৯২	ঐ	১৫৪
জয়দেব	১২৯৩	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	১৭০



বিষয়	প্রকাশ-কাল	লেখক	পত্রাঙ্ক
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস	১২৯৬	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭৭
প্যারীচাঁদ মিত্র	১২৯৯	বন্ধিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৫
বন্ধিনচন্দ্র	১৩০০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯
বিহারীলাল	১৩০১	ঐ	১৯৯
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	১৩০১	রমেশচন্দ্র দত্ত	২১০
নবীনচন্দ্র	১৩১৫	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৩
কবি হেমচন্দ্র	১৩১৯	ঐ	২২৮
মহাকবি মধুসূদন	১৩২৩	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	২৩৭
কৃতিবাস	১৩২৩	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	২৪২

[ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধ ব্যতীত সমুদয় প্রবন্ধের স্বত্বাধিকারিগণের অনুমতিক্রমে প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইল। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্বত্বাধিকারিগণের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞ। ]



## সম্পাদকের মন্তব্য

বাঙ্গাল। সমালোচন-সাহিত্যের বয়স তেমন বেশী না হইলেও সাহিত্য-সমালোচনা ইহার জন্ম-ইতিহাস-সম্বন্ধে একটি ব্রাস্ত মতের প্রচলন দেখা যায়। 'ভবানীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে' মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার 'অভিভাষণে'র একস্থানে বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে বঙ্গদর্শনে বাংলাতে সাহিত্য-সমালোচনার পথ দেখাইয়া দেন। তাঁর পূর্ব সাহিত্য-সমালোচনা কাকে বলে, বাংলায় কেহ জানিত বলিয়া বোধ হয় না।" শুধু বিপিনচন্দ্রের নহে, আরও অনেকের রচনায় এইরূপ মন্তব্য পরিদৃষ্ট হয়। বিপিন বাবুর পূর্ব, পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ ও তাঁহার 'বঙ্কিমবাবু ও উদ্ভটচরিত'-শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রকার মতই প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, এই প্রচলিত মতকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।

ইউরোপীয় সাহিত্য-সমালোচনার অনুকরণে বাঙ্গাল। সমালোচনার যে স্রষ্টি হইয়াছে, এ কথা অবশ্য অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু সে স্রষ্টির সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শনে করিয়াছিলেন, এমন কথা বলিলে ভুল হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে যে সমালোচন-প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ। তাঁহারই হাতে পড়িয়া এ জিনিষটার যে সবিশেষ উৎকর্ষ-লাভ ঘটে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'-নামক মাসিক পত্রে।

এই কাগজখানি বঙ্গদর্শন-প্রকাশের প্রায় একুশ বৎসর পূর্ব প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিদ্যাগাগর, প্যারীচাঁদ, রামনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতি বহু বিখ্যাত গ্রন্থকারের বহু গ্রন্থের সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সব সমালোচনা কে বা কাহার লিখিতেন, তাহা এখন নিশ্চিতরূপে বলা স্ককঠিন। তবে দেখিতে পাই, নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ সালে তাঁহার 'মহাস্থ'-নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনিই বিবিধার্থ-সংগ্রহে ইহার (সমালোচনার) প্রথম পথ-প্রদর্শন করেন।" এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কালীপ্রসন্নকেই বঙ্গসাহিত্যের আদি সমালোচক বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। আমরা অবশ্য এ কথায় অবিশ্বাস করিবার তেমন কোনও কারণ দেখি না।

রাজেন্দ্রলালের পর কালীপ্রসন্নই বিবিধার্থ-সংগ্রহের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে এই কাগজের 'ভূমিকা'য় তিনি রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহে





প্রকাশিত সমালোচনার উদ্দেশ্যে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে যেন ঐ উক্তিই ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছিলেন, “বিবিধার্থ” নিয়ত শুদ্ধ সাধনপন্থার হিতচেষ্টায় বিবৃত ছিল; মনেও কখন কাহার নিন্দা বা সম্পদ-স্বলভ সম্মান-লোভে ধর্মীর উপাসনা করে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন গ্রন্থের সমালোচন-সময়ে কখন কখন কোন কোন গ্রন্থকারের উপরে কটাক্ষের আভাস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভাষ্যমাত্র; তাহাতে কেবল গ্রন্থই উদ্দেশ্য, কদাপি কোন গ্রন্থকারের নিন্দা অভিধেয় হয় নাই। তাহা পরিশুদ্ধ সরল-হৃদয়-সম্মত, তাহাতে দোষ বা রোষের লেশও লক্ষিত হয় না; বরং ভারতবর্ষীয় বর্তমান গ্রন্থকারকুলের কল্যাণ-সাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

—এই লেখাটুকুর মধ্যে আশ্চর্য্যত কৈফিয়তেরই একটু আভাস নাই কি?

বিবিধার্থ সংগ্রহের আরও একটি কৃতিত্বের কথা এখানে স্মরণযোগ্য। যে ‘সমালোচনা’-শব্দ আজকাল আমাদের একটি ঘরোয়া কথার মতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে শব্দটিও বিবিধার্থ-সংগ্রহের স্রষ্টি। ইহার পূর্বে এ শব্দের ব্যবহার আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আধুনিক কোনও কোনও লেখক এ শব্দের প্রতি প্রশংসা করেন। ‘সম্’ ও ‘আ’ এই দুই উপসর্গের একই প্রকার অর্থ ভাবিয়া তাঁহারা সংস্কৃত ‘আলোচনা’-শব্দের পূর্বে ‘সম্’ উপসর্গের সংযোগকে অসম্মত বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন, ইংরাজী Criticism শব্দের প্রতিবাক্য-হিসাবে ‘আলোচনা’ ও ‘সমালোচনা’ এই দুই শব্দের মধ্যে যদি কোনটিকে রাখিতে হয়, তবে ‘সম্’কে বাদ দিয়া ‘আলোচনা’কে রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। আমাদের কিন্তু অন্যরূপ ধারণা। মনে হয়, পণ্ডিতেরা ‘নিরুক্তি’র ‘সমানুয়ঃ’ ও ‘সমানুতঃ’ শব্দ দুইটির যে ভাবে অর্থ করিয়া থাকেন, সেই ভাবে ‘সমালোচনা’ শব্দটিকে যদি আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, উহার ‘সম্’ ও ‘আ’ এই দুই উপসর্গেরই স্বীকৃতিমত সঙ্গতি, সার্থকতা ও উপযোগিতা আছে। সমালোচনা অর্থে ‘সম্’ অর্থাৎ সম্যক্, ‘আ’ অর্থাৎ পরিপাকীর সহিত এবং ‘লোচন’ অর্থাৎ দৃষ্টি। সুতরাং বলিতে হয়, ইংরাজী ‘Criticism’ শব্দের প্রতিবাক্য-হিসাবে যিনি এই শব্দের স্রষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শব্দ-গঠন-শক্তি প্রশংসনীয়; এবং এই জন্যই বোধ হয়, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি সেকালের পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখকেরা এই শব্দটিকে গ্রহণ করিতে বিমুগ্ধ হইয়া সঙ্কোচবোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ঐ শব্দের বহুল ব্যবহার আছে বলিলে যথেষ্ট হইবে না—‘সমালোচনা’ নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থও আমরা দেখিয়াছি। এই সকল-গ্রন্থে তাঁহার রচিত ‘সাহিত্য-সমালোচনা’ ও ঠাকুরদাসের লিখিত ‘সমালোচনা ও সমালোচক’ নামে যে দুইটি প্রবন্ধ আছে, তাহাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং সাহিত্য-সংসারে এই শব্দ যখন এমন ভাবে চলিয়া গিয়াছে, তখন ইহা ঠিক হউক আর না হউক, ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে কেহ তাহা শুনিবে না। আমরাও শুনি নাই। তাই এই সংগ্রহ-পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে সমালোচনা-সংগ্রহ।



বিবিধার্থ-সংগ্রহ যে সমালোচনা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, সেই পদ্ধতি-অনুসারে বাঙ্গালা-গ্রন্থের সমালোচনা পরে 'রহস্য সন্দর্ভ,' 'সর্বার্থ সংগ্রহ,' ঢাকার 'মিত্র প্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় সমানে সতেজে চলিয়াছিল। তারপর বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়। এই বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম-কৃত সমালোচনার উদ্দেশ্যে এত লেখক এত প্রশংসার কথা কহিয়াছেন যে, এখানে আমাদের আর কিছু না বলিলেও চলে। তবে প্রসঙ্গক্রমে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই আদর্শের অনুসরণে সে-সময়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখক উহার পুষ্টি-সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার অল্প কাল পরেই, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখা দেন। বলা বাহুল্য যে, অনতিবিলম্বেই তাঁহার সমালোচনা-নৈপুণ্যের যশঃ-সৌরভ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের পর, বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচনা-সাহিত্যের নূতন রূপের প্রবর্তক-হিসাবে যদি কাহারও নাম করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার নামই অবশ্য-করণীয়।

এই সংগ্রহ-পুস্তকে বিষয়-হিসাবে 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' ও 'কবি-প্রসঙ্গ' নামে দুইটি বিভাগ করা হইয়াছে। 'কবি-প্রসঙ্গে' বাঁহাদের কথা আছে, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র জয়দেব ব্যতীত আর সকলেই বঙ্গ-ভাষার কবি। জয়দেব বাঙ্গালী কবি হইলেও তাঁহার কাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগিতে পারে যে, উক্ত প্রসঙ্গ-মধ্যে জয়দেব প্রবেশ-লাভ করিলেন কেন?

এই 'কেন'রই একটু উত্তর এখানে দিতেছি। বাঙ্গালা-গীতি-কবিতার আদি উৎস নিরূপণ করিতে গিয়া আমাদের দেশের বড় বড় লেখকগণের মধ্যে কেহ বৌদ্ধ দৌহার, আর কেহ বা সুরদাস প্রভৃতির হিন্দী কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয়, চণ্ডীদাসাদি কবিগণ 'জয়দেবের ভাষা, জয়দেবের ছন্দ, জয়দেবের পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি ও সঙ্গীত-রীতি'র নিকট যেক্রপ ঋণী, তেনন আর কাহারও নিকট নহেন। এই কথাটাই 'জয়দেব'-প্রবন্ধে অতি পরিপাটীর সহিত বুঝাইয়া বলা হইয়াছে।

আসল কথা, কলেজের ছাত্রগণ বঙ্গসাহিত্য-সম্বন্ধে যাহাতে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য ও তথ্য জানিতে পারেন, যাহাতে সাহিত্য-বিষয়ে তাঁহাদের বিচার-বন্ধির উন্মেষ ঘটে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই পুস্তক-সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্.এ. বি.এল্., ব্যারিষ্টার,-এট্-ল, এম্.এল্.এ. মহোদয়েরও আমার উপর এইরূপ নির্দেশ ছিল। সে নির্দেশ-প্রতিপালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। চেষ্টা সফল হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। তবে এ ধরনের সংগ্রহ-পুস্তক বঙ্গভাষায় যে এই প্রথম প্রকাশিত হইল, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

পরিশোধে বক্তব্য, এই সংগ্রহ-পুস্তকে যে সমস্ত প্রবন্ধের সন্নিবেশ করিয়াছি, প্রায় সকলগুলিই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল বঙ্কিমচন্দ্র-নির্মিত



‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত’, ‘পারীচাঁদ মিত্র’ ও ‘দীনবন্ধু মিত্র’—এই তিনটি প্রবন্ধ ত্রি-তিন গ্রন্থকারের ‘গ্রন্থাবলী’তে ভূমিকা-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, প্রবন্ধ-গুলিকে এই পুস্তকে সাজাইবার সময়ে প্রবন্ধ-রচয়িতৃগণের জন্ম-তারিখ বা তাঁহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি নাই। প্রবন্ধসমূহের প্রথম প্রকাশের কালানুযায়ী যথাক্রমে উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

1৯৩৭

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

### দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

১৯৩৭ সালে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের ছয়টি প্রবন্ধ এই সংস্করণে বর্জিত, এবং তৎপরিবর্তে এগারটি প্রবন্ধ সংযোজিত হইল।

1৯৩৯

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

### তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের চারিটি প্রবন্ধ বাদ দিয়া তৎস্থানে সাতটি প্রবন্ধ যোগ করা হইয়াছে।

1৯৪৩

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়



# সাহিত্য-প্রসঙ্গ

# সমালোচনা-সংগ্রহ

## নীতিকাব্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, দুই ব্যক্তি কখনও এক পুকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারেন বা না পারেন, কাব্যপ্ৰিয় ব্যক্তিমাঝেই এক পুকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য-নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশবিশেষে কাব্য। দ্রষ্টার উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি। নাটককে আমরা কাব্য-মধ্যে গণ্য করি, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাহা-দিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়; যথা—১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তি-বিশেষের চরিত, শিশুপাল-বধের ন্যায় ঘটনা-বিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্যকাব্য ইহার অন্তর্গত এবং আধুনিক উপন্যাসসকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য় ঋণকাব্য,—যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা ঋণকাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে; কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয় এবং রচয়িত্তে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গৃহীত এবং অভিনয়ো-পযোগী, তাহাই যে নাটক বা তৎশ্রেণীস্থ, এমন নহে। এ দেশের লোকের সাধারণতঃ উপরি-উক্ত ত্রিবিধমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে



গুণিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক, তাহার মধ্যে অনেকগুলি নাটক নহে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গুণিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। “Comus,” “Manfred,” “Faust” ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরেজি ও গ্রীকভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে, গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গৃহন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যিক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় “Bride of Lammermoor”কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্য ও নাট্যকাব্যে পুনীত হইতে পারে; অথবা গীত-পরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে, দেখা গিয়াছে অনেক ঋণকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গুণিত কাব্যমানাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে “Excursion” এবং “Childe Harold”কে ঐ নাম দিতে হয়, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ঐ দুই কাব্য ঋণকাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

ঋণকাব্য-মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে একপ্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন।

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্ নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক; কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক্, সেখানে নামও পৃথক্ হওয়া আবশ্যিক। যদি এমত কোনও বস্তু থাকে যে, তাহার জন্য গীতিকাব্যানামাটি গ্রহণ করা আবশ্যিক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠ-ভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। ‘আঃ’ এই শব্দ কণ্ঠ-ভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরজ্জিবাচক হইতে পারে এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। “তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম”—ইহা শুধু বলিলে দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বর-ভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বর-বৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ-প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয়া-প্রযুক্ত মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্ত-ভাব ব্যক্ত হয় না; অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যিক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।



গীতের জন্য বাক্য-বিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাবলী বাক্য-বিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্য-জন্য আবশ্যিক দুইটি,—স্বর-চাতুর্য্য এবং শব্দ-চাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি স্বকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাববাহক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয়ে গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটনমাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পুভূতি বৈষ্ণব-কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, নাইকেল মধুসূদন দত্তের বুজাঙ্গনা কাব্য, হেম বাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।\*

যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না; কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্য-পুণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমের অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়-মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে। ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্য এই একটি প্রধান পুভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটক-কর্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক-নায়িকার চরিত্র অপূর্ণ এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে, গীতিকাব্য-লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার। উদাহরণ তিনু ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম উদাহরণ উত্তরচরিত-সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতা-বিসর্জন-কালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে

\* যখন এই পুস্তক লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্রবাবুর কাব্যসকল প্রকাশিত হয় নাই।





এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিন্তে যখন যে ভাবের উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটক-মধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যাকারে অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্লীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন এবং তত্তৎ-কার্য্য-সম্পাদনার্থ যতখানি ভাব-ব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতি-কৃত এই রাম-বিলাপের সঙ্গে ডেস্‌ডিমোনা-বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না, ব্যক্তব্যের অতিরিক্ত তিনি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া একে একে গণনা করিয়া সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্রগুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সহজেই অনুমেয় যে, যাহা ব্যক্তব্য, তাহা পর-সদ্বক্ষীয় বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য, তাহা আশ্চর্য-সদ্বক্ষীয়; উক্তিমাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এক্রপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে; বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুষঙ্গিকতা-বশতঃ প্রয়োজন-মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

[ বঙ্গদর্শন, ১২৮০ ]

## পলাশির যুদ্ধ

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

মনুষ্য-জগতে নিখুঁত রূপ নাই এবং নিখুঁত কাব্য নাই। কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেনের এই কাব্যখানিও সর্ব্বাংশে নিখুঁত নহে। তবে, এ কথা তথাপি অক্লুপ চিন্তে বলা যাইতে পারে যে, 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠহারে একটি কমণীয় আভরণ-স্বরূপ গুণিত হইবে, এবং যত দিন এই ভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিনই ইহার পুঙ্খললিত বঙ্গবাসীর হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইবে।



এই কাব্যের বিষয় পলাশির প্রসিদ্ধ যুদ্ধ, অথবা নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন এবং সঙ্গে ইংরেজ-রাজশ্রীর প্রথম অভ্যুদয়। এদেশীয়েরা সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ের আদর করিয়া থাকেন, এই কাব্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে দেবতা নাই, গন্ধর্ব্ব নাই, দেবাসুরের যুদ্ধ নাই, তপোবন পুভূতির বর্ণনা নাই, জটাচীরধারী তাপস-দিগের কঠোর তপস্যার কথা অথবা শৈবাল-সমাদৃত পদ্মিনীর ন্যায় বক্সাবৃত্তা তপস্বি-কন্যাদিগের প্রেম, বিরহ ও অশ্রুবর্ষণ প্রভৃতি ভারতপ্রিয় হৃদয়হারি বৃত্তান্তনিচয়েরও উল্লেখ নাই। কিন্তু তথাচ ইহাতে যাহা আছে, তাহা পাঠ করিবার সময়ে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উছলিয়া উঠে এবং করুণা অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান হয়।

পলাশির যুদ্ধ বলিলে বালকেরা মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাস-পুস্তক গুরুত্ব করে, এবং বৃদ্ধেরা বিলাতের কোন প্রসঙ্গ মনে করিয়া বীতশ্রু হন। কিন্তু যাহাদিগের চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে, এবং বুদ্ধি চিন্তা-সহযোগে আমাদিগের কবির কল্পনার সঙ্গে উদ্ভট হইতে পারিবে, তাহাদিগের নিকট বঙ্গীয় কবির বীণার জন্য ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয় সম্ভবে না। পলাশির যুদ্ধ বর্তমান ভারত-ইতিবৃত্তের প্রথম পৃষ্ঠা; পলাশির যুদ্ধ ভারতের নিয়তি-নেমির শেষ আবর্ত। ভাগীরথী ও কালিন্দীর ন্যায় দুইটি পুরাণপ্রসিদ্ধ স্রোতস্বতী দুই দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া যেখানে আসিয়া প্রণয়-ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, অনেকে ভক্তিরসার্দ্ৰ চিন্তে সেই স্থানকে তীর্থস্থান বলিয়া পূজা করেন। আবার, সমুদ্রের পর্ব্বোচ্ছ্বাস-প্রবাহসকল যে স্থলে আসিয়া তৈরবরবে পরস্পর-প্রহত হয়, এবং ভয়াবহ তরঙ্গমালা স্রজন করিয়া তটভূমি পুষ্কস্পিত করে, অনেকে পুষ্কতির গহিমায়া মুগ্ধ হইয়া তাদৃশ স্থানকে বৈজ্ঞানিকের দৃশ্যস্থান বলিয়া আদর করেন। এই গণনায়, পলাশির ক্ষেত্র মহাতীর্থ ও মহাদৃশ্য। এখানে পূর্ব ও পশ্চিম পরস্পর সম্মিলিত হয়; এখানে প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক উন্নতি এই দুই প্রতিকূল স্রোত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও প্রতিঘাত করে; এখানে বংশপরম্পরায় সহস্র কোটি লোকের ললাট-লেখার পরীক্ষা হইয়া যায়; এখানে দুই মহাদেশের দুইটি ইতিহাস, কালের এক কক্ষিতে যুগপৎ নিমজ্জিত হইয়া, একীভূত নূতন নৃত্তিতে ভাসিয়া উঠে; এবং বঙ্গভূমি, ভারতবর্ষ ও সমস্ত এসিয়া-ভূখণ্ডে এইক্ষণ যে পরিবর্তনের চক্র অবিরাম গতিতে অহনিশ চলিতেছে, পুঙ্ক্ত পুঙ্ক্তাবে এখানেই তাহা প্রথম চালনা পায়। যদি ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ না থাকিত, তবে এদেশের অবস্থা এইক্ষণ কিরূপ হইত, তাহা চিন্তা করাও কঠিন। লোকে এইক্ষণ যে ভুগান্তপুলক ও অতিনব স্রষ্টি দেখিয়া কখনও আশায় উৎফুল্ল, কখনও বিঘাদে অবসন্ন হইতেছে, তাহার চিহ্নও কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইত কি না, সন্দেহের কথা। বস্তুতঃ সমালোচ্য গ্রন্থে পলাশির যুদ্ধ যে ভাবে কল্পিত হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর কল্পনার পরিচয় দেয়, এবং সমগ্র চিত্রটিকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইলে ইতিহাস-শৈলীর উর্দ্ধতম শৃঙ্খলে আরোহণ করিয়া ভারতের মানচিত্রকে পুনরায় কবির চক্ষে নিরীক্ষণ করা আবশ্যিক হয়। নহিলে পলাশির যুদ্ধ কিছুই নহে।



আমরা শুদ্ধ কল্পিত বিষয়ের উচ্চতা, পুসার ও অতুল গৌরব স্মরণ করিয়াই কবির পুশংসা করিতেছি না। এই কল্পনায় নবীনবাবুর আর একটি বিশেষ পুশংসা আছে। তিনি যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে কেহই তাঁহার পূর্ব পাদক্রম করেন নাই। তিনি যে 'মণিপূর্ণ' ধনিত্তে 'সাহস-সহকারে' পুৰিষ্ট হইয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে কেহই তাঁহার জন্য আলোকবর্তিকা স্থাপন করেন নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পুভূতির সময় হইতে এদেশে যিনিই যে কোন কাব্য পুণয়ন করিয়াছেন, তিনিই একটি পুরাতন অবলম্ব পাইয়াছেন। কেহ পুরান ফুলে নূতন মালা গাঁথিয়াছেন; কেহ নূতন ফুলে পুরান সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন। নবীনবাবুর তাহা হয় নাই। তাঁহার অবলম্ব স্বহৃদয় ও স্বকীয় কল্পনা মাত্র। তাঁহার জন্য বাল্মীকিও মণি বেধ করিয়া যান নাই, এবং কবি-কল্প-পাদপ ব্যাসদেবও অনন্তরতুরাশি সাজাইয়া রাখেন নাই। তাঁহাকে প্রায় সমস্তই স্বহস্তে সঞ্চয়ন ও স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা সামান্য অভিমানের কথা নহে।

পলাশির যুদ্ধ কাব্য অনতিবৃহৎ পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। ইহার পুথম সর্গে নবাব বিদ্রোহীদিগের ঘড়্ যন্ত্র ও কুটমজ্ঞা, দ্বিতীয় সর্গে ব্রিটিশ সেনার শিবির-সন্নিবেশ, তৃতীয় সর্গে পলাশি-ক্ষেত্রের বর্ণনা-পুসঙ্গে সিরাজদ্দৌলার তদানীন্তন অবস্থা-বর্ণন ইত্যাদি, চতুর্থ সর্গে যুদ্ধ এবং পঞ্চম সর্গে শেষ আশা অথবা সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় উপাংশু-হত্যা।

পুথম সর্গের আরম্ভ যেমন গম্ভীর, তেমনই মনোহর। বোধ হয়, মেঘনাদ-বধের আরম্ভ বিনা বান্দ্যলার কোন কাব্যের প্রারম্ভ-বর্ণনাতেই এইরূপ ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য এবং এইরূপ পরিমূহন মনোহারিত্ব পুদর্শিত হয় নাই। অবভেদী পর্বত কি অনন্ত-বিস্তারিত সমুদ্রাদির বর্ণনাতে মনে এক গাম্ভীর্য্যের আবেশ হয়। ইহা সেইরূপ গাম্ভীর্য্য নহে। কোন অলৌকিক-রূপলাবণ্যবতী অঙ্গনা, কি মৃদুবাহিনী স্রোতস্বিনী, কিংবা সরোবলাসিনী ফুল কমলিনী পুভূতির বর্ণনাতেও উৎকৃষ্ট কবির মনোহারিত্ব সৃজন করিতে পারেন।

এই মনোহারিত্ব সেই পুকারের নহে। যদি কোন পুতিভাশালী চিত্রকর বিমাদের পুতিমূর্ত্তি আঁকিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেন, এবং সেই মূর্ত্তিতে আতঙ্ক ও আশা এই উভয়ের বিরোধ এবং শোকের মলিনতা ভালরূপে ফলাইতে পারিতেন, তবে তাহাকেই ইহার উপমাস্থল বলিয়া নির্দেশ করিতাম। পড়িবার সময়ে পুতীতি হয়, যেন পুতুতি আপনি আসিয়া আজন্মদুঃখিনী বঙ্গভূমির দুঃখে করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন, আর সমস্ত সংসার ভয়ে, বিস্ময়ে এবং শোকভরে স্তম্ভিত হইয়া অনন্য-মনে ও অনন্যকর্ণে সেই বিলাপ শ্রবণ করিতেছে।

দিগন্তব্যাপী অঙ্ককাঙ্কের বর্ণনায় এই অংশে একটি আশ্চর্য্য পুঞ্জি কবির লেখনী হইতে হঠাৎ স্থলিত হইয়াছে;—

“তিনিরে অনন্যাকায় শূন্য ধরাতল”





সংস্কৃতে অনুবাদ করিলে এই পংক্তিটিকে মহাকবি ভারবির নিম্নোক্ত পুসিদ্ধ শ্লোকটির সঙ্গে অকুতোভয়ে গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারে :—

“ভবতি দীপ্তিরদীপিতকন্দরা  
তিমিরসংবলিতের বিবস্ততঃ।”

এই সর্গের মধ্যে কিছু দূরে পুবিষ্ট হইলে যবন-নিপাতের নিদানীভূত ভারত-বিখ্যাত জগৎশেঠের নিভৃত মন্ত্রভবন। এই মন্ত্রণা-চিত্রে অনুকৃতির কিঞ্চিৎ ছায়া আছে।

যাঁহারা মিলটনের স্বর্গত্রংশ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে পাণ্ডিনোনিয়মের সেই লোন-হর্ষণ বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহা বিস্ময়কর কি বিচিত্র বোধ না হইতে পারে। কিন্তু অনুকৃতির ছায়া আছে বলিয়াই যে ইহা কোন পুকারে অযশের কারণ হইয়াছে, এমন নহে। আদৌ, পলাশির যুদ্ধে এই অংশ অপরিহার্য্য। এটুকু ছাড়িয়া দিলে ইতিহাসকে লজ্জন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই মন্ত্রণায় যাঁহারা অভিনায়ক, তাঁহাদিগের সহিত পাণ্ডিনোনিয়মের মন্ত্রণাভিনায়কদিগের অনেক বৈলক্ষণ্য। ইঁহারা রক্ত-মাংসের মনুষ্য, তাঁহারা কবিকল্পিত অপদেবতা। ইঁহাদিগের শোক, দুঃখ, মর্ষব্যথা এবং আশা ও ভয় আমরা বুঝিতে পারি; তাঁহাদিগের সমস্তই মানবীয় সহানুভূতির বহির্ভূত।

কুটচক্রবর্ত্ত মন্ত্রণাকারীদিগের প্রত্যেকেই সিরাজদ্দৌলার ঘোরতর বিদ্বেষী ও মর্ষাস্তিক শত্রু ছিলেন। সিরাজের সর্বনাশ হউক এবং তদীয় সিংহাসন এই মুহূর্ত্তেই বিচূর্ণিত হইয়া যাউক ইহা প্রত্যেকেরই প্রাণগত কামনা ছিল। কিন্তু কবি অতি সাবধানে, অতি স্নেহকৌশলে, ইঁহাদিগের এক এক জনের মনের ভাব এক এক রূপ ভাষায় প্রকাশিত করিয়া চরিত্রের বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে স্বকীয় লোকপ্রতিভতা এবং শাব্দিক ক্ষমতারও পরিচয় দিয়াছেন। মন্ত্রিবর রায়দুর্লভ রূপট ধার্মিক। তাঁহার মন কুর্ন্তুগুণবৎ;—উহা একবার বাহিরে আসে, আরবার সঙ্কুচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তিনি কিছুই পরিকার দেখিতে পান না। যেখানে পদ নিক্ষেপ করিতে যান, সেখানেই তাঁহার কণ্টক-ভয়। যাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তিনি সম্যক্ বিশ্রাস করেন না। শেষে, প্রাণ-ভয়কে পাপ-ভয় বলেন, এবং এইরূপ লোকের যেমন হইয়া থাকে, মনের কথা মনেই রাখিয়া ইঁহার এবং উঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকেন। তাঁহার পর জগৎশেঠ। যেমন পাণ্ডবসভায় ভীম, তেমন এই সভায় জগৎশেঠ;—অকপট, অসন্দ্বিগ্ধচিত্ত, অটল সাহসপূর্ণ, এবং অভিমানবিধে জর্জরিত। শেঠবরের হৃদয়ের ক্রোধ আগ্নেয়গিরির মত; উহা হইতে যাহা কিছু উদ্গীর্ণ হয়, তাহাই শ্রোতার অঙ্গে ‘তপ্ত লোষ্ট্রগন’ নিপতিত হয়; কথায় ধমনীতে অগ্নিত্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়।





জগৎশেঠের প্রতিজ্ঞাও ভীমের ন্যায় ; শুনিলেই হৃদয় চমকিয়া উঠে এবং যেন এতক্ষণ পরে পুরুষ-সম্মুখে আসিয়াছি এইরূপ প্রতীতি জন্মে ;—

সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদ চক্রমা  
অসম্ভব, হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা ।”  
\* \* \* \*

“সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় পুয়োজন,  
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্র-মণ্ডল,  
অমেরু সিঁদুর জলে দিব বিসর্জন,  
নইব ইন্দের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল ।  
যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ ;  
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্যাণ ।”

রাজনগরেশ্বর মহারাজ রাজবল্লভের কথায় বিমের মিশ্রণ আছে, তড়িৎ-বেগ নাই ; কথা যেন ফুটে ফুটে হইয়াও দুঃখভরে কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকে । কিন্তু ঐ যে অস্ফুট কথা ; তাহাতেও—

\* \* \* \* \* উঠিল কাঁপিয়া  
দুক দুক করি মিরজাকরের হিয়া ।”

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবিক, পাপদেহী, পবিত্র ও পরদুঃখকাতর । তিনি যখন আলিবদ্দির অকলঙ্ক চিত্রপটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিরাজের কলঙ্ক-পঙ্কিল কুৎসিত প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন, তখন মৃণায় তাঁহার আত্মা জর্জরিত হয় । কিন্তু তিনি জগৎশেঠের মত সাহসী নহেন, রাজবল্লভের মত কটুভাষীও নহেন । তাঁহার পরামর্শ স্পষ্টে কথা । চক্রাদিগের মধ্যে তাঁহারই চক্রান্ত নাই, কারণ তিনি মীমাংসা-কারী । আমরা পুস্তাব-বাহিন্য-ভূয়ে রাণী ভবানীর কথা হইতে পাঠকের জন্য কিছুই উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া নিতান্ত দুঃখিত রহিলাম । কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, যিনিই সেই অমৃতভিক্ষিত বিষ কি বিষাক্ত অমৃত পান করিবেন, তিনিই পদে পদে কবির নবীনচন্দ্রকে হৃদয় খুলিয়া সাধুবাদ দিবেন । যদি কোন ব্যক্তি সুগভীর নিজার মধ্যে সহসা কোন অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ করিয়া জাগিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত যেক্রপ নানাবিধ অচিস্তনীয় ভাবে তৎকালে আলোড়িত হয়, এই কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে দ্বিতীয় সর্গে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র পাঠকের অসাবধান চিত্তও সহসা সেইরূপ আলোড়িত হইয়া উঠে ।

প্রথম সর্গের সনস্ত কথাই পূর্ব্ব এক একবার নিশার দুঃস্বপ্নের মত অলীক বোধ হয় ; অথবা ঘোরাক্ষ-রজনীতে অকস্মাৎ মেঘ-গর্জন শ্রবণ করিলে কিংবা অকস্মাৎ দামিনীর ক্ষণস্থায়ী চমক দেখিলে, তাহা যেমন শ্রুতি কি দৃষ্টির বিভ্রম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, সেইরূপ যাহা কিছু শুনিয়াছি এবং যাহা কিছু দেখিয়াছি সমস্তই যেন মনের ভ্রান্তি, এইরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে । কিন্তু দ্বিতীয় সর্গে প্রবেশ করিলেই সেই প্রতীতির মন ও প্রিয় বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায় ; এবং যাহা দেখি নাই



তাহা দেখিয়া এবং যাহা শুনি নাই তাহা শুনিয়া, মন বিস্ময়ের পর ভয়ে এবং ভয়ের পর বিস্ময়ে বিস্ফারিত ও সঙ্কুচিত হয়। কোথায় ইংলণ্ড, আর কোথায় বঙ্গভূমি! কিন্তু এখন কি শুনি, আর কি দেখি। না—

“ব্রিটিশের বর্ণবাদ্য বাজে ঝম ঝম  
হইতেছে পদাতিক-পদ-সঞ্চালন  
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন ঝনন,  
হেঁচিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গজিছে বারণ।  
থেকে থেকে বীর-কণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,  
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য, ভুজঙ্গ যেমতি  
সাপুড়িয়া-মগ্ন-বলে; কতু অস্ত্র করে,  
কতু স্কন্ধে; বীরপদ, কতু দ্রুতগতি।  
'ডুমের' ঝর্ঝর রব, বিপুল ঝঙ্কার,  
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিশের বীর অহঙ্কার।”

এই সর্গে সমরোন্মুখ-সৈনিকদিগের মনের ভাব আঁকিতে যাইয়া কবি মধ্যস্থলে আশার যে একটি 'বন্দনা' করিয়াছেন, তাহা বহুকাল স্মরণ থাকিবে। এই বন্দনাটিকে স্কটলও-দেশীয় পুসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেলের আশা-নামক কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িলে পাঠকবর্গ নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিবেন। ক্যাম্বেলের আশা পৃথ্বীলোক পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধতম গগনে বিচরণ করে; নবীনবাবুর আশা স্নেহগদগদ প্রিয়কণ্ঠের ন্যায় হৃদয়ের রক্তে রক্তে সঞ্চরণ করিয়া প্রাণ-মন কাড়িয়া লয়। দুইটিই সুন্দর ও সুখদর্শন; কিন্তু একটি মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ধরজ্যোতি; আর একটি লঘুমেঘাবৃত চন্দ্রমার শীতল কান্তি; একটি সুদূরবর্তিনী, আর একটি মর্মস্পর্শিনী। যিনি ব্রিটিশ-সেনার প্রাণ, পলাশি-যুদ্ধের প্রধান নায়ক এবং ভারতের ইংরাজ-রাজমহিমার পুথ্য পুতিষ্ঠাতা, সেই চিরবিশ্রান্তনান্য দুর্দ্ধর্ষপুষ্টি ক্রাইবের সহিত এতক্ষণ কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি কোথায় ছিলেন, কেন বঞ্চে আসিলেন, এবং বঞ্চে আসিয়াই বা আজ কি কারণে কাটোয়া-শিবিরে তরুতলে একাকী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, কবি আখ্যায়িকার পুচলিত দীপ্তানুসারে ইতঃপূর্বে তাহার কিছুই বলেন নাই, কিন্তু আশার নিকট জিজ্ঞাসাচছলে যে ভাবে বীরবরকে সহসা অভিনয়-ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অতি সূচক হইয়াছে। এইরূপ পট-পরিবর্তনে মনে কোতূহলের উদ্দীপন হয়, এবং উত্তরোত্তর চিত্রগুলি দেখিবার জন্য চিত্ত স্বভাবতঃই উৎসুক হইয়া উঠে। ক্রাইবের তৎকালীন মুখচছবি এবং মনোগত ভাবের যেকোন বর্ণনা হইয়াছে, তাহাও আমাদিগের নিকট প্রশংসনীয় বোধ হইল।

নবীনবাবু, বর্ণনীয় বীরপুরুষের চক্ষু এবং দৃষ্টির প্রতিই সমধিক ননোযোগ দিয়াছেন। বোধ হয়, যদি তিনি তাহার অধর, ওষ্ঠ, নাগা, ঝুয়ুগ এবং উপবেশন-ভঙ্গিয়াকেও ঐ সঞ্চে আঁকিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানেরও সম্মান রক্ষা পাইত এবং বর্ণনাও চমৎকারিনী হইত। ক্রাইবের বর্ণনায় কিঞ্চিৎ ন্যূনতা থাকিলেও, যিনি



ধ্যানযোগে তদীয় মানস-চক্ষুর সমুখবর্তিনী হইয়া এই ক্ষুদ্রতাময় নরলোকে অণুকাল বিরাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দিকে চাহিলেই সকল কথা ভুলিয়া যাই। একবার নয়ন ভরিয়া ঐ মূর্তি নিরীক্ষণ করিলে, নবীনবাবুকে কখনই পুশংসার সামান্য উপহার দিতে প্রবৃত্তি হয় না; পুশংসা করিবার ইচ্ছা তখন প্রীতি ও ভক্তিতে পরিণত হয়। যখন বীর-কেশরী ক্রাইব, সংশয়-দোলার দোলায়িত হইয়া আশার হিল্লোলে একবার উপরে উঠিতেছেন এবং পরিণাম-চিন্তায় আবার জড়সড় হইয়া ভূতলে পড়িতেছেন; যখন সম্পদ ও বিপদ, বিজয় ও পরাজয় এবং কীর্তি ও অকীর্তির বিভিন্ন মূর্তি তাঁহার কল্পনানৈবেদ্যে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহাকে ভয়ানকরূপে বিলোড়ন করিতেছে; এবং যখন অপমানের বৃশ্চিক-দংশন, লোভের অন্ধুশ-তাড়না এবং অভিমানের প্রদীপ্ত-বহি তাঁহার চিত্তকে এক অনির্বচনীয় উৎসাহে স্ফীত করিয়া তুলিতেছে, এমন সময়ে রাজরাজেশ্বরীরাপিনী এক দিব্য রমণী আরাধ্য দেবতার ন্যায় অথবা মূর্তিমতী সিদ্ধি কি জয়শ্রীর ন্যায়, অন্ধকার-গৃহে দীপালোকবৎ, অকস্মাৎ তাঁহার নিকটে আবির্ভূত হইলেন। তখন,—

“সহস্র ভাক্তর তেজে গগন-প্লাবণ  
ভাতির উপরে; নিম্নে হাগিল ভূতল;  
নামিল আলোকরাশি ছাড়িয়া গগন,  
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিল তরনি  
জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব রমণী।”

এই রমণী-চিত্র অপ্রতিন। এই অলৌকিক রূপরাশি-দর্শনে অতি নিকৃষ্টস্বভাব মনুষ্যেরও কিছুকালের জন্য আশ্চর্যমুগ্ধতা হয়, এবং যে পবিত্রতা তাহাকে কখন স্পর্শ করে নাই, তাহা অগিয়া তাহাতে আবিষ্ট হয়।

অত্যা না ভৈঃ রবে ক্রাইবের আকুল প্ৰাণকে আশুত করিয়া, তাঁহার নিব্বাণোন্মুখ সাহসকে পুনরায় উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া, আকাশবাণীর মত যে কথাটি কথা বলিলেন, তাহা শুনিবার জন্য হৃদয় যারপরনাই অধীর হয়, অথচ শুনিয়া দুঃখের মূর্খুর-দাহনে দগ্ধ হইয়া যায়।

ইহা একটি অবধারিত কথা যে, কাব্যের প্রধান পরীক্ষাস্থল পাঠকের হৃদয়। তাকিকের ভাষা, সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিয়া, বুদ্ধিকে সম্বোধন করে; কবির কণ্ঠ-লহরী, তর্কের কুটিল পথে পরিভ্রমণ না করিয়া, একেবারে গিয়া হৃদয়ের মর্মস্থানে স্পৃষ্ট হয়। সুতরাং যে কাব্য যে পরিমাণে হৃদয়ের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে,—শোভা কি পাঠকের হৃদয়নিহিত নিদ্রিত ভাবসমূহকে উদ্বোধিত করিয়া দেয়, সেই কাব্য সেই পরিমাণে কৃতার্থতা লাভ করে। আর, যে কাব্য যে পরিমাণে হৃদয়কে স্পর্শ করিতে অথবা হৃদয়ের নিকটস্থ হইতে অসমর্থ থাকে, সেই কাব্য সেই পরিমাণে অকাব্য-মধ্যে পরিণত হয়। পোপ এবং বায়রনে ইহার উদাহরণ দেখ। পোপের লেখা পড়িবার সময়ে তোমার পুখমেই এই প্রতীতি হয় যে, তুমি কোন স্বাধীন লোকের নিকটে বসিয়াছ। উত্তরোত্তর কথার গাঁথনিতে সাবধানতা, ভাবের সমাবেশে



সাবধানতা, এবং পদবিন্যাসেও সেই সাবধানতা। যেন পুতোক শব্দ শত পরীক্ষার পর গৃহীত হইয়াছে, এবং পুতোক ভাব শতবার শোধিত হইয়া কবির হৃদয় হইতে বাহিরে আসিয়াছে। বায়রণের লেখায় এই সাবধানতার চিহ্নমাত্রও বিলোকিত হয় না। উহা নিশীথে বংশীধ্বনির মত, অথবা বাতবিকোভিত স্রোতস্বিনীর বিলাপ-ধ্বনির মত। শুবণমাত্রেরই চিত্র পাগলের ন্যায় নাচিয়া উঠে। কি শুনিলাম, কে শুনাইল, ইহা বিচার করিবার অবসর থাকে না; প্রাণ আকুল হইয়া পড়িতেছে, কেবল এই মাত্র ধারণা থাকে। কখনও বিরজি বোধ হয়, কখনও বা মনে প্রীতির সঞ্চার হয়; কখনও আত্মা অশান্তিতে ছটফট করে, কখনও বা শান্তির ক্ষণস্থায়ী স্পর্শ-স্পর্শে ক্ষণকালের জন্য স্নেহের আশ্বাদ পায়। কিন্তু সেই অনির্বচনীয় আকুলিত ভাব কিছুতেই পুশমিত হয় না; উহা ক্রমশঃই পরিবদ্ধিত হইয়া শেষে সমস্ত হৃদয়কে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলে। উল্লিখিত কবিত্বের শক্তি-বিষয়ে এত তারতম্য কিসে? এই প্রশ্নে সকলেই এই উত্তর দিবে যে, একজন বুদ্ধির কবি, আর এক জন হৃদয়ের কবি; পিঙ্কর-রুদ্ধ গৃহশোক এবং প্ৰমত্ত বন-বিহঙ্গ। যিনি বুদ্ধির কবি, তিনি 'যেহেতু' এবং 'অতএব' দিয়া বুদ্ধিমানদিগকে প্রবোধ দেন; কিন্তু তাঁহার সেই স্মাজিত ও স্নগদত কথা শ্রুত হইয়াও অশ্রুতবৎ থাকে। যিনি হৃদয়ের কবি, তিনি তানমানে দুঃপাত না করিয়া, মনের স্নেহে কি মনের দুঃখে হৃদয়ের গীত গাইয়া ফেলেন; কিন্তু সেই বন্য সঙ্গীত বিশৃঙ্খল হইলেও হৃদয়ে হৃদয়ে পুতিব্বনিত হয় এবং এক তানে শত তান সৃজন করে।

পলাশির যুদ্ধ এই শোঘোক্ত শ্রেণীর কাব্য। ইহা হৃদয়-রূপ জীবন্ত পুশুবণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, এবং ইহার পুতোক কবিতা, ও পুতি পংক্তিতেই সজীবতার পরিচয় রহিয়াছে। আমরা ইহাকে বায়রণের কোন কাব্যের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, সে তুলনায় ইহা অবশ্যই হীনপ্রভ প্রতীয়মান হইবে।

কিন্তু বায়রণের কবিতায় যে দুঃপাতশূন্য বন্যভাব এবং যে অদ্ভুত মাদকতা আছে, ইহাতেও অনেক স্থলেই তাহার অনুরূপ পদার্থ পরিলক্ষিত হয়। কোন কৃত্রিম কবি কদাপি 'পলাশির যুদ্ধ' পুণ্যনে সমর্থ হইত না। ইহার লেখকের হৃদয়ে চির-বসন্ত, চির-যৌবন। তাঁহাতে বার্ককেয়ার জড়তা নাই, চিন্তামাত্র-পরায়ণের সাবধানতা নাই, এবং ভাবিয়া ভাবিয়া পদবিন্যাসেরও অবকাশ নাই। কিন্তু লেখা তথাপি হৃদয়-স্পর্শিনী। আমরা নিম্নে তৃতীয় সর্গের আরম্ভ হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। নবীনচন্দ্রকে কেন অসাবধান বলি এবং অসাবধান বলিয়াও কেন অকৃত্রিম কবি বলি, ইহা হইতেই তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতে পারিব।

“এই কি পলাশিকেন্দ্র? এই সে প্রাঙ্গণ?

• যেইখানে,—কি বলিব?—বলিব কেমনে?

গুরিলে সে সব কথা বাঙ্গালীর মন

ডুবে শোক-জলে, অশ্রু স্বরে দু'নয়নে;—



যেইখানে যোগলের মুকুট-রতন  
 খসিয়া পড়িল আঁহা। পলাশির রণে ?  
 যেইখানে চিরকচি স্বাধীনতা-ধন  
 হারাইল অবহেলে পাঁপাড়া যবনে ?  
 দুর্বল বাদশাহী আজি, সজল নয়নে,  
 গাবে সে দুঃখের কথা, তবে, হে করনে !  
 অতিক্রমি সাম্রাজ্য, যন্ত্রদল মাঝে  
 গাইছে যথায় যত কোকিলগঞ্জিনী  
 বিদ্যুৎবরণী বামা ; মনোহর সাজে  
 নাচিছে নর্তকীবৃন্দ মানসমোহিনী,  
 ডুবিয়া ডুবিয়া যেন সঙ্গীত-সাগরে ;  
 পশি শশঙ্কিতে, সেই সিরাজ-শিবিরে  
 সাবধান, শশঙ্কিতে, কল্পিত অন্তরে,  
 না বহে নিশ্বাস যেন, অতি ধীরে ধীরে,  
 কহ সখি ! কহ দুঃখ-বিকল্পিত স্বরে,  
 শত বৎসরের কথা বিদগ্ধ অন্তরে । "

উল্লিখিত পুথম কবিতাটির পুথমার্গ পড়িবার সময়ে মনে সর্বত্রই ইহাই ধারণা হয়  
 যে, কবি একজন অতীব সহৃদয় এবং অতি পুণাচ চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি কল্পনা-  
 যোগে সেই ভারত-বিশ্রুত পলাশি-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং উপস্থিত হইয়াই  
 চিন্তাবেশে অবগন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মন আর তাঁহাতে নাই। হৃদয়ে গভীর  
 শোকসিদ্ধি উথলিয়া উঠিয়াছে এবং শোকবশে নয়নযুগল হইতে দরদর-ধারে নিঃশব্দ অশ্রু-  
 ধারা নিপতিত হইতেছে। ইহার পরই জিজ্ঞাসা, এ শোক কি ?—না, যোগলের দুঃখে  
 দুঃখ, শত্রুর জন্য সহানুভূতি, উৎপীড়কের জন্য উৎপীড়িতের সঙ্কল্প খেদ, অথবা  
 কারণ বিনা কার্য্য। ভাল, শোকের স্রোতই প্রবাহিত হউক ; অকস্মাৎ আবার ক্রোধের  
 স্ফূর্তি কোথা হইতে ? পাঠকের চিত্ত এইরূপ বিবিধ প্রশ্নে বিলোড়িত হইতেছে  
 এবং কবি-কল্পনার অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া মীমাংসার অনুসন্ধান করিতেছে, ইহার  
 মধ্যেই সহসা এক নূতন কথা। কোথায় কোটিকল্প লোকের অদৃষ্টের ফলাফল-গণনা,  
 আর কোথায় রূপসীবৃন্দের রূপের তুরঙ্গ ! কিন্তু কবি যেই ভারতের ভাগ্যসূত্র করে  
 ধারণ করিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার শিবিরস্থ বিলাস-গৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন,  
 অননি সকল কথা পাসরিয়া একেবারে সেই বিলাস-সরসীতে ডাগিয়া গেলেন।

আমরা পূর্বে যে অসাবধানতার কথা বলিয়াছি, ইহাই সেই অসাবধানতা ;—  
 এক গীতের মধ্যে আর এক গীত, এক রাগিনীর মধ্যে আর এক রাগিনী। কিন্তু  
 এই অসাবধানতার মধ্যেও স্বভাবের কি চমৎকার শোভা রহিয়াছে ! কি আশ্চর্য্য  
 সহৃদয়তাই প্রকাশিত হইয়াছে। তরঙ্গের পৃষ্ঠে তরঙ্গের ন্যায় উষ্মল হৃদয়-সমুদ্রে



মুহূর্ত্তঃ ভাব-পরিবর্ত্ত হইতেছে, আর আশ্চর্যমূর্ত্ত কবি সেই সমস্ত চঞ্চল ভাবকে বর্ণ-তুলিকা লইয়া অবিরাম চিত্রিত করিতেছেন। মনের এই অবস্থায় কি কখনও সাবধান হওয়া সম্ভবপর হয়? অথবা তর্কশাস্ত্রকে পূর্বোদ্যোগ দিবার জন্য অত সাবধান হইয়া চলিলে, কবিতা কি কখনও চল-সৌদামিনীর মত একরূপ স্ফূর্ত্তিমতী ও হৃদয়গাহিনী হইয়া থাকে? কবি এই সর্গে আর একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। রমণীর রূপ-বর্ণনায়, নৃত্য-গীতের বর্ণনায় এবং হাব, ভাব, লীলা, রঙ্গ এবং বিলাস-বিব্রনের বর্ণনায় প্রায়ই মনুষ্যের চিত্ত তরলিত হয়। কিন্তু এই সর্গে তাদৃশ বর্ণনা-সকল পাঠ করিবার সময়েও চিত্ত তরলিত না হইয়া, যেন কি দুঃখে, বিষণ্ণ ও ভীতিক্রান্ত হইয়া পড়ে;—অবিরল বৃষ্টিধারার মতো বোলের বিমাদ-মাখা হাসোর ন্যায়, অথবা পুতাতের নিভু-নিভু দীপশিখার ন্যায় পাঠকের চক্ষে সমস্তই নিরানন্দ আনন্দের মূর্ত্তি ধারণ করে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের অঙ্কভঙ্কেরা আদিরসকে করুণরসের নিত্য-বিরোধী বলেন। যিনি আদিরসের উদ্দীপক বর্ণনাতেও এইরূপ কারুণ্যের উদ্বোধন করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন, তাঁহাকে মহাকবি বলিব কি না, এই প্রশ্ন দইবার উত্থাপন করা অনাবশ্যক। পলাশি-যুদ্ধের চতুর্থ সর্গ বঙ্গবাসী-মাত্রেয়ই অভিমানের বিষয়। বাদশাহ্য এমন সামগ্রী অল্প আছে। ইহার যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই মোহিত ও পুলকিত হইবে; এবং যতবার পড়িবে, তত বারই নূতন আনন্দ অনুভব করিবে। কি রস, কি রচনা, সর্ব্বাংশেই ইহা যারপরনাই মাদক ও মনোহর।

ইহার পর পুনরায় যুদ্ধ, যুদ্ধে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং পুতারণা, এবং বঙ্গেশ্বরের পরাজয় ও পলায়ন। কবি তৎকালে কল্পনানেত্রে অস্ত-গমনোন্মুখ ভাস্করের পুতি চাহিয়া যে কয়েকটি কবিতা সম্বোধন করিয়াছেন, ভারতবাসীর অশ্রুজল তিনু তাহার আর পুতিদান সম্ভবে না। প্রিয়-বিয়োগ-বিধুর কামিনী-কণ্ঠের বিলাপ শুনিয়াছি, এবং ত্রিতন্ত্রী কঁাদো কঁাদো মৃদুনিদাদ শুনিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই প্রাণ এমন আলোড়িত হয় নাই। যদি এই বাক্য কয়টি কবির মুখ-নিঃসৃত না হইয়া স্বদেশ-বংশল মোহনলালের মুখ হইতে নিঃসারিত হইত তবে আর কথাই ছিল না।\*

মুশিদাবাদের বুদ্ধিমান লোকেরা মিরজাফরকে কর্ণেল ক্রাইবের গর্দভ বলিত। পঞ্চম সর্গে সেই গর্দভ-শ্রেষ্ঠের সিংহাসনে অভিষেক এবং সিরাজদ্দৌলার নিধন। কবি এই সর্গটিকে 'শেষ আশা' নাম দিয়াছেন। যদি আমাদের ইচ্ছা অনুসৃত হইত, তবে আমরা ইহার এক নাম রাখিতাম—মহাপাতক, আর এক নাম রাখিতাম—আশার নিব্বাণ। এখানেই সকলের সকল আশা, ফুরাইল, পুদীপ চিরদিনের তরে নিভিয়া গেল। এই সর্গের সমুদয় অংশ সমান হৃদয় হয় নাই, কিন্তু এক একটি স্থান আশ্চর্য্য। পাঠক কখন দুঃখে গলিয়া পড়িবেন, কখন ভয়ে স্তম্ভিতবৎ হইবেন। যখন মনুষ্যকুলের চির-কলঙ্ক কুমার মিরণের জনৈক পাপ-সহচর কারাগারের গভীর অন্ধকার

\* পরে মোহনলালের মুখে দেওয়া হইয়াছে।





ভেদ করিয়া গিরাজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই দুঃখজর্জরিত, অর্ধমৃত, হতভাগ্য যুবুর শিরশ্ছেদের জন্য করে খড়া তুলিয়াছে, তখন দয়ার্জচিত্ত কবি উপদেশ করিতেছেন—

“রে নির্দয় অনুচর! কৃত্য হৃদয়ে  
কি কাজে উদ্যত আজি নাহি কিরে জ্ঞান?  
কেমনে রে দুরাচার! কেমনে নির্ভয়ে  
নাশিতে উদ্যত আজি নবাবের প্রাণ?”

\* \* \* \*

“ভুবিবে, ভুবিছে, পাপী, আপনি আপন;  
শৃঙ্খলিত শিলাখণ্ড তাজিয়া শিখর  
পড়ে যবে ধরাতলে, কি কাজ তখন  
আঘাত করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর?”

‘পলাশির যুদ্ধ’ কাব্যের ভাষা বিরূপ হৃদয়হারিণী হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা নিম্প্রয়োজন। বস্তুতঃ একরূপ সরস, সরল ও সুখপাঠ্য কবিতা এদেশীয়েরা অধিক দেখেন নাই। আমাদিগের বিবেচনায় ইংরেজি ভাষার সহিত ওয়ালটার স্কটের “লেডি অব দি লেক” নামক কাব্যের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালা ভাষার সহিত ‘পলাশির যুদ্ধ’ কাব্যের সেই সম্বন্ধ থাকিবে। তবে, কবির নবীনচন্দ্র ইংরেজী ভাষার পুণ্যগত রসকে বাঙ্গালা ভাষায় চালিতে গিয়া স্বজাতির যেমন কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তেমনি দুই একটি অসহ্য অপরাধও করিয়াছেন; যথা,—‘পাড়া-পুতিবাসী-ত্রাস,’—‘চিত হয়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান’ ইত্যাদি। গ্রাম্যতা-দোষে দূষিত এইরূপ এক একটি পংক্তি, দুষ্ক-কুন্তে গোময়ের পুঙ্কেপের ন্যায়, এক একটি মনোহর কবিতাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কবি কিছু কিছু পরেই আবার এমন এক একটি সুধানিস্যান্ধিনী কবিতা বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে তুলিয়া দিয়াছেন যে, দেখিয়া তাহার সকল অপরাধ তুলিয়া গিয়াছি। নিম্নে ইহার উদাহরণ দেখ:—

“শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,  
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।”

\* \* \* \*

“প্ৰিয়ে কেরোলাইনা আমার!  
যেই পুন অশ্রুমাণি আজি অভাগার  
ঝরিতেছে নিরবরি,  
তরল না হত যদি  
গাঁধিতাম সেই হার তব উপহার—  
কি ছার ইহার কাছে গোলকন্দাহার।”

পলাশির যুদ্ধে একরূপ কবিতা এবং এইরূপ ললিত পদাবলীর অভাব নাই। যেন লেখনী অবিরত মুক্তাফল প্রসব করিয়াছে। যখন বাল্যকি কবিতা লিখিয়াছিলেন,



তখন তাঁহাকে পরকীর পদানুসরণ করিতে হয় নাই ; যখন হোমর বীররসে নত হইয়া বঙ্গগম্ভীরস্বরে সেই এক গীত গাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে আর কাহারও কঠানুকরণ করিতে হয় নাই। কিন্তু নূতন কবিদিগের সে সৌভাগ্য সম্ভবে না। তাঁহারা পুঙ্খতির নিকট যত না শিখিয়া থাকেন পূর্বতন কবি-সম্প্রদায়ের নিকট তাহা অপেক্ষা অধিক শিখেন। সুতরাং তাঁহারা অনুকারী। নবীনবাবুও অনুকরণের অপবাদ হইতে নিৰ্গুজ্জ নহেন। সিরাজদ্দৌলার বিকট স্বপ্ন-দর্শনে সেক্সপীয়রের তৃতীয় রিচার্ড নামক নাটকের স্বপ্ন-দর্শন স্পষ্ট প্রতিভাত রহিয়াছে ; চাইন্ডে হেরল্ডের তৃতীয় কাণ্ডের কতিপয় কবিতায় নৃত্য-গীতের যাদুক্ বর্ণনা আছে, পলাশির যুদ্ধে কোন কোন কবিতায় তাহার ছায়া পড়িয়াছে, এবং ব্যয়রণ ও ঋটকে আরও অনেক স্থলে অনুকরণ করা হইয়াছে। ইহাকে আমরা দোষ বলি না। কারণ, এ দোষে সকলেই সমান দোষী। দোষ অথবা অপূর্ণতার কথা বলিতে হইলে পলাশির যুদ্ধের বিশেষ দোষ কিংবা অপূর্ণতা এই যে, ইহাতে মনুষ্য-চরিত্রের বিশদ চিত্র নাই। ইহার পাঠ্যমানে মনে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ভাব এবং অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণনা দৃঢ়-নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট কোন একটি চরিত্র তেমন চিত্রিত থাকে না।

নবীনবাবু প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি। আমরা ভরসা করি, তিনি ভবিষ্যতে আমাদের এই ক্ষোভ দূর করিবেন। বঙ্গভাষা স্বদেশহিতৈষী সহস্র বঙ্গবাসীর প্রাণ-স্বরূপ। সেই বঙ্গভাষা যাহা কর্তৃক অলঙ্কৃত হইল, তাঁহাকে অবশ্য আমরা ভালবাসিব। এবং যাহাকে ভালবাসিব তাঁহার নিকট কেন না আশা করিব ?

[ বান্ধব—১২৮২ ]

## প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি

তাড়িত-সংযোগে মৃত ব্যক্তিও যেমন দৃশ্যতঃ চেতনা প্রাপ্ত হয়, আমাদের আধুনিক কবিতাসকলও সেইরূপ দৃশ্যতঃ কবিতা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা হইতে যদি বিদেশীয় কবিতার তাড়িত-প্ৰভাব নিৰ্ব্বাণিত করা যায় ত দেখিতে পাইবে যে, সে-সকল কবিতা পুঙ্খ পুস্তাবে হীনশক্তি নিজীব সামগ্রী মাত্র। পুঙ্খ হৃদয়-উচ্ছ্বাসের যে একটি দুর্দমনীয় অমোঘ শক্তি আছে, তাহা আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। আর, তাহা কেমন করিয়াই বা হইবে ? আধুনিক বঙ্গীয় কবির অন্তর-দৃষ্টি যে একেবারেই নাই, তাহা শত-সহস্র উদাহরণ-দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।





যখন দেখিতে পাই যে, আধুনিক একজন ‘মহাকবি’ নরক-বর্ণনা করিতে গিয়া Dante ও Virgil-এর ক্রীতদাস-স্বরূপে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছেন, যখন দেখি পুখ্যাত কবিগণ বীররসে দেশ মাতাইতে গিয়া সংজ্ঞাহীন উন্মত্ত পুলাপে নিজের মাতিয়া উঠেন, যখন দেখি একজন কৃতবিদ্যা পয়ার-রচয়িতা আদিরসের অবতারণাতে Byron পুতুতির সর্বনাশ-সাধন করিয়া থাকেন, যখন দেখিতে পাই যে এই সকল “অদ্বিতীয় মহাকবির” অনুগামী নিকৃষ্টতর কবিরা ভাদ্রা বা কচি-কণ্ঠে সেই একই সুর নানা পুকারে ভাঁজিয়া ব্যাস-বাল্মীকির মস্তক মুণ্ডন করিতেছে,—তখন ধৃতরাষ্ট্রের মত আমাদেরকেও বলিতে হয় যে, “যখন এই সকল দেখিলাম ও শুনিলাম, তখন এ দেশের কবিতার জয়ের আশা আর করি না।” যদি এমন দেখিতাম যে, বঙ্গ-কবিতা-কাননে নানাপ্রকার দেশীয় বন-ফুলগাছের মাঝে মাঝে বিদেশীয় ফুলগাছের কলমের চারাসকল রোপিত হইয়াছে, তাহা হইলেও আমরা বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতাম না; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সেই সকল কলমের চারাই মহাতেজস্বী হইয়া বন-ফুল-দলকে একেবারে নিহত করিয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে পাই যে, আধুনিক কবিতাতে আমাদের পুঙ্খতিগত অনেকগুলি মনোভাব আর স্থান পায় না—এখনকার বিলাতী আবহাওয়ার প্রভাবে সে বন-ফুলগুলি আর ফুটে না।

যে কেহ ইমং-মাত্র যত্নের সহিত অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয় ও পুঙ্খত দেশজ কবিতা দেখিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে, অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয়ে অভিমানের ভাব অতি প্রবল, পুঙ্খত দেশজ কবিতাতে অভিমানের সঙ্গীতই জ্বলিয়ায়। সমগ্র ইংরাজি সাহিত্যে অভিমানে গদগদ একটিমাত্রও হৃদয়-উচ্ছ্বাস নাই,—এমন কি, ইংরাজি ভাষাতে অভিমানের একটিও প্রতিশব্দ নাই। ইংরাজি কবিতাতে নবপ্রেমের উদ্যোগ আছে, সুতরাং আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতে তাহা পুচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; ইংরাজি কবিতাতে প্রেমের অনন্ত মধ্যাহ্ন-তীব্রতার অনল-উচ্ছ্বাস আছে, বঙ্গীয় কবি তাহাকে অনন্ততর করিয়া, পৃথিবীকে জ্বালাইয়া, স্বর্গ-মর্ত-রসাতল করিয়া, পুলকের সর্বনাশী ঝটিকাকে আহ্বান করিয়াও নিরন্তর হইতে চাহেন না; আবার, ইংরাজি কবিতাতে প্রেমের নিরাশা-রূপ অমা-শব্দরীর যোরতমসাচ্ছন্দ্য বিভীষিকার অবতারণা আছে, সুতরাং আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতেও যোরতর নিবিড়তর অমা-শব্দরী আমরা সচরাচর দেখিতে পাই;—কিন্তু আমরা এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, অভিমানের গোধূলি আমরা আধুনিক কবিতায় কোথায় দেখিতে পাই? সেই যে সেই অভিমান, যে অভিমান প্রেমের কোন ধার ধারিতে চাহিতেছে না, অথচ সকল ধার শোধিতে হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে প্রাণপণে যত্ন করিতেছে, যে অভিমান পুঙ্খতরূপে স্ফুট পাইতে প্রয়াস পাইয়াও অকাতরে—নীরবে—প্রাণের ভিতর প্রাণ ঢাকিয়াও চক্ষের জল সংবরণ করিতে প্রাণ দিয়াও যত্ন করিতেছে,—যে অভিমান লীলাময় মানের অবরোধ কাটিয়া ও হৃদয়ভেদী নিরাশার আশার মধ্যও থাকিয়া এককূল ও-কূল দুকূল দেখিয়া মর্মের অতলস্পর্শে লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে,—সেই পুঙ্খত



ভালবাসার অলন্ত অভিমান আধুনিক কবিতায় কোথায়?—সে অভিমান ইংরাজি কবিতাতে নাই, সে অভিমান ইংরাজি পুঁকৃতিতে নাই। সেই জন্যই তাহা আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতেও নাই। অভিমানে যে-একটি পরাধীনতা—যে-একটি পুঁণ-ঢালা নির্ভরের ভাব আছে, তাহার সহিত ইংরাজি হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বতন্ত্র ভাবের কখনই ঐক্য হইতে পারে না। বঙ্গীয় হৃদয় ভালবাসার সমুদ্রে পুঁণ-মন-হৃদয়—সর্বস্ব অকাতরে বিসর্জন দেয়, কিন্তু ইংরাজি-হৃদয় ভালবাসার সমুদ্রে আত্ম-বিসর্জন করিয়াও নিজের নিজস্ব কখনই ভুলিতে পারে না। ভালবাসার স্থলে বঙ্গীয় হৃদয় এই বলিবে যে, “হে হৃদয়সর্বস্ব! আমি তোমারই—তোমাতেই আমার জীবন, তোমাতেই আমার মৃত্যু,—তোমা ছাড়া আমার আনিদ্বই নাই।”—কিন্তু ইংরাজি হৃদয় বলিবে যে, “হে হৃদয়সর্বস্ব! তোমাকে আমি পুঁণের সহিত ভালবাসি, তোমাকে নহিলে আমি সুখী হইতে পারি না।” গভীর প্রেমেতেও ইংরাজি হৃদয় কখনই নিজের স্বাভাব্য, স্বাধীন নিজস্ব একেবারে বিসর্জন করে না। প্রেমের অপমানে—প্রেমের নির্গম তাচ্ছিল্যে একটি ইংরাজি হৃদয় উগ্রভাবে ইহাই বলিবে যে,

“ I wish you were dead, my dear ;  
I would give you, had I to give  
Some death too bitter to fear ;  
It is better to die than live.  
I wish you were stricken of thunder,  
And burnt with a bright flame through,  
Consumed and cloven in sunder,  
I dead at your feet like you.”

ইহাতে অলন্ত ভালবাসার কিছু অভাব নাই,—নহিলে শেষ পঙ্ক্তিতে সে-ও মরিতে চাহিবে কেন?—কিন্তু সে অলন্ত ভালবাসা-সঙ্গেও ইংরাজি হৃদয় নিজের নিজস্ব, নিজের স্বাভাব্য ভুলিতে পারে নাই। এরূপ স্থলে একটি অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয় এই বলিয়া কাঁদিবে,—

“ দৈবযোগে যদি পুঁণনাথ! হ'ল এ পথে আগমন,  
কও কথা, একবার কও কথা, তোলে ও বিদুবদন।  
পুঁণ তেদেছে তেদেছে তায় লজ্জা কি?  
এমন ত প্রেম ভাঙাতাঙ্গি অনেকের দেখি।  
আমার কপালে নাই সুখ—  
বিধাতা হ'ল বিমুখ,  
আমি সাগর সৈঁছেও গধা, মানিক পেলান না।  
দাঁড়াও—দাঁড়াও পুঁণনাথ! বদন ঢেকে যেও না।





তোমায় ভালবাসি—তাই  
 চোখের দেখা দেখতে চাই,  
 কিছু থাক' থাক' বোলে ধোরে রাখ' না—  
 শুধু দেখা দিলে তোমায় মান যাবে না।  
 তুমি যাতে ভাল থাক', সেই ভাল,  
 গেল গেল বিচ্ছেদে পূর্ণ আমারই গেল।  
 তোমার পরের পুতি নির্ভর,  
 আমি ত ভাবি না পর—  
 তুমি চক্ষু মুদে আমার দুঃখ দিও না।"

মর্মান্তিক পুেমের অপমানেও একরূপ অসীম উদারতা—পোজ্জ্বল ভালবাসা-সত্ত্বেও  
 একরূপ সর্বব্যাপী সন্যাসিনীর বৈরাগ্য—বৈরাগ্যে একরূপ অনুরাগ—অনুরাগে একরূপ  
 বৈরাগ্য—এমন কে কোথায় আর দেখিয়াছেন? ইংরাজি সাহিত্যে ত কখনই দেখিতে  
 পাইবেন না। একরূপ পুেমের অপমান-স্থলে একটি ইংরাজি হৃদয় পুঙ্খ কবি  
 Tennyson-এর মুখ দিয়া এই বলিবে,—

"Better thou and I were lying, hidden  
 from the heart's disgrace,  
 Rolled in one another's arms, and  
 silent in a last embrace.  
 \* \* \* \* \*  
 Am I mad, that I should cherish that  
 which bears but bitter fruit,  
 I will pluck it from my bosom, though  
 my heart be at the root?"

ইহাই পুঙ্খ ইংরাজি হৃদয়—ইহাই পুঙ্খ ইংরাজি পুতিজ্ঞা। ইহার যে একটি  
 বিশেষ সৌন্দর্য আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু ইহাও আমরা স্বীকার  
 করি না যে, উহা আমাদের দেশজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হইতে পারে। ইংলণ্ডের lily  
 পুষ্প ইংলণ্ডেরই পুষ্প, তাহা পুচও উত্তর-বাতাসেও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গীয়  
 হৃদয় যে নিতান্তই কামিনীকুসুম-সদৃশ, মৃদুল দক্ষিণ-বাতাসেও তাহার পাপড়ী ঝরিয়া  
 পড়ে—কি করিব? পুঙ্খ কবি ত কামিনীকুসুমকে কামিনীকুসুম-রূপেই বর্ণনা  
 করিবেন। কিন্তু ও রূপ বর্ণনার কথা দূরে থাক, আজকাল দু'একখানি মাত্র কাব্য  
 ব্যতীত অভিমানের কবিতা ত কোথাও দেখিতে পাই না। কিন্তু যে-কেহ বঙ্গীয় হৃদয়  
 সামান্য যন্ত্রের সহিতও দেখিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে, তাহা বীররসে তেজস্বী নহে,  
 মহান্ ভাবে প্রশস্ত নহে—তাহা করুণরসে মগ্ন, তাহা ভালবাসাতেই উখলিত, এবং  
 অভিমানই সেই ভালবাসার সফেনতরঙ্গ-ভঙ্গ। কি বাল্যকালে পিতামাতা-সম্পর্কে,  
 কি যৌবনে পুণ্য-সম্পর্কে, কি প্রোঢ়ে বা বার্ককে দেবতা-সম্পর্কে—আমাদের  
 অভিমানের ভাবই বিশেষ প্রবল, অভিমানই আমাদের হৃদয়ের একটি বিশেষত্ব।



সংবৎসর পরে যখন পার্বতী কৈলাসপুরী অরুকার করিয়া পাষাণ মা-বাপের ঘরে আগিলেন, তখন মহাদেবের জন্য তাঁহার আর দুঃখ নাই,—মা-বাপকে পাইয়া তাঁহার হৃদয়ের দিগন্তব্যাপী উল্লাস নাই,—তিনি অভিমানেই গদগদ—অভিমানেরেই উন্মত্ত। একজন দেশজ কবি এরূপ স্থলে আনাদের নববিবাহিত বালিকা-হৃদয় কতদূর বুঝিয়াছিলেন, তাহা এই সঙ্গীতটিতেই বুঝিতে পারিবেন,—

“ পুরবাসী বলে, ‘উমার মা, তোর হারা-তারা এল ওই।’  
 শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রানী যায়,  
 ‘কই উমা!’ বলি, ‘কই!’  
 কেঁদে রানী বলে, ‘আমার উমা এলে;  
 একবার আর মা, একবার আর মা,  
 একবার আর মা, করি কোলে।’  
 অমনি দু’বাহু পসারি মায়ে গলা ধরি,  
 অভিমানে কাঁদি, রানীরে বলে—  
 ‘কই, মেয়ে ব’লে আস্তে গিয়েছিলে?  
 তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ  
 জেনে’ এলাম আপনা হ’তে, গেলেনাক’ নিতে,  
 রব না, যাব দু’দিন গেলে।’ ”

এই সমস্ত সঙ্গীতটিতে আমরা যে এক মনোহর ছবি দেখিতে পাইতেছি, সেরূপ মনোহর একখানিও ছবি কি আধুনিক কবিতাতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? সেই নববিবাহিতা নব বালিকা যে কেমন করিয়া আজ বৎসরের পরে অভিমান-ভরে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—সেই গৌরবাস্তি মুখমণ্ডল কেমন আরজিন হইয়া উঠিয়াছে—সেই দরবিগলিত সুদীর্ঘ অর্ধ-মুদিত নয়ন দু’টি, পাছে মায়ের সঙ্গে চোখে চোখে দেখা হয়, এই ভয়েই যেন নতপন্নব—সেই এক একটি কথাই পরে এক একটি মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস! আবার ও দিকে মেনকারাণী লজ্জায় ও কষ্টে কোন কথাই কহিতে পারিতেছেন না, অথচ প্রাণের দুহিতাকে কোলে পাইয়া আনন্দে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে; দুহিতার প্রত্যেক কথায় ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে আরও আরও তাহাকে বন্ধে টানিয়া লইতেছেন; মায়ের চোখের জলে ও মেয়ের চোখের জলে গঙ্গার মত আর একটি পবিত্র নদী যেন হিমালয় বাহিয়া প্রবাহিত হইতেছে—আবার দু’জনেই মুগ্ধ—দু’জনেই নিস্তব্ধ! অনেককণ পরে মেনকারাণীও অভিমানের উত্তরে অভিমান করিয়া বলিতেছেন,—

“ স্ববাই ভাই ও গো ইশানি!  
 যার উমা জগতের মা,  
 তার কি মা এমন হয়?  
 হ্যাঁগো প্রাণের তারা,  
 সেও কি উমা-হারা নয়? ”



যা, তোর শ্রীমুখ না হেতর,  
ফিলাই মনিশীনা রনী

যে দুঃখ অন্তরে,  
দিবা-রানিগী ।

ভাল, যা গো, যা তোর যেন পাখানী,

तुम्हें तो अग्र-जननी,

ভাল, তা বোলে না, একবার                      মায়ে তোমার  
মনে কর কৈ গো তারিণি ?

देहनाम-विषय

## ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ବଳ

गिरेय ना, डुले थोर नास,

না বোলে করিস না মা, মনেতে,—

এ দুইখ বনি গো মা, কায় ?

বালিকা-মুহিতায় না ছেলে না, নয়নে,

গেছে অশ্রুজলে দিন, ও মা হর-অন্ধনে ।

আমি একে মা, অমনা,                      তাতে গো অচনা,

শক্তিহীন শক্তি-তবে, দেশানি ।”

এই ভুবনমোহিনী প্রতিমা কোন্ আধুনিক কবি দেখাইতে পারেন ? এমন সহজ, সরল, হৃদ্যত ভাব লইয়া কোন্ কবি অনন্ত-তুমাররাশির উপরে শারদ-জ্যোৎস্না ফুটাইতে পারেন ? তবুও স্বীকার করিতে হয় যে, মাতা ও দুহিতার সম্পর্কে অভিমান ততটা তীব্র হইতে পারে না ; কেন-না, উভয়েরই উভয়ের ভালবাসার উপর সহজ বিশ্বাস আছে—উভয়েই মনে মনে কতকটা জানেন যে, কেহই কাহারও পরিত্যাজ্য নহে,—এই জন্যই ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য। বুদ্ধিতে হইবে যে, একরূপ মর্শ্বগত বিশ্বাসের স্বনেও বন্ধীয় হৃদয়ে অভিমান উখলিয়া উঠে ; কারণ, আমাদের কোমল প্রাণে ভালবাসার সকল অবস্থাই—কি স্নেহ, কি প্রেম, কি প্রণয়—ভালবাসার সকল অবস্থাতেই অভিমান প্রধান। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেমই অভিমানের অরাজকতার রাজ্য ; কারণ, প্রেমেতে ভালবাসার উপর মর্শ্বগত বিশ্বাস লইয়াই টানাটানি। একেবারে বিশ্বাস না থাকিলে ত নিরাশা-শূশানে আসিয়া পড়িতে হয়, আবার মনের দূর অথচ অপূর্ণাশিত বিশ্বাস থাকিলে অভিমান লীলাময় “মানেতে” অবনত হইয়া পড়ে। কিন্তু যেখানে ঐ মনের বিশ্বাস থাকিয়া যেন নাই, আবার না থাকিয়াও যেন আছে—যেখানে আলোকের সঙ্গে অন্ধকারের দেখা হইয়াও হইতেছে না, মিশিয়াও মিশিতেছে না,—হৃদয়ের সেই গায়ং গোধুলির অবস্থাটিই অভিমানের অবস্থা। একরূপ অবস্থায় কোন কথাই প্রায় কথা যায় না, এক একটি কথা প্রত্যেক পঙ্করে আটক খাইয়া কষ্ট হইতে সাবধানে, অতি সন্তপণে, অতি ভয়ে ভয়ে, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে বাহির হয়। কিন্তু যদি ঐ চঞ্চল বিশ্বাসে একটুও দাঁড়াইবার স্থল হয়, তখন অভিমান কতকটা মুখর হইয়া পড়ে, অতি ধীরে ধীরে—অতি প্রশান্তভাবেও কতকটা যেন মুখর হইয়া পড়ে। নৈত্রিয় ভিতরে ভিতরে অশ্রুতে আকুল, ধরানিবিষ্ট,—কিন্তু দৃশ্যতঃ চক্ষে জল নাই, রসনায় জড়তা নাই,—



অভিমান বরং ঈশ্বর ব্রহ্মকৃতি করিয়া এইরূপে চাপা-কান্না কাঁদিতে গিয়াও দিবালোকে বিদ্যুতের মূন হাসি হাসিয়া বলিতে থাকে,—

“নূতন যারা, তোমার তারা নয়নের তারা,  
একি স্থলে ভুল,  
যেন আঁধার শূল,  
কেন তায় আদর করা ?  
কোথায় শিখলে নাথ ! এমন মন-রাখা ?  
বুঝতে নারি ভাব, এ কি ভাব, তোমার আজ কথা !  
তাজা ধনের বাড়ায়ে সম্মান—  
কেন কর পূজা ধনের অপমান ?  
ছিঃ ছিঃ নাথ ! বলো না ‘পুণ’,  
ইথে হাসবে লোকে, আমার পাঁকে,  
শেষে কি হবে অপমান !  
যারে পুণ গঁপেছ, সেই এখন পুণ !  
আমায় বোলে ‘পুণ’—পুণ জুড়াবে না,  
শুনলে সে আবার, পাবে নাথ, পুণে যাতনা !  
আমায় কোরে অন্তরের অন্তর, অন্যো অন্তরে দিয়েছ স্থান !  
যথায় তব নব ভাব, তারে ‘পুণ’ বলো গে—হবে তার স্বধ,  
আমায় কেন বোলে ‘পুণ’ বাড়াও দিগুণ দুধ ?  
ভেবেছিলাম পুণনাথ ! গিয়েছে সে দিন,  
এখন হলাম ‘পুণ’—কেবল কথার ‘পুণ,’ কিন্তু কর্মে ফলহীন !  
তোমার বিচ্ছেদ হে আমার গলার হার,  
করব অনাদর কি দোষে বল হে তাহার ?  
চোখের দেখা মুখের আলাপন,  
এখন তাই লক্ষ লাভ জ্ঞান !”

এই পুণের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইষ্ট-দেবতার সম্পর্কে যে এক পুকার অভিমান আছে, তাহা বঙ্গীয় হৃদয় ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইষ্ট-দেবতা বা ঈশ্বরের উপরে আবার অভিমান—এ কথা শুনিলেই অনেকে চমকিয়া উঠিবেন, হয়ত অনেকে তাহা “পাষাণ-নাস্তিকের” পুলাপ মনে করিয়া শুনিতে চাহিবেন না। যে দেশে বা যে ধর্মে ইষ্ট-দেবতা বা ঈশ্বরকে “মা” বলিয়া ডাকিতে জানে না, সে দেশের বা সে ধর্মের লোক ত এরূপ অভিমানের মর্গই বুঝিতে পারিবে না ; কারণ, “পিতা” বলিতেই যে ভাবটি আমাদের মনে আসে, তাহার সহিত ভক্তির সম্পর্কই অধিক। কিন্তু মাতা ? “মা”—ঐ একটি অক্ষরের শব্দের তিতরে কি অপার, প্রগাধ, অতলস্পর্শ স্নেহের প্রকৃত মহাকাব্য অবরুদ্ধ রহিয়াছে। তিনি আমাদের ভক্তির বিষয়, কি ভালবাসার বিষয়, ভয়ের বিষয়, কি আশ্বাসের বিষয়,



তাহা আমরা জানি না, জানিতে চাইও না ;—তিনি আমাদের মা, তাঁহার সুকোমল পক্ষচ্ছায়ায় আমরা দিন-দিন পুতিপালিত, দিন-দিন বর্দ্ধিত—দিন-দিন উন্নত ! তিনি ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও আমি তাঁহার দেহের অঙ্গীভূত, তাঁহার হৃদয়ের রুধির, তাঁহার প্রাণের প্রাণ । সুখ হইলে উল্লাসে তাঁহার বক্ষে গিয়া পড়িব, দুঃখেতে তাঁহারই বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিব, অনুরাগে তাঁহার কোলে মাথা রাখিব,—আবার রাগে তাঁহারই উপর উপদ্রব করিব । বালক-কালে যখন আমরা মায়ের উপর অভিমান করিয়া ভাত খাইতে চাহিতাম না, তখন ভাত না খাইলে যে আমাদের কষ্ট হইবে, তাহা ত ভাবিতাম না ; কিন্তু আমি ভাত খাইলাম না বলিয়া মায়ের মনে যে আঘাত লাগিবে, সেই আঘাতের উপর লক্ষ্য করিয়াই ত আমরা দূরে দূরে থাকিতে পারিতাম ।—যেন মনে মনে বুঝিতাম যে, আমার ক্ষুধার যাতনার অপেক্ষাও মায়ের মর্ন্ত-যাতনা অধিকতর তীব্র হইবে, এবং সেই জ্ঞানেই—সেই অহঙ্কারেই আমরা ভাত ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতাম । আজ যদি আমার ইষ্ট-দেবতাকে সেই আমার মা-ভাবে না দেখিতে পারিতাম ত আমার ইষ্ট-দেবতার থাকা আর না-থাকা—আমার ভরসা পক্ষে, সাহসের পক্ষে, উল্লাসের পক্ষে প্রায়ই সমান হইয়া পড়ে । যাহারা জগদীশ্বরকে প্রকৃত মা বলিয়া জানেন, যাহারা সংসারের অত্যাচারে, বিপদের ঘূর্ণিবাত্যায়, হৃদয়ের শূলবেদনায় অস্থির হইয়া ইহলোকের মা অপেক্ষাও মাতৃতর ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিয়া উঠেন, তাঁহাদের মনের সাহস ও ভরসা, উল্লাস ও শান্তি অনিবার্য । তবে মায়ের উপর অভিমান হইবে কেন?—তাহারও আবার বিলক্ষণ কারণ আছে ।

বিশ্বাস দুই প্রকার—একটি মনের বিশ্বাস, আর একটি মর্ন্তের বিশ্বাস । মা-সম্পর্কে অনেক সময়ে আমাদের মর্ন্তের বিশ্বাস ঠিক থাকিলেও কোন বিশেষ অবস্থাগত ব্যবহারে মনের বিশ্বাস বিচলিত হইয়া পড়ে । যখন নানা প্রকার আলা-যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া আমরা আপনাদিগকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করি, তখন এই ভাবি যে, আমার অমন “মা” থাকিতে কেনই-বা যন্ত্রণা পাইব ;—অথচ যন্ত্রণা পাইতেছি, কল্পনার যন্ত্রণা নয়,—প্রকৃত কঠোর যন্ত্রণায় ভুগিতেছি ; তখন আমার ইষ্ট-দেবতার স্নেহের উপর কতকটা মনের অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে, কিন্তু মর্ন্তের বিশ্বাস একেবারে যায় না, এবং যায় না বলিয়াই আমরা নিতান্ত দুর্বল, নিঃসহায়, আশ্রয়হীন, শিশুর মত এই বলিয়া দারুণ অভিমান-ভরে কাঁদিতে থাকি,—

“ ‘মা’—‘মা’—ব’লে আর ডাকব না ।

ও মা, দিয়েছ, দিতেছ কতই যন্ত্রণা ।

বারে বারে ডাকি ‘মা’—‘মা’—বলিয়ে

কত দুখি আছি গো অচেতন হ’য়ে ?

মাতা বর্ন্তমানে এ দুঃখ সস্তানে,—

মা বেঁচে, তার কি ফল বল না ?







তখন ভক্তবৎসল মহাদেব সতী-প্রদর্শন-দ্বারা নারদের মনস্তষ্টি-সম্পাদনার্থে সৃষ্টির আচ্ছাদন অপসারিত করিলেন।

অমনি

“মহাদেব মহাবেশ কণকালে ধরিল।

ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল ॥

বিদারিত বসাতল পদযুগে ঠেকিল।

ঘোর ঘটা ভীমজটা আকাশেতে উঠিল ॥”

দেখিতে দেখিতে বিশুদ্ধ যাবতীয় বস্তু একে একে মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে গিরি, নদী, বৃক্ষ, লতা, সমস্তই একে একে অদৃশ্য হইল। গৃহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্তই তিরোহিত হইল। বিশুদ্ধ সমস্ত বস্তু এইরূপে শিব-দেহে প্রবিষ্ট হইলে, মহাদেব মায়াবলে সমুদ্রে এক মহাকাশ সৃজন করিলেন। এই নীলবর্ণ মহাকাশের উপর দেখিতে দেখিতে এক রাশিচক্র স্থাপিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ রাশিচক্র দশ কক্ষে বিভক্ত হইল। এবং তখন দেখা গেল যে, ঐ রাশিচক্রের কক্ষে কক্ষে সতী ভিন্ণ ভিন্ণ মূর্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

নারদ দূর হইতে দেবীর দশমূর্তি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু দূর হইতে দেখাতে তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইল না। তিনি বলিলেন,—“দেব! যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে, নিকটে গিয়া এই দশ মূর্তি নিরীক্ষণ করি।” নারদ বলিলেন,—

“কুতূহলে বিকলিত পরাণ উতলা।

দেখিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা ॥”

তখন ভক্তবৎসল মহাদেব কৈলাস পর্বত সহিত নারদকে পূর্বোক্ত রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করাইলেন। বালকস্বভাব নারদ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন,—“আমি আরও নিকটে যাইয়া দেখিব।”—মহাদেব এবার নারদের কুতূহল চরিতার্থ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—“আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, তুমি এখান হইতেই সমস্ত দেখিতে পাইবে।” তখন নারদ রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, দশ কক্ষে দশ মহাবিদ্যার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। কালী, তারা, মোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধুমাবতী, বগলা, ছিন্ণমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কমলা প্রভৃতি দশ প্রকার দশ মহাবিদ্যার দশ লীলা দেখিয়া নারদ আনন্দে বিভোর হইয়া পুনরায় বীণাবাদন আরম্ভ করিলেন। মহাদেবও সেই গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিমোহিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর পুনরপি বৃহদাকার ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে বিশুদ্ধ যাবতীয় বস্তু পুনরায় বিশেষ প্রত্যাবর্তন করিল। দেখিতে দেখিতে বিশুদ্ধ দেবীর দশটি মূর্তি একত্র হইয়া গৌরী-রূপ ধারণ করিল। তখন হরগৌরী একাক্ষ হইয়া কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করতঃ পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।—৫৪ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে এতগুলি বর্ণনার্থেইল ঘটনার সমাবেশ হেমবাবুর অসাধারণ লিপিকুশলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।



কিন্তু পূর্বোক্ত আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আমরা কি শিক্ষা লাভ করিব? এই উপাখ্যান-দ্বারা আমাদের জ্ঞান, নীতি, বা সুখ কিছুমাত্র উন্নত হইবে কিনা? কেহ হয়ত বলিবেন, কবিতা হইতে একরূপ লাভের প্রত্যাশা করা বিভ্রম। কবিতা কবি-হৃদয়ের ভাবোদ্গার, ইহাতে লাভালাভ-বিবেচনা করা অবিধেয়। বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, আকাশে চন্দ্র উদিত হয়, দেখিয়া সুখী হই, এই পর্য্যন্ত; ইহাতে আবার লাভালাভ-বিবেচনা করিব কি? কিন্তু লাভালাভ বিবেচনা করি বা না করি, লাভালাভ সর্বদাই সর্ব কার্যে সজ্জাটিত হইতেছে। যিনি বিবেচক, তিনি কতটুকু লাভ, কতটুকু অনাভ, পরিমাণ করিয়া নির্দ্ধারিত করেন। আর যিনি স্থূলদর্শী, তিনি লাভালাভের পরিমাণ-নির্দ্ধারণে অক্ষম। ফলতঃ অন্য অন্য বিষয়ে লাভালাভের পুশ্চ উত্থাপন করা যেমন যুক্তিসঙ্গত, কবিতাতেও সেইরূপ পুশ্চ উত্থাপিত করা তেমনই বিজ্ঞান-সঙ্গত। লাভালাভ-বিবেচনায় কবিতাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; বধা—অধম, মধ্যম ও উত্তম। যে কবিতায় মনুষ্য-সমাজের জ্ঞান, নীতি বা সুখ ব্যাহত হয়, তাহাকে অধম কবিতা বলা যাইতে পারে; যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ, এ তিনের একটিরও কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি না হয়, তাহাকে মধ্যম কবিতা বলা যাইতে পারে। আর যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ পরিপুষ্ট, পরিমার্জিত বা পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে উত্তম কবিতা এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যদি কবিতার এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে হেমবাবুর কবিতা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে?

হেমবাবু একস্থলে পুশ্চ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

“সুখ কি জীবিতমানে?                      কিবা অর্থ নির্বাণে?  
কা হ’তে জনমিল জগতের যাতনা?  
অশুভ স্রজন কার?                      নিরমিল বিধাতার  
মানস হ’তে কি এ মলিনতা রচনা?”

এই পুশ্চই অন্য এক স্থলে স্বতন্ত্র ভাষায় জিজ্ঞাসিত হইতেছে,—

“উৎকট ইহ নীলা, তাঁহারে কি মন্ত্রবে?  
মতী কি অশিব, শিব! আছিলেন এ তবে?  
জীব-দুঃখ তবে কি গো অনাদ্যারি রচনা?  
অদনা তবে কি, দেব, পরানীর যাতনা?  
জগৎ-স্রজন-নীলা দুঃখ দিতে পুনীরে?  
না জানি কি ধর্ম তবে ধর দেবশরীরে!”

“অশুভ স্রজন কার?” তুমি আমি সকলেই, কেহ বা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, কেহ বা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে, আপনাকে আপনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই পুশ্চ জিজ্ঞাসা করিতেছি। উদ্যমশীল সাহসী যুবক সংসারের কুটিলস্রোতে এক একটি



কবি বলিতেছেন,—

অর্থ—“এই দুঃখরাশি অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় চারিদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে, দেখিতেছ; এ অন্তত চিরদিন থাকিবে না। এক একটি করিয়া বিবর্তের (Evolution) স্বাভাবিক নিয়মে এই অন্ততমানার নিরাকরণ হইতে থাকিবে। শোক, দুঃখ, তাপ প্ৰভৃতি নানাবিধ মনঃপীড়া এক একটি করিয়া সংসার হইতে বিদায়



নইবে। এবং সর্বশেষে এই দুঃখময় জগতেই মনুষ্য 'পূর্ণ সুখ' দেখিতে পারিবে।" যে কবি আশার এই মোহনস্বরে পাঠকদিগকে বিমোহিত করেন, তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আর আমাদের মধ্যে যাহারা শোক-পীড়িত, দুঃখাহত বা তাপদিক্ত, তাহারাও এই সাধনাময় কাব্যের গুণকরকে একান্তচিত্তে আদর করিবেন, সন্দেহ নাই।

কবি যে শুদ্ধ আমাদিগকে সাধনা দিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি আমাদের গন্তব্য পথেরও নির্ধারণ করিয়াছেন।

কবি বলিতেছেন,—

“ লক্ষ্য করি তারি

(চরম শুভের) পথ, চালা নিজ মনোরথ,

জীব-জন্ম ভয় করে ? জগদঙ্গা জননী ।”

অর্থাৎ “ মা ভৈঃ ! মা ভৈঃ ! আকাশে বিদ্যুৎ ক্রুর হাস্য করিতেছে ; কল্লক, ভীত হইও না। শরীরে অগণিত বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতেছে ; হউক, তাহাতেও বিচলিত হইও না। বাহাদিগকে লইয়া তোমার সংসার-বিপণি সাজাইয়াছিলে— তাহারা কোথায় গেল, আর কিরিল না ; হউক, তাহাতেও বিমণ হইও না। সেই চরম শুভের পথ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও ! জগদঙ্গা এক্ষণে তোমাকে বিবিধ তাড়না দিতেছেন ; দিউন, তাহার জন্য বিলাপ করিও না। কারণ, ইহা নিশ্চিত জানিও —জগন্মায়ী জগন্মাতা অনতিবিলম্বে তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তোমার সর্ব দুঃখ হরণ করিবেন।” যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার দুঃখে শোকে এই জপমালা স্মরণ করিতে পারিবে, দুঃখ-শোকে তাহার কিছুই কষ্ট হইবে না। কবিও একস্থলে ইহার আভাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

“ হেন দশ রূপ দশরূপা দশমহাবিদ্যা

ভবান্নবে পাবে কুল ।”

আমাদের কর্তব্য-সম্বন্ধে কবি আরও একস্থলে বলিয়াছেন,—

“ ধরম ধরম পূর, আপন ক্রিয়া কর,

সংযত করি মন তাঁহাদেরি নিয়মে ।”

অর্থাৎ “ যে যে-কর্ণে পূবৃত্ত আছে, সে সেই কৰ্ম্ম-অনুসারে আপনার কর্তব্য নির্ধারণ কর। তুমি তোমার কার্য্য কর। জগতের দুঃখরাশি দেখিয়া হতাশ বা নিরাশ্বাস হইও না। সদা ‘সত্য পথে রাখি মন’ নিজ নিজ কর্তব্য কৰ্ম্ম সম্পাদন কর।”

পূর্বোক্ত সকল কথা একত্র করিলে, হেমবাবুর ‘দশমহাবিদ্যা’য় কি শিক্ষা করা যায় ? হেমবাবু বলেন,—“ মনুষ্য ! দুঃখে শোকে অভিভূত হইও না। বর্তমান অশুভ চিরস্থায়ী নহে। ঈশ্বর-কৃপায় এ অশুভ নিরাকৃত হইয়া, ইহারই স্থলে শুভ আসিবে। বাহ্যে চরম শুভ জগতে আসিতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। বর্তমান সময়ে, সত্য-পথে থাকিয়া আপন আপন কর্তব্য-অনুসারে আপন আপন জীব নিয়মিত





কর।” ভগবদ্গীতা হইতেও এই শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

“সুখদুঃখে সনে ক্ৰান্তা নাতানাতৌ জয়াজয়ৌ।

ততো যুদ্ধায় যুদ্ধাস্ত নৈবং পাপমবাগ্যসি ॥”

“অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয় প্রভৃতির বিচার এক্ষণে করিও না। যুদ্ধ এক্ষণে তোমার কর্তব্য কর্ণ। অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করিলে তোমায় প্রত্যাবায়গ্ৰস্ত হইতে হইবে না।” হেমবাবুর শিক্ষা বর্তমান বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পরাধীন দেশে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই নৈরাশ্যের অন্ধকূপে ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকে। রুদ্ধবেগা নদীর ন্যায় পরাধীন ব্যক্তির হৃদয়ও যাবতীয় আশা, হৃদয়েই পর্যাবসিত হয়। নৈরাশ্যপ্রবণ পরাধীন দেশে যিনি হেমবাবুর ন্যায় আশার সঞ্জীবন-সঙ্গীত শ্রবণ করান, তিনি নীতি ও সুখ উভয়েরই পথ পরিকৃত করেন। এ স্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে, যে কবি ভারত-বিনাশ ও ভারত-সঙ্গীত লিখিয়া আমাদের নিরাশ-হৃদয়ে আশার উদ্দীপনা করিয়াছিলেন, সেই কবিই ‘দশমহাবিন্যা’ লিখিয়া আমাদের নৈরাশ্যের দমন করিতেছেন। সংক্ষেপতঃ লাভালাভ-বিবেচনায় আমরা হেমবাবুর ‘দশমহাবিন্যা’কে উত্তম শ্রেণীভুক্ত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহি। আমাদের বিশ্বাস যে, ‘দশমহাবিন্যা’-পাঠে ভারতবাসীর নীতি ও সুখ উভয়ই পরিপুষ্ট ও পরিবদ্ধিত হইবে।

কবি বলিতেছেন,—অশুভ ক্রমে ক্রমে নিরাকৃত হইয়া অশুভস্থলে শুভ আসিবে। কিন্তু এ কথাই পুমাণ কি? পুমাণ—ইতিহাস। পৃথিবীতে কিরূপে অল্পে অল্পে সভ্যতার বিকাশ হইতেছে, তাহা কবি বিশেষ দক্ষতার সহিত আমাদের কাছে দেখাইয়াছেন। কবির বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপে অল্পে অল্পে অশুভ-স্থলে শুভ আনীত হইতেছে। কবি বলিতেছেন, যে সংসার-পটের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাইবে, মনুষ্য মনুষ্যকে আত্মরক্ষার্থে বিনাশ করিতেছে। সে অঙ্কের মূলমন্ত্র—‘সংহার’। সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী নরমুণ্ডমালে বিভূষিত হইয়া অহরহঃ নর-বিনাশ করিতেছেন। সেখানে যাহা কিছু শিব, যাহা কিছু শান্ত, তাহাই পদদলিত হইতেছে। সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী বিভীষণা, রক্তাক্তবদনা, উলঙ্গা, লোহিতনয়না, কৃষ্ণবর্ণা।

আবার সংসার-পটের দ্বিতীয় অঙ্কে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, তথায় অশুভ কিঞ্চিৎ নিরাকৃত হইয়াছে। দেখিবে, তথায় সভ্যতার এই প্রথম উন্মেষ হইতেছে। প্রকৃতিরূপা দেবী সেখানেও ভীমা, নৃমুণ্ডমালিনী, লোলরসনা, অটহাসিনী। কিন্তু এ অঙ্কে দেবী উলঙ্গিনী নহেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়াছেন। পূর্বের ন্যায় সংসারের চতুর্দিকে এখনও চিত্তা জলিতেছে। কিন্তু ঐ চিত্তার মধ্যেই প্রস্ফুটিত পদ্ম ও দেখা যাইতেছে। দেবী অসভ্য মনুষ্যের মনে এই প্রথম জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্ধুর প্ররোচিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্য পূর্বের পর্বত-গহ্বরে, বৃক্ষ-কোঠারে বা ভূগর্ভে বাস



করিত। এক্ষেপে তাহারা জ্ঞানবলে খড়্গা, কঠুরী লইয়া স্বীয় স্বীয় আবাসভূমি পুস্তত করিতেছে।

সংসার-পটের তৃতীয় অঙ্কে দেবী মনুষ্যকে সভ্যতার পথে আরও অগ্রসর করাইয়াছেন। সেখানে দেবী নর-নারীর মধ্যে দাম্পত্যপ্রেম সঞ্চারিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্যের মধ্যে পরিণয়-প্রথা প্রথম প্রবর্তিত হইতেছে।

কবি দেখাইতেছেন, সংসার-পটের চতুর্থ অঙ্কে দেবীর আর সে ভয়ঙ্করী মূর্তি নাই। তিনি সেখানে মনুষ্যের মনে অপত্যস্নেহ সঞ্চারিত করিতেছেন। যতদিন পরিণয়-প্রথা প্রচলিত ছিল না, ততদিন অপত্যস্নেহের প্রাবল্য অনুভূত হইত না। কিন্তু এখন নর-নারী সন্তান-সন্ততির প্রতি প্রচুর স্নেহ প্রকাশ করিতেছে।

সংসার-পটের পঞ্চম অঙ্কে মনুষ্যের মনে প্রথম ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উদ্ভিত হইতেছে। সংসার-পটের ষষ্ঠ অঙ্কে মনুষ্য মনুষ্যকে প্রীতি করিতে শিখিতেছে। অর্থাৎ পূর্ব অঙ্কে মনুষ্য পুত্ৰ্যপকার-স্বরূপ পিতামাতাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু এক্ষেপে মনুষ্য মনুষ্যমাত্রকেই প্রীতি করিতে শিখিতেছে। সংসার-পটের সপ্তম অঙ্কে মনুষ্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া পরস্পর পরস্পরের শ্রম-লাঘব করিতেছে। সংসার-পটের অষ্টম অঙ্কে মনুষ্য দারিদ্র্য-অশ্রুরকে নিহত করিতেছে। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যতই সভ্যতার বিকাশ হয়, ততই মনুষ্য দারিদ্র্যকে পরাভূত করিতে শিক্ষা করে। সকলেই জানেন যে, সভ্য দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।

সংসার-পটের নবম অঙ্কে মনুষ্য পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে এবং পাপের জন্য অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সর্বশেষে কবি দেখাইতেছেন যে, সংসার-পটের দশম অঙ্কে মনুষ্য দুঃখ, শোক, তাপ প্রভৃতি সমস্ত পরাভব করিয়া সর্বমঙ্গলার মধুর শাসনে পরস্পর দয়ার অন্ত-সিঞ্চে সর্বপুকার সুখভোগ করিতেছে।

কবি যে সভ্যতার এই দশ মূর্তির বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কি কেবল কবি-কল্পনা? সভ্যতার এই চিত্র যে কল্পনাবহুল, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, কল্পনা-বাহুল্য-সত্ত্বেও এই বর্ণনার মূল ভিত্তি ঐতিহাসিক সত্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা। যিনি বিজ্ঞানের চক্ষে ইতিহাস আলোচনা করেন, তিনি জানেন যে, সভ্যতার পূর্বোক্ত অধিকাংশ মূর্তিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আজিও বিরাজ করিতেছে। ফিজি দ্বীপের নর-খানক অধিবাসী যে সভ্যতার সংহারময়ী মূর্তির অধীনে বাস করে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? আর ব্রাইট, গ্লাডষ্টোন, কনগ্রেভ প্রভৃতি রাজনৈতিকগণ যে সভ্যতার কমলাঙ্কিকা মূর্তির অধীনে বাস করেন, ইহাই বা কে না স্বীকার করিবে? হেমবাবু দেবীর দশ মূর্তি মূর্তি-দর্শন দশ অবস্থার সংযোজনা করিয়া কল্পনার সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশিষ্ট সংযোগ করিয়াছেন।







কিন্তু হেমবাবু দেবীর দশ মূর্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা-বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এক্ষণে তাহারও আলোচনা করা কর্তব্য বোধ হইতেছে। মহামেঘবরণা, দত্তরা, নুমুওমালিনী কালীর সহিত সভ্যতার সংহারময়ী মূর্তির সংযোজন আমাদের বিবেচনায় বড়ই পরিপাটি হইয়াছে। দেবীর তারামূর্তির সহিত সভ্যতার জ্ঞানময়ী অবস্থার সংযোজনা মন্দ হয় নাই। কারণ, জ্ঞানই মনুষ্যের প্রধান আশ্রয়। দেবীর মোড়শী মূর্তির সহিত সভ্যতার প্রেমময়ী মূর্তির অবস্থার সংযোজনা বড়ই মধুর হইয়াছে। কারণ, বয়সের প্রথম উন্মেষেই প্রীতির প্রথম উচ্ছ্বাস। ভুবনেশ্বরীর সহিত স্নেহের সংযোগ মন্দ হয় নাই। কারণ, ভুবনেশ্বরী জগন্মাতারূপিণী। কিন্তু তৈরবীকে কেন ভক্তিবিশ্বাসিনী বলিয়া বর্ণনা করা হইল? ধূমাবতী কেন শ্রমহারিণী? মাতঙ্গী কেন প্রীতিদায়িনী? বগলা কেন দারিদ্র্যদলনী? ছিন্‌মস্তা'তে পাপহারিণী মূর্তির করণা সুন্দর হইয়াছে। পাপী পাপাঙ্কুশতাড়নায় আপনার মস্তক আপনি বলি দিতে পারে। দয়াময়ীর সহিত মহালক্ষ্মীর সংযোজনা সুন্দর হইয়াছে। কারণ, ধন-সূর্য্য হইতে উদ্ভাপ না প্রাপ্ত হইলে দয়া-লতা অঙ্কুরিত হয় না। ইহা দ্বারা দেখা গেল, দুই তিনটি মূর্তি ভিনু প্রায় আর সকলগুলিতেই দেবীর ভিনু ভিনু মূর্তির সহিত সভ্যতার ভিনু ভিনু অবস্থার সংযোজনা সুন্দর হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যার রূপ-বর্ণনা-সম্বন্ধে হেমবাবুর সহিত আমাদের একটু বিবাদ আছে। তিনি কয়েকটি মূর্তি পুরাণোক্ত প্রণালীতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার আর কয়েকটি মূর্তি নিজ-কল্পনা হইতে আঁকিয়া লইয়াছেন। এতদ্ভিনু তিনি আর কয়েকটি মূর্তিতে পুরাণ ও স্বকপোল-কল্পনা উভয়ই বিনিশ্চিত করিয়া দিয়াছেন। 'ছিন্‌মস্তা'র রূপ পুরাণানুসারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে পুরাণের পরিত্যাজ্য অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই। কিন্তু 'বগলা' ও 'মোড়শী' কবি নিজ-কল্পনানুসারে সজ্জিত করিয়াছেন। 'মাতঙ্গী' 'তৈরবী' মূর্তিতে করণা ও পুরাণ উভয়ই সন্মিলিত আছে। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, যখন কবি এইরূপ স্বাধীনতা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন মূর্তিগুলির রূপের সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা উচিত ছিল। কয়েক স্থলে মূর্তিগুলির রূপের সহিত তাহাদের চরিত্রগত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। 'ধূমাবতী'কে শ্রমাতুরা, অকুপিতপাপীভিত্তা বুদ্ধা বিধবার রূপে বর্ণনা করা বড় সুন্দর হইয়াছে। এইরূপে 'ছিন্‌মস্তা'তে মদনোন্মাদদের বর্ণনা বড় উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানময়ী 'তারার'কে লব্ধোদরা\* বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত লব্ধোদরতার কি সম্পর্ক? কিংবা জ্ঞানের সহিত পিঙ্গলবর্ণের কি সম্বন্ধ? যিনি স্নেহময়ী, তাহার হস্তে অঙ্কুশ কেন? অতঃ, বর প্রভৃতি কেন? ভক্তিবিশ্বাসিনী 'তৈরবী'র মস্তকে মালা বড় সুন্দর দেখাইতে পারে। কিন্তু তাহার স্তন বস্ত্র-লেপিত কেন? যদি হেমবাবু পৌরাণিকী বর্ণনা অকুণ্ঠ রাখিতেন, তাহা হইলে তাহার সহিত বিবাদ করিতাম না। কিন্তু যখন তিনি মধ্য মধ্য কবিস্বলভ-স্বাভাব্য অবলম্বন



করিয়াছেন, তখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবলম্বন করিয়া মূর্তিগুলির রূপে ও চরিত্রে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে ভাল হইত।

আমরা 'দশমহাবিদ্যা'র প্রতিপাদ্য বিষয়-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম। এক্ষণে ইহার কল্পনা, ভাষা, চরিত্র-বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আমরা হেম-বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

### ১ম--কল্পনা।

পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে দশমহাবিদ্যার রূপ প্রথমে কল্পিত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশ রূপের বর্ণনা আছে, কিন্তু ঐ দশ রূপের "দশমহাবিদ্যা" অভিধান তখনও দেওয়া হয় নাই। তন্নিম্ন মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীর দশ মূর্তির নামগুলির সহিত দশমহাবিদ্যার নামগুলির ঐক্য হয় না। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশ নাম এই—  
দুর্গা, দশভুজা, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দিনী, জগদ্ধাত্রী, কালী, মুক্তকেশী, তারা, ছিন্দ্ৰমস্তকা, জগদ্গৌরী। শুভ-নিশুভ-বধ-কালে দেবী পূর্বোক্ত দশ মূর্তি ধারণ করিয়া ভিনু ভিনু অস্ত্র বধ করিয়াছিলেন। ইহার পর কালীকৈবল্যদায়িনী নামক পুস্তকে দেবীর এই দশ মূর্তিকে দশমহাবিদ্যা নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। কালীকৈবল্যদায়িনী বোধ হয় তন্ত্রের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। কালীকৈবল্যদায়িনী দেবীর দশ মূর্তির ভিনু আখ্যা দিয়াছেন; যথা—“কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভৈরবী, ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্দ্ৰমস্তা, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা।” কালীকৈবল্যদায়িনী-অনুসারেও দেবী অস্ত্র-বধার্থ এই মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেও আবার কালীকৈবল্যদায়িনীতে যে সমস্ত অস্ত্রের নাম বর্ণিত হইয়াছে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহা হয় নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ছিন্দ্ৰমস্তা নিশুভ বধ করিয়াছেন। কালীকৈবল্যদায়িনীতে ছিন্দ্ৰমস্তা অঘোর নামক অস্ত্র বধ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে তারা শুভ বধ করিয়াছেন, কালীকৈবল্যদায়িনীতে তারা উর্দ্ধশিখ অস্ত্র বধ করিতেছেন। কিন্তু কালীকৈবল্যদায়িনী দশমহাবিদ্যার পূজার যে ক্রম লিখিয়াছেন, আজিও বঙ্গদেশে সেই ক্রম অবলম্বিত হইয়া থাকে। কালীকৈবল্যদায়িনী বলেন,—

“কাষ্ঠিকের অমাবস্যা স্বাতিরক্ষ তাহ।  
মহানিশা মধ্যেতে পূজিলে কালিকায় ॥

\* \* \* \*

তারা পূজা কাল্‌গুন মাহসতে নিকপিত।

\* \* \* \*

• আশ্বিনীতে কোজাগর পৌর্ণমাসী তিথি।  
মহালক্ষ্মী আরাধের নক্ষত্র রেবতী ॥”



ইহা দেখিয়া এইরূপ বোধ হয় যে, যদিও কালীকৈবল্যাদায়িনী পৌরাণিক মতের অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারই মত অনুসারে বঙ্গদেশ পরিচালিত হইত।\* কালীকৈবল্যাদায়িনীর গ্রন্থকর্তা ভিনু অন্য কবিরাও এই দশমহাবিদ্যার উল্লেখ, আরাধনা, স্তব, স্তুতি পুভূতি করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম মধ্যে মধ্যে দুই এক মূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র দশমহাবিদ্যার ভিনু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্তমান সময়ের লেখকেরাও দশমহাবিদ্যার কল্পনায় মোহিত হইয়া উহাদের রূপ-বর্ণনা, ব্যাখ্যা পুভূতি করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আমাদের জাতি-মধ্যে দশমহাবিদ্যার পুতি প্রীতি ও ভক্তি বহুকাল হইতেই বিদ্যমান আছে।

ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসী কেল্টদিগের ন্যায় ও নরওয়ে-সুইডেনবাসী স্কাণ্ডি-নাবিয়ানদিগের ন্যায় ভারতীয় হিন্দুরাও অদ্ভুতরসের পক্ষপাতী। এজন্য হিন্দু কবিরাও অনেক সময়ে অদ্ভুতরসের অবতারণা করিয়া থাকেন। শকুন্তলার জন্ম, শকুন্তলার শকুন্ত-সাহায্যে প্রাণ-রক্ষা, শকুন্তলার অপসরা-কর্তৃক অপহরণ, মহাদেবের কপাল-নিঃসৃতজ্যোতিঃ দ্বারা কামদেবের বিনাশ, মন্দার-কুসুমমাধাতে ইন্দুমতীর প্রাণ-ত্যাগ, সমুদ্র-মন্থনে ঐরাবত উচ্চৈশ্বর্য পুভূতির সমুদান, কিশোরবয়স্ক রামচন্দ্র-কর্তৃক তাড়কা-রাক্ষসী-বধ ও হরধনুর্ভঙ্গ, কৃষ্ণের পুতনা-বধ, কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ পুভূতি অদ্ভুতরস-বহুল নানা চিত্র আমাদের কাব্যে ও পুরাণে ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দশমহা-বিদ্যার আদ্যোপান্ত অদ্ভুত ভাব-বহুল। এবং বোধ হয় এই জন্যই দশমহাবিদ্যা আমাদের দেশে প্রাচীন ও নবীন উভয় দল দ্বারাই এত সমাদৃত হইয়া থাকে। হেমবাবু হিন্দু শাস্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যাগণের অদ্ভুতর প্রায়শঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হইতে পারিবে।

কালীকৈবল্যাদায়িনীতে ধুম্রাবতীর বর্ণনা এইরূপ,—

“ধুম্ররূপে কাতায়নী হইল প্রকাশ।  
অতি বৃদ্ধা বিধবার পক্ষ কেশপাশ ॥  
বৃদ্ধ কলেবর অতি ক্ষুধায় কাতর।  
ধুম্রবর্ণা, বাতাসে দুলিছে পয়োধর ॥  
কাক-বজ্র রথেতে করিয়া আরোহণ।  
ভগ্নকটি, বিস্তারিত মলিন বদন ॥  
বাম হাতে কুলা, ডানি হাত কম্পবান।  
কাতায়নী নিকটে হৈল বিদ্যমান ॥”

\* অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গদেশের পূজার ক্রম দেখিয়া কালীকৈবল্যাদায়িনী তাহা নিজ-পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন।



ভারতচন্দ্র ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন,—

“দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মদিল লোচন ।  
ধূমাবতী হয়ে গতী দিলা দরশন ॥  
অতি বৃদ্ধা, বিধবা বাতাসে দোলে স্তন ।  
কাকধ্বজ-রথারূঢ়া ধূমের বরণ ॥  
বিস্তারবদনা কৃশা কুণ্ডায় আকুলা ।  
এক হস্ত কম্পবান, আর হস্তে কুলা ॥”

হেমবাবু ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন,—

“কাছে তার দলমল                      যে ভুবন উজ্জ্বল  
আরও সুনির্গল জিনি অন্য ভুবনে ।  
দীর্ঘা বিরল-রদ,                      শুভ্র বরণচন্দ্র,  
কুটিল-নয়না বামা ধূমাবতী ধরণে ॥  
লম্বিত-পয়োধরা ।                      ক্ষুৎপিপাসাতুরা,  
বিমুক্তকেশী বামা জীবদুঃখ-বিনাশে ।  
শুমকাস্ত-পুণিকেশ,                      দুচাইতে রুদ্ধ বেশ  
বিধবার রূপে নিতা গতী হোথা বিকাশে ।  
বিবর্ণা, অতি চকলা,                      হস্তে স্থাপিত কুলা,  
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন পুকাশে ॥”

কোন কোন স্থলে হেমবাবু পুরাণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও পূর্ববর্তী কবিগণকে বর্ণনা-  
মাধুর্য্যে পরাজিত করিয়াছেন ।

ভারতচন্দ্র মাতঙ্গীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

“রক্তপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি ।  
চতুর্ভুজা ধড়া-চর্খ-পাশাকুশ ধরি ॥  
ত্রিলোচনা অর্ধচন্দ্র কপাল-ফলকে ।  
চমকিত বিশু বিশুনাথের চমকে ॥”

কালীকৈবল্যদায়িনী মাতঙ্গীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

“পদ্মাসনা শ্যামা রক্তবসনা মাতঙ্গী ॥  
চতুর্ভুজা ধড়া-চর্খ-পাশাকুশ-ধরা ।  
ত্রিলোচনী মুক্তকেশী মৃগাক্ষ-শেখরা ॥”

হেমবাবু মাতঙ্গীর এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

“সুচারু মনোহর, হের নিকটে তার  
অন্য ভুবন কিবা দোদুল্য গগনে ।  
বীণা বাজিছে করে, বাদনে ধরে ধরে,  
কুস্তল দলমল স্তম্ভর বদনে ॥  
কলহংস-শোভা-সম, শেতমালা নিরূপন,  
শ্যামাঙ্গী শেখের মালা মুই করে পরেছে ।





প্ৰীতি তুলি ভবতলে, সৰ্ব জীব দুঃখ মলে,  
মাতঙ্গীৰ ৰূপে সতী পদ্মমলে বসেছে ॥”

সত্যোৰ অনুরোধে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, কোন কোন স্থলে হেমবাবুও পূৰ্ববৰ্ত্তী কবি কৰ্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন।

হেমবাবু ছিনুমন্তাৰ ৰূপ বৰ্ণনা কৰিতেছেন,—

“হেৰ আৰ উৰ্দ্ধ দেশে, মদনোন্মত্তাৰ বেশে,  
ছিনুমন্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ কধিৰে ॥  
বিকট উৎকট স্ফুৰ্ত্তি— \* \* \* \*  
জগতের সৰ্বপাপ নিজ অঙ্গে ধৰিয়া ॥”

কালীকৈবল্যাদায়িনী ছিনুমন্তাৰ ৰূপ এইৰূপে বৰ্ণনা কৰিয়াছেন,—

“স্তবে তুষ্টা হয়ে দেবী কৰিলা অভয়।  
চিন্তা নাই স্তম্ভ হও ক্ষুধা শাস্তি\* হয় ॥  
এত বলি নিজ মুণ্ড কৰিয়া ছেদন।  
আপনার বাম করে কৰিলা ধারণ ॥  
কণ্ঠ হইতে তিন ধারা তিন দিকে ধায়।  
এক ধারা ছিনুমন্তা অতি স্তম্ভে ধায় ॥  
দুই ধারা দুই গৰী স্তম্ভে করে পান।  
নিজ-বস্ত্রে কুধানল কৰিল নিৰ্ব্বাপ ॥”

এইৰূপে হেমবাবু কখনও বা পূৰ্ববৰ্ত্তী কবিগণকে পরাজিত কৰিয়াছেন, কখনও বা তাঁহাদের কৰ্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি শুদ্ধ পুৰাণের মধ্যো নিজ-কল্পনা কাৰাবদ্ধ কৰিয়া রাখেন নাই। তিনি নিজে কয়েকটি অদ্ভুত বস-বহন চিত্ৰের সৃষ্টি কৰিয়াছেন। আমরা নিম্নে এইৰূপ দুই তিনিটি চিত্ৰের উল্লেখ কৰিতেছি।

(ক) যেখানে মহাদেব সৃষ্টির আচ্ছাদন অপসারিত কৰিতেছেন এবং বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু একে একে শিব-দেহে প্ৰবিষ্ট হইতেছে, সেখানে কবির কল্পনা এক সুন্দর ও অদ্ভুত চিত্ৰের সৃষ্টি কৰিয়াছে।

“শুগরোধ কৰি তীন শুধিলেন অচিৰে।  
বিশু-অঙ্গ লুকাইল মহাকাল-শরীৰে ॥  
একে একে জগতের আভরণ থগিল।  
চন্দ্রতারা রশ্মি মেঘ অন্ন-গনে ডুবিল ॥  
\* \* \* \*  
স্বৰ্গপুৰী রসাতল হিমালয় ছুটিল।  
ধারাধারা বস্তুধারা শিব-অঙ্গে মিশিল ॥  
ঘুরে ঘুরে শূন্য পথে বিশুকায় ধায় রে।  
ধরে ধেন অরণ্যে পন্নবেতে ছায় রে ॥”

\* দেবী ছিনুমন্তাৰূপে ক্ষুধায় অস্তিত্ব হইয়াছিলেন। কিছুতেই তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই।



(খ) কবি আর এক স্থলে স্রষ্টির ও সভ্যতার আদিম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

“হেন বেগে বিশ্ব যুরে নাহি ধরে করনা ।  
 ধূমকেতু ভীষণগতি নহে তার তুলনা ॥  
 আপনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপরি ।  
 স্রোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী ॥  
 সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে ।  
 কৃমি-কীট প্রাণিকায় জন্মে সে কলোলে ॥  
 বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে ।  
 ঘোররূপা মহাকালী গ্রাসে মুখব্যাদানে ॥  
 অঙ্গ হ’তে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে ।  
 করালবদনা কালী নৃত্য করে হৃৎকারে ॥”

(গ) কবি আর এক স্থলে সভ্যতার প্রথম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

“কেহ নিজ মুণ্ড কাটে, জ্বীয়ে পুনঃ রক্ত চাটে,  
 শাকিনীরূপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া ।  
 \* \* \* \* \*  
 কালীর সঙ্গিনী রঙ্গে, ছুটিছে তাদের সঙ্গে  
 খিলি খিলি হাসি মুখে, কি বিকট ভঙ্গিমা :  
 মুখে মুণ্ড চিবাইয়া, করে করতালি দিয়া  
 ডাকিনী খাইছে রক্ত—স্বস্তনী রক্তমা !  
 \* \* \* \* \*  
 জড় প্রকৃতির ছলে, শিবদেহ পদতলে—  
 নৃমুণ্ডমালিনী কালী হৃৎকারি নাচিছে ।  
 গংহার-নিরূপণ, বদনেতে বিদারণ  
 শিশু-কর কড়মড়ি চর্ব্বণে গিলিছে ।

(ঘ) বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু বিশ্বে প্রত্যাবর্তন করিতেছে,—

“ধীরে মলয় বায়ু প্রবাহিল স্বননে ।  
 ধরণী ধরিল শোভা মহাসা বদনে ॥  
 কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে ।  
 ছুটিতে লাগিল পুনঃ স্রোতধারা তরসে ॥  
 পতঙ্গ, কীট, পশু, পুনঃ পেয়ে চেতনে ।  
 গঞ্জিল চিতস্থখে প্রকটিত জীবনে ॥  
 মিলাইল দশ রূপ উমা-রূপ ধরিল ।  
 হরগৌরী-রূপে সতী হিমালয়ে উদিল ॥”

আমরা এক্ষণে হেমবাবুর ভাষার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। যে ভাষাতে ভাবের ছায়া স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়, তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাষা বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভাষাকে ইংরাজীতে ভাবের প্রতিধ্বনি কহে। নর্তকীর নৃত্য কখন জড়, কখন বা



'Now pursuing, now retreating  
Now in circling troops they meet.'

"Slow melting strains their queen's approach declare."

“ বৃদ্ধ বৃদ্ধ গুণেন অক্ষুণ্ণি ক্ষুরণে ।  
সরিং পুৰাণি জ্ঞানর বাদনে ॥  
কণ্ঠ কণ্ঠ নিকণ্ঠ কোমলে মিলিয়া ।”

“कदमे एक गर्जन मधुमे छुटिया ।”

“আনন্মে তরুণুল যজ্ঞরি হাশিল।  
আনন্মে তরু-ডাল বিহঙ্গে সাচ্ছিল ॥”

“মৃদু হাসি রঞ্জিত মহাদেব-বদনে ।  
বিচলিত কৈলাস মৃদু মৃদু চলনে ॥  
দীপ্ত মৃদুল গতি কৈলাস চলিল ।  
মধ্য প্রগল-ভাগে শিবপত্নী বসিল ॥”

আবার যখন ভয়ানক বা বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে, তখন হেমবাবুর ভাষার মধ্যেও সেই ভয়ানক ও বীভৎসের ছায়া পড়িয়াছে,—

“ শক্তি শমুক শীঘ্র,  
 মুখব্যাধান ফাঁক  
 রক্ত জলধিদেহ লেহি লেহি চলিছে ।  
 পনুগ অতীশন  
 ফণা-পুসারন  
 উৎকট গর্জন তরঙ্গে দুলিছে ॥  
 কূর্ককনঠি কুট  
 উদ্ভিতে লটপট  
 লোহিত ভূষা দর সংপট চলিছে ॥”



এইরূপে আরও বহুতর স্থলে ভাষার উৎকর্ষ দেখা যাইতে পারিবে। এক্ষণে চরিত্র-বিন্যাস-সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া আমরা সমালোচনার উপসংহার করিব। আমাদের বিবেচনায় দশমহাবিদ্যার পুথন কয়েকটি পরিচ্ছেদে শিবের শিব স্বংরক্ষিত হয় নাই। যিনি দেবাদিদেব জগৎগুরু, তিনি স্ত্রী-শৌকে অবীর হইয়া—

“ ছুড়ে ফেলি হাডমাল, করে দলি ভগ্নাঙ্গাল,  
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া। ”

এখানে মহাদেবকে নিতান্ত প্রাকৃতজনের ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাব্যংশে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি দশমহাবিদ্যার সর্বোৎকৃষ্ট অংশ। বঙ্গভাষায় একপ হৃদয়বিদারক স্রমবুর বিলাপ আর কোথাও আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।—

“ হরম সুধাগম, হৃদয় উচাটিত,  
দম্পতী পরিণয় বাসে।  
কত সুখে যাপন, অহরহ বৎসর,  
দক্ষ-দুহিতা ছিল পাশে ॥  
কতবিধ খেলন, মুরতি পুকটন,  
ভুলাইতে শব্দর ভোলা।  
ধাকিবে চিরদিন, হৃদিপটে অঙ্কন,  
সে সব বিলসিত নীলা ॥  
\* \* \* \* \*  
সেই যোগ-মাধন, কি হেতু ঘুচাইলি,  
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।  
কি হেতু ত্যাগিলি, কেনই সমাপিলি,  
সে সাধ এতদিন পরে ॥ ”

এই সমস্ত কবিতার এক একটি পদ বঙ্গসাহিত্যরূপ নূতন কাননে এক একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প, কিন্তু আমাদের মনে হয়, যেন দেবাদিদেব জগৎস্রষ্টা মহাদেবের মুখে এ কথাগুলি তাদৃশ শোভা পাইতেছে না। আমরা স্বীকার করি, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র শিবের যে অবমাননা করিয়াছেন, হেমবাবু তাহা হইতে শিবকে অনেক উচৈচ রাখিয়াছেন; কিন্তু শিবকে আরও উচৈচ রাখিলে শিবের সম্মান রক্ষা করা হইত। দেখুন, ঐরূপ অবস্থায় কালিদাস শিবকে কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। কালিদাসের শিব সতী-শৌকে ক্রন্দন করিতেছেন না। তিনি হৃদয়ের শোক হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া তপোমগ্ন আছেন। দেবদাক্ষ-তলে, ব্যাধুচর্য পরিধান করিয়া মহাদেব তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। তিনি আজি বীরাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দেহে, বদনমণ্ডলে শৌকের, বিষাদের বা বিলাপের চিহ্নমাত্র নাই। তিনি বীর, স্থির ও নিশ্চল।

“ অদৃষ্টসংরস্তমিবাধুবাহম্  
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।  
অস্তচরাণাং মরুতাং নিরোধান  
নিবাতনিকম্পমিব প্রদীপম্ ॥ ”



মহাদেব অবৃষ্টিসংরক্ত মেঘের ন্যায়, তরঙ্গবিহীন সমুদ্রের ন্যায়, নিবাতনিকম্প পুন্দ্রীপের ন্যায়। কালিদাস এখানে শোকের বর্ণনা করিয়াও শিবের শিবত্ব অকুণ্ণ রাখিয়াছেন। যদি হেমবাবু পুরাণোক্ত শিব-বিলাপ বর্ণনা না করিয়া কালিদাসের শিব-চিত্র আমাদের সম্মুখে তাঁহার অনুপম ভাষায় বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে 'দশমহাবিদ্যা' আরও মহামূল্য ও নিরবদ্য হইত।

আমরা নিরপেক্ষভাবে যথাশক্তি হেমবাবুর কাব্যের দোষগুণ বিচার করিলাম। যদি কেহ আমাদের সমালোচনা এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদের সহিত স্বীকার করিবেন যে, 'দশমহাবিদ্যা' বঙ্গভাষায় এক অতি উজ্জ্বল রত্ন।

[বাকুব, ১২৮৯]

## সমালোচনা ও সমালোচক

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

কোনও দ্রব্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার সমালোচনা করা প্রয়োজন। সভ্যজগতে দ্রব্যমাত্রেরই যথাসম্ভব স্বরূপ নির্ণীত হওয়া আবশ্যিক; সুতরাং সমালোচনা অবশ্যস্তাবী। মনুষ্যের চিন্তা-শক্তি তাহার জ্ঞানমাত্রের মৌলিক কারণ। সমালোচনা চিন্তা-শক্তি-পরিচালনের নামান্তর মাত্র। জ্ঞান-মাত্রেরই মূলে সমালোচনা স্বতঃ-নিহিত। সমালোচনা-রূপ সোপান-দ্বারাই মনুষ্য জ্ঞান-রূপ উচ্চ শৈলে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। সমালোচনা ব্যতিরেকে জ্ঞান অসম্ভব। বস্তু হইতে অবস্তু বা অবস্তু হইতে বস্তু-জ্ঞান জন্ম। বস্তু কি জানিতে হইলে অবস্তু কি, ইহা জানাও একরূপ অপরিহার্য; অর্থাৎ, উভয়ের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ কি, ইহা স্থির করার প্রয়োজন। এই স্বরূপ ও সম্বন্ধ-স্থিরীকরণ-প্রক্রিয়াকেই সাধারণতঃ সমালোচনা বলি। সমালোচনা-প্রক্রিয়া প্রধানতঃ কিরূপে সম্পাদিত হয় ও তাহার মৌলিক প্রকৃতি কি, প্রথমতঃ তাহারই আলোচনা করিব।

পদার্থ-তত্ত্ববিৎ স্থির করিলেন যে, পদার্থ (Matter) \* আর কিছুই নয় —কতকগুলি স্বরূপ বা ধর্মের (Properties) সমবায়মাত্র। এই স্বরূপ

\* বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে পদার্থের সাধারণ ও স্থূল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পদার্থের মূল্য তত্ত্ব-বস্তু 'ন্যায়দর্শনে'র তর্কে প্রবৃত্ত হই নাই।



বা ধর্ম দ্বিবিধ—স্থির ও অস্থির। স্থির ধর্ম,—যথা, ভার, বিস্তার, স্থানরোধকত্ব, বিভাজ্যতা, স্থিতিস্থাপকত্ব ইত্যাদি। অস্থির ধর্ম,—যথা, আকর্ষণীয়তা, পুসারণীয়তা, ঘনতা, তরলতা, শীতলতা, উষ্ণতা, কাঠিন্য, কোমলতা ইত্যাদি।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পদার্থের এই সকল স্বরূপ বা ধর্ম মূলতঃ কিরূপে স্থিরীকৃত হইল। ভারত্ব বা স্থানরোধকত্ব, বিভাজ্যতা বা স্থিতিস্থাপকত্ব, তরলতা বা কাঠিন্য—এবংবিধ এক-একটি স্বরূপের যে অস্তিত্ব আছে, বৈজ্ঞানিক কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন? উত্তর,—পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা। কিন্তু সেই পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার পুঙ্খতি ও পুঙ্খরূপ কিরূপ? সুক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিলে অনুভূত হইবে যে, কোন একটি স্বরূপের ভাব উপলব্ধি বা নির্ণয় করার পূর্বে বা অন্ততঃ সন্দেহ সন্দেহই তাহার বিপরীত ভাবের কল্পনা করা অপরিহার্য। ভারত্ব কি জানিতে হইলে যুগপৎ ভারশূন্যত্বের কল্পনা করিয়া উভয়ের পার্থক্য অনুভব করি, নতুবা ভারত্বের ভাব কিরূপে বুঝিব? কোমলতার সহিত কাঠিন্যতার বা কাঠিন্যতার সহিত কোমলতার পার্থক্য-নুভূতিই কোমলতা বা কাঠিন্যতার ভাব হৃদয়ঙ্গম ও স্থিরীকরণের একমাত্র উপায়। এইরূপে, পদার্থের স্বরূপ বা ধর্মের নিরূপণ করিতে তদ্বিপরীত স্বরূপের সহিত তাহার তুলনা করিয়া সম্বন্ধ স্থির করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বরূপ-নির্ণয়ের সন্দেহ সন্দেহই সম্বন্ধ-নির্ণয়-পুঙ্খতির আরম্ভ; অথবা স্বরূপ-নিরূপণ ও সম্বন্ধ-নির্ণয় উভয়ই পরস্পরের অনুগামী। একটির সহিত অপরটির স্বাভাবিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ বা বিশিষ্ট-পুঙ্খতিই মূলতঃ সমালোচনা। কথাটা পরিষ্কার হইল না, ওটিকতক উদাহরণ দেওয়া আবশ্যিক।

### ১। বৈজ্ঞানিক 'গতি'র লক্ষণ স্থির করিতেছেন,—

“এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়ার নাম গতি (Motion)। মনে কর, যেন আমি কোনও গৃহে বসিয়া আছি, তখন তোমরা আমাকে স্থির বা গতিবিহীন বলিতে পার; কিন্তু তাহার পর যখন আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করি, তখন আমার অবস্থার নাম 'গতি'। আর, এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকার নাম 'স্থিতি'। এই গতি ও স্থিতি নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ বা পুত্যাঙ্ক উভয়ই হইতে পারে। গতি বা স্থিতি নিরপেক্ষ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সচরাচর সাপেক্ষ গতি বা সাপেক্ষ স্থিতিই পুত্যাঙ্ক করিয়া থাকি, সেই জন্য ইহাদিগকে পুত্যাঙ্কও বলে। যখন কোন একটি বস্তু চলিতেছে, আর একটি স্থির রহিয়াছে দেখিতেছি, তখন তুলনায় বলি—এ চল, ও স্থির; সুতরাং একের গতি ও অপরের স্থিতি পরস্পরের সাপেক্ষ।”\*

### ২। পরন্তু সাহিত্য-সমালোচক গীতিকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন,—

“যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক—তাহার সমুদয়ংশ কখনও ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা জিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই জিয়া এবং কথা নাটককল্পের শুমগী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে,

\* পদার্থবিজ্ঞান, পৃথক ভাগ; শ্রীকানাইলাল দে, রায় বাহাদুর পুনীত। ১৮৭৪।



সেটুকু গীতিকাব্য-পুণ্ডিতের সান্নিধ্য। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুভব অথচ তাবাপন ব্যক্তির রূপ হৃদয়-মধ্যে উজ্জ্বলিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে, ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্য এই একটি প্রধান পুণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। \* \* \* সত্য বটে যে, গীতিকাব্য-লেখককেও বাক্যের দ্বারা রসোজ্জ্বল করিতে হইবে, নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।”\*

৩। পক্ষান্তরে রাজনীতিবেত্তা উৎকৃষ্ট শাসন-পুণ্ডিতের লক্ষণ-স্বীকরণ-পুস্তকে ‘উন্নতি কি’ বুঝাইতেছেন,—

“স্বাধীন ও তত্ত্ব অনুসরণে কিছু উন্নতির অন্তর্ভুক্ত। \* \* \* কোন বিষয়ের উন্নতির সহিত তত্ত্বমতে স্বাধীন স্বভাবতঃ সংশ্লিষ্ট। কোন বিষয়-বিশেষের উন্নতির জন্য স্বাধীন স্বংসীকৃত হইলে তৎসহিত অন্যান্য বিষয়ের উন্নতিরও স্বংস সংশ্লিষ্ট হয়। এই স্বংসজনিত ক্রতির তুলনায় প্রাপ্ত উন্নতি যদি মূল্যহীন হয়, তাহা হইলে একপ বুদ্ধিতে হইবে যে, কেবলমাত্র স্বাধীন উপেক্ষিত হয় নাই, তাহার সঙ্গে সাধারণতঃ উন্নতির সম্বন্ধেও মন উপস্থিত হইয়াছিল। \* \* \*

অপিচ, শৃঙ্খলা উন্নতির অন্তর্গত। কিন্তু উন্নতি শৃঙ্খলার অন্তর্গত নহে। শৃঙ্খলা (Order) যাহা অতি অল্প পরিমাণে সম্পাদন করে, উন্নতির দ্বারা তাহা অধিক পরিমাণে সম্পাদিত হয়। \* \* \* উন্নতি-সাধনার্থে শৃঙ্খলা অন্যতম উপায়মাত্র; কেন-না, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করিতে হইলে যে পরিমাণে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্তমান আছে, তাহার রক্ষা করা একান্ত আবশ্যিক। ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে যাহাতে শক্তির ধনের অপচয় না হয়, তাহাই করা সর্বপ্রায়ে কর্তব্য। অতএব শৃঙ্খলা উন্নতির অংশ ও উপায়মাত্র, উন্নতির অনুরূপ উদ্ভিষ্ট বিষয় নহে।”†

৪। দার্শনিক অতঃপর তুলনা-দ্বারা ‘দর্শন’ ও ‘বিজ্ঞান’এর পুণ্ডিত দেখাইতেছেন,—

“দর্শন বিজ্ঞানের অন্তর্গত নহে, এবং বিজ্ঞানও দর্শনের শাখা নহে। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় বিনিষ্টতা সত্ত্বেও তাহার স্বতন্ত্র। নীতি-বিজ্ঞান মনুষ্যের নৈতিক বা ধর্মপুঙ্খপূর্ণ ভাব-সমূহের ‘দৈর্ঘ্যপুঙ্খ’ পরিমাপ করে; কিন্তু নীতি-দর্শন উক্ত ভাবনিচয়ের উচ্চতম ও গভীরতম স্থল-নিহিত আভ্যন্তরিক সত্তার পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত। পুঙ্খপূর্ণ ভাব-পরম্পরার একত্র অস্তিত্ব ও পারস্পরিক আবির্ভাব এবং এতদুভয় হইতে যে সকল সাধারণ নিয়ম নিকালিত হয়, তাহারই আলোচনা করা বিজ্ঞানের অধিকার। বিজ্ঞান ভাব-পরম্পরার সংযোজন-শৃঙ্খল ও তাহাদিগের অন্তর্ভুক্তি-নিহিত সার-সত্তার আলোচনায় পুঙ্খ হয় না; কিন্তু দর্শন এতদুভয়েরই অনুসরণ-দ্বারা সমগ্র নৈতিকপুঙ্খপূর্ণ চরম উদ্দেশ্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করে। বিজ্ঞান একপ চেষ্টাকে বুঝা ও নিক্ষেপ বলা সত্ত্বেও দর্শন উহা হইতে বিরত হয় না।”‡

\* বিবিধ সমালোচনা; শ্রীবক্তিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১৮৭৬।

† Considerations on Representative Government, by J. S. Mill.

‡ Ethical Philosophy and Evolution, by Professor W. Knight. Vide “The Nineteenth Century,” No. 19, Sept., 1878.



আমরা উপরে চারিখানি ভিন্ ভিন্ পুস্তক হইতে চারিটি ভিন্ ভিন্ বিষয়ের সমালোচনা যথাক্রমে উদ্ধৃত ও অনূদিত করিয়া দিয়াছি। প্রথমতঃ, স্থিতির সহিত গতির তুলনা-দ্বারা বৈজ্ঞানিক গতির সাধারণ লক্ষণ ও ধর্ম বুঝাইলেন। স্থিতির 'স্থিতিত্ব'-হেতুই গতির গতিত্ব; অতএব গতি কি বুঝিতে হইলে স্থিতির প্রকৃতি-অনুধাবনও আবশ্যিক; সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ পর্যালোচনা করা অপরিহার্য্য।

দ্বিতীয় সমালোচনা গীতিকাব্যের। সমালোচক গীতিকাব্য কি স্থির করিতে নাটক ও মহাকাব্যের আংশিক স্বরূপ-নির্ণয় করিলেন; যে হেতু নাটক ও মহাকাব্য কি পদার্থ, ইহা কিয়ৎ পরিমাণে না বুঝিলে গীতিকাব্যের প্রকৃতি উৎকৃষ্টরূপে অনুভূত হয় না। গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও নাটক—তিনই কাব্য। ভিন্ ভিন্ প্রকৃতি-অনুসারে ভিন্ ভিন্ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনেরই পারস্পরিক অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অতএব একটির লক্ষণ-নিকূপণার্থ অবশিষ্ট দুইটির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি উদ্ঘাটন করা আবশ্যিক।

তৃতীয় উদাহরণ—উন্নতি কাহাকে বলে? শুভ বা মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হওয়ার নাম উন্নতি এবং তাহা হইতে বিচ্যুতির নাম অবনতি। উন্নতি-সাধনার্থ অবনতি-নিবারণ করা প্রথমেই আবশ্যিক। অগ্রসর হওয়ার পূর্বে যদ্বারা পশ্চাৎপদ হওয়ার কারণ বিদূরিত হয়, এমন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। নতুবা প্রকৃত-পুস্তাবে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অগ্রসরণই উন্নতি, পশ্চাৎপতনই অবনতি। সুতরাং অবনতির কারণ বিনাশ্যমানে উন্নতি অসম্ভব। অস্বাধ্য ও বিশৃঙ্খলা অবনতির কারণ; সুতরাং উন্নতির অন্তরায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বাধ্য ও শৃঙ্খলা ভিন্ অস্বাধ্য ও বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ অবনতি নিবারিত হওয়া অসম্ভব; সুতরাং উন্নতির সহিত স্বাধ্য ও শৃঙ্খলার অপরিহার্য্য ঘনিষ্ঠতা বর্তমান। অতএব উন্নতি কি, ব্যাখ্যা করিতে স্বাধ্য ও শৃঙ্খলার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ, তাহা আলোচিত হইয়াছে।

আর, চতুর্থ বা শেষোক্ত উদাহরণটিতে বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের তুলনা। উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য-নির্ণয়। এই উদাহরণটি পূর্বোক্ত উদাহরণ-ত্রয়ের সম্পূর্ণ অনুরূপ; কেবল এই মাত্র বিভিন্নতা যে, ইহাতে সম্বন্ধ-নিকূপণার্থ স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, স্বরূপ-নির্ণয় ও সম্বন্ধ-নিকূপণের প্রক্রিয়া পরস্পরে সম্বন্ধ, —একটি অপরের অনুগামী, অথবা একের সম্পাদনার্থ অপরের সাহায্য প্রয়োজন। উপরি-উক্ত প্রথম তিনটি উদাহরণে, স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে; আর চতুর্থ উদাহরণে সম্বন্ধ-স্থিতিকরণ-উদ্দেশ্যে স্বরূপের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ফলতঃ উভয় দিকেই প্রক্রিয়া প্রায় একই প্রকার। স্বরূপ-নিকূপণার্থ যেমন সম্বন্ধের আলোচনা করার প্রয়োজন, সম্বন্ধ-নির্ণয়-হেতু তেমনি স্বরূপের তত্ত্বানুগতান আবশ্যিক। স্বতাবতঃই একটি কর্তৃক অপরিষ্কার আকৃষ্ট হয়।



পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতেই যাবতীয় পদার্থের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। অতএব সেই 'সম্বন্ধ'এর পর্যালোচনা-দ্বারা সমালোচনার মৌলিক প্রকৃতির আরও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতে এবং তদ্বারা সমালোচন-প্রক্রিয়া সাধারণতঃ যেক্রমে সম্পাদিত হয়, তাহা আরও কিয়ৎপরিমাণে দেখাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

পার্থক্য ও সাদৃশ্য সম্বন্ধেরই অন্তর্গত, এবং বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগের ও জাতি-নির্বাচনের মূল ভিত্তি। অপিচ, পার্থক্য ও সাদৃশ্যানুভূতি হইতেই মনুষ্য-জ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশ। অতএব পদার্থগত অন্যান্য সম্বন্ধের উল্লেখ করিবার পূর্বে পার্থক্য ও সাদৃশ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যিক।

পার্থক্য। সংসারে যত প্রকার দ্রব্য আছে, অর্থাৎ যত প্রকার দ্রব্য এ পর্যন্ত মনুষ্যের জ্ঞানধীনে আসিয়াছে, তাহাদিগের সকলেরই এক একটি স্বতন্ত্র নাম আছে। দ্রব্যমাত্রই এক একটি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হওয়ার কারণ কি? কারণ—তাহাদিগের পারস্পরিক পার্থক্য বা বিভিনুতা। আলোক ও অন্ধকার বিভিনু পদার্থ, এই কারণেই এতদুভয়ের স্বতন্ত্র নাম। আলোককে আলোক বলা যায়, কারণ উহা অন্ধকারের প্রতিদ্বন্দী। আলোক ও অন্ধকার একই পদার্থ হইলে, উহাদিগের স্বতন্ত্র নাম দিবার কিছুমাত্র আবশ্যিকতা হইত না। আলোক অন্ধকার হইতে সম্পূর্ণ বিভিনু, এই কারণেই অন্ধকার ও আলোকের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব। রান শ্যাম হইতে বিভিনু, এই কারণেই শ্যামের ন্যায় রানেরও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে বিভিনু, এই কারণেই ক্ষুধা তৃষ্ণা দুইটি স্বতন্ত্র নাম। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, পার্থক্য বা বিভিনুতা-দ্বারাই পদার্থমাত্রের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব বা ব্যক্তিত্ব স্থিরীকৃত হয়। ভিনু ভিনু প্রকৃতি-অনুসারে ভিনু ভিনু পদার্থের ভিনু ভিনু নাম দেওয়া হয়।

অনেক বস্তু আছে, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিভিনুতা সুস্পষ্ট ও প্রবল; আবার অনেক বস্তু আছে, তাহাদিগের বিভিনুতা অতি অল্প ও ক্ষীণ। অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক, বস্তুমাত্রেরই কোনও না কোনরূপ পারস্পরিক বিভিনুতা আছে; তজ্জন্যই তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব।

দ্রব্যমাত্রের পারস্পরিক বিভিনুতার আধিক্য ও অল্পতানুসারে তাহাদিগকে তুলনা-করণোপযোগী পর্য্যবেক্ষণের তারতম্য হয়। সূর্য্য কিংবা চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রগুলির বাহ্যতঃ যে বিভিনুতা, তাহা উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অগ্নায়াস-সাধ্য; কিন্তু নক্ষত্রগুলির পারস্পরিক পার্থক্যানুভব করিতে হইলে কিঞ্চিদধিক পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা-শক্তি পরিচালন করা আবশ্যিক। একটি হস্তীর সহিত একটি পিপীলিকার সাধারণতঃ যে যে অংশে বিভিনুতা, তাহার নির্ণয় করা যেক্রমে সহজ, দুইটি পিপীলিকার আকৃতিগত পারস্পরিক পার্থক্য স্থির করা অবশ্য সেক্রমে সহজ নহে। তিজ্জ ও মধুরে যে আত্মদগত পার্থক্য, তাহা অতি অল্প আয়াসেই স্থিরীকৃত হইতে পারে; কিন্তু দুইটি 'মধুর'এর কোন্টি কতটুকু মধুর, ইহা প্রভেদ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিচক্ষণতা আবশ্যিক হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সকল স্থলে পার্থক্যের অল্পতা, সেই



মকল স্থলে উক্ত পার্থক্য-নিরূপণ করিতে পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা ও চিন্তা-শক্তির নিপুণতার প্রয়োজন হয়।

বস্তুসমূহের নিকট-সমাবেশ-দ্বারা তাহাদিগের পারস্পরিক পার্থক্যের অধিকতর স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। দুইটি গোলাপ পুষ্প পাশাপাশি রাখিয়া একটু সূক্ষ্মরূপে তুলনা কর, দেখিবে, উভয়ের আকার, বর্ণ ও সৌরভগত একতাদিক্য সত্ত্বেও গোলাপ দুইটির মধ্যে কোন-না-কোন অংশে কিছু-না-কিছু বিভিন্নতা আছে। সম্মুখে ঐ স্ফটিকাধার ভেদ করিয়া বস্তিকালোক সমগ্র-গৃহে প্রতিফলিত হইয়াছে। আলোকটি সম্যক্ ঔজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। কিন্তু গৃহ-মধ্যে এক্ষণে যদি একটি বাষ্পীয়ালোক আনীত হয়, তাহা হইলে বস্তিকালোকের ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তির হ্রাস হইবে। তাহাকে আর আলোকের পূর্ণ আদর্শ বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। পক্ষান্তরে, বাষ্পীয়ালোকের সন্নিহিতে একটি তাড়িতালোক সংস্থাপিত হউক, বস্তিকালোকের ন্যায় বাষ্পীয়ালোকও দুর্বল হইয়া পড়িবে, এবং তাড়িতালোকের ঔজ্জ্বল্যই তখন পূর্ণ ও পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। এক্ষণে বস্তিকালোক, বাষ্পীয়ালোক ও তাড়িতালোক—এই তিনের মধ্যে যে পারস্পরিক বিভিন্নতা, তাহা তাহাদিগের একত্র সমাবেশ-দ্বারাই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারি। প্রত্যুত, আলোকত্রয়ের একত্র সংস্থাপন কখন প্রত্যক্ষ না করিলে তাহাদিগের পারস্পরিক বিভিন্নতা কদাপি বিশদরূপে অনুভব করিতে পারিতাম না।

শকুন্তলা ও সাবিত্রী দুইটি স্বতন্ত্র চিত্র। চিত্রদ্বয়ের সমাবেশ-দ্বারা উভয়ের সৌন্দর্যগত পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি। শকুন্তলা ও সাবিত্রী উভয়েই পুণ্যের জীবন্ত প্রতিকৃতি,—পবিত্রতা ও কমনীয়তার অনন্ত আবাসস্থল,—উভয়েই আয়োৎসর্গের জীবন-সঞ্জীবনী প্রতিমা,—কবি-কল্পনা-প্রসূত মনোমোহিনী স্রষ্টি। শকুন্তলা সুন্দরী, সাবিত্রীও সুন্দরী। শকুন্তলার পার্শ্বে সাবিত্রী দাঁড়াইলেন। সৌন্দর্যের সহিত সৌন্দর্য মিলিল।

তাড়িতালোকের মিলনে বাষ্পীয় ও বস্তিকালোক যেরূপ ক্ষীণপূত হয়, এ স্থলের মিলন সেরূপ নহে। সাবিত্রীর সৌন্দর্য-দ্বারা যেমন শকুন্তলার সৌন্দর্যের হ্রাস হয় না, শকুন্তলার সৌন্দর্য তেমন সাবিত্রীর সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ থাকে; অথচ উভয়েরই সৌন্দর্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে।—পার্থক্য আছে বলিয়াই উভয় চিত্রের সমাবেশ অধিকতর সুন্দর। আর সেই পার্থক্য নিরূপণ করিবার জন্যই উভয়ের সমাবেশ ও সমালোচন আবশ্যক।

সাদৃশ্য। একটি বস্তুর সহিত অপর একটি বস্তুর পার্থক্যানুভূতিই তত্ত্ব-বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রারম্ভ। পক্ষান্তরে, বস্তুসমূহের পার্থক্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রামের ব্যক্তিত্ব শ্যামের ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্ হওয়া সত্ত্বেও রাম ও শ্যাম অনেক অংশে সদৃশ; কেন-না, উভয়েই মনুষ্য; উভয়েরই চক্ষু-কর্ণাদি সমান ইন্দ্রিয় আছে; উভয়েই চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট ইত্যাদি। একটি বৃক্ষ



অপর একটি বৃক্ষের সদৃশ। এক দিন অপর এক দিনের তুল্য। বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশ-নন্দিনী ও কটের আইভ্যান্‌হো সমশ্রেণীর কাব্য।

উপরে যে কয়েকটি পদার্থের নাম উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের সাদৃশ্য অবশ্য পার্থক্যের সহিত বিজড়িত; যেহেতু পার্থক্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র বস্তুই অসম্ভব।

রামের সহিত শ্যামের অনেক অংশে সাদৃশ্য থাকিলেও অনেক অংশে পার্থক্য আছে। একটি বৃক্ষ অপর একটি বৃক্ষের অনুরূপ হইলেও পুখমাটি হয়ত অধিক পল্লব-পত্রবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়টি অধিক ফল-পুষ্পযুক্ত। আত্ম ও কাল দুই দিনই একরূপ; কিন্তু অদ্যকার উদ্ভাপ, কল্যাকার অপেক্ষা অধিক; তন্নিম্ন আরও গুরুতর বিভিন্নতা আছে। বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী ও কটের আইভ্যান্‌হো সমশ্রেণীর গ্রন্থ হইলেও ভাষা, ভাব ও কাব্যোন্মিখিত চরিত্রে বহুবিধ পার্থক্য আছে।

পরন্তু কোনও কোনও দ্রব্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে—কেবল অবস্থিতির স্থানভেদে তাহাদিগের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন দক্ষিণ ও বাম হস্ত, উভয়ই সম্পূর্ণ অনুরূপ; কিন্তু স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত, এ জন্য একখানি দক্ষিণ হস্ত ও অপরখানি বাম হস্ত।

এইরূপ কোনও কোনও দ্রব্যের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য ও পার্থক্য অল্প, এবং কোনও কোনও দ্রব্যের মধ্যে ঠিক ইহার বিপরীত; অর্থাৎ, পার্থক্যের আধিক্য ও সাদৃশ্যের অল্পতা পরিলক্ষিত হয়।

দুইটি বালকের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের আধিক্য, কিন্তু একটি বালকে ও একটি বৃক্ষে পার্থক্যই অধিক। পক্ষান্তরে, একটি মনুষ্য ও একটি পশুতে যে পার্থক্য, তাহা আরও অধিক। কিন্তু ইহারা সকলেই জীবনবিশিষ্ট; অর্থাৎ জীবনী-শক্তি ইহাদিগের মধ্যে সাধারণ; সুতরাং সেই অংশে ইহাদিগের সকলেরই পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে; মূলে একতা আছে।

একই ভাষায় লিখিত দুইখানি সমশ্রেণীর কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে যে রূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সহিত ইহাদিগের কাব্য-গ্রন্থদ্বয়ের সেরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। প্রত্যুত, বিলক্ষণ পার্থক্যই লক্ষিত হয়। পরন্তু অপর ভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞান বা কাব্যের সহিত যখন ঐ একই ভাষায় লিখিত তিনখানি গ্রন্থের কাহারও তুলনা করি, তখন পারস্পরিক পার্থক্যের পরিমাণ অধিকতর হয়। কিন্তু গ্রন্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও সেগুলি সকলেই মনুষ্যের চিন্তা-শক্তি-প্রসূত ও মনুষ্য-ভাষায় লিখিত। অপিচ, ইহাদিগের সকলেরই উদ্দেশ্য মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিন্তাকৃষ্টি সাধন করা। এ কারণ, সাধারণতঃ ইহাদিগের পারস্পরিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। মূলতঃ ইহারা সকলেই এক।

এইরূপে দেখা যায় যে একতার মধ্যে বিভিন্নতা ও বিভিন্নতার মধ্যে একতা প্রকৃতির সর্বত্রই বিদ্যমান। একতা হইতে বিভিন্নতা ও বিভিন্নতা হইতে একতা



সমালোচনার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন পুণালী-দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। এই দুই পুণালীর একটির বিশ্লেষণ (Analysis) ও অপরটিকে সংশ্লেষণ (Synthesis) বলা হয়।

আপাততঃ পার্থক্য-ও সাদৃশ্য-সম্বন্ধে আমরা মোটের উপর যে কয়েকটি কথা বলিয়া আলোচনা করিয়াছি, এ স্থলে তাহার সার-সংগৃহ করা আবশ্যিক :—

(১) পার্থক্য-হেতুই ব্যক্তি বা বস্তুমাত্রের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা বস্তুত্ব এবং এই পার্থক্যানুভূতিই মনুষ্য-জ্ঞানের প্রারম্ভ। (২) পদার্থমাত্রের পারস্পরিক পার্থক্যের দ্বারা পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে। (৩) পার্থক্য ও সাদৃশ্যের স্থূলতা ও সুক্ষ্মতা বা ন্যূনাধিক্যানুসারে তাহার নিরূপণোপযোগী পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনের তারতম্য হয়। (৪) তুলনীয় দ্রব্যসকলের সমাবেশ ও সংস্থিতির নৈকট্য তুলনার বিশেষ উপযোগী। (৫) পার্থক্য-ও সাদৃশ্য-হেতু বিভিন্নতার মধ্যে একতা ও একতার মধ্যে বিভিন্নতা।

পার্থক্য ও সাদৃশ্যের কথাঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা হইল ও তাহার সহিত সাধারণ উদাহরণ-দ্বারা সমালোচন-প্রক্রিয়ার একটি অতি স্থূল অংশ কিয়ৎপরিমাণে দেখান গেল। এক্ষণে আমরা পার্থক্য ও সাদৃশ্য ব্যতীত সম্বন্ধের আর কয়েকটি অংশের সামান্যতঃ উল্লেখ করিব।

সম্বন্ধ। দুইটি ভিন্ন সত্তার অস্তিত্বকে পার্থক্য বলি। আর পার্থক্য সত্তেও এক বস্তুর অন্য বস্তুগত যে ধর্মবস্তা, তাহাকে সাদৃশ্য বলি। কিন্তু সম্বন্ধ কি? একটি বস্তুর সহিত অপর একটি বস্তুর সাদৃশ্য ও পার্থক্য বলিলে উক্ত বস্তুদ্বয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ অনুসূচিত হয় সত্য, কিন্তু একের সহিত অপরের সম্বন্ধ বলিলে তাহাদিগের উভয়ের পারস্পরিক পার্থক্য ও সাদৃশ্য ভিন্ন আরও কিছু বুঝায়। অতএব, এক দিকে সাদৃশ্য ও পার্থক্য যেমন সম্বন্ধের অন্তর্গত, অপরদিকে তেমনি আরও কিছু আছে, যাহা সম্বন্ধের অধিকারভুক্ত। সাদৃশ্য ও পার্থক্য বলিলে তুলনীয় বস্তুসমূহের স্বরূপমাত্রেরই সাদৃশ্য ও পার্থক্য বুঝাইতে পারে; আমরাও ঠিক সেই অর্থে উক্ত দুই শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু একটি বস্তুর সহিত অপর একটি বস্তুর সংযোগে উভয়ের পরিবর্তন-দ্বারা বিভিন্ন বা বিমিশ্র প্রকৃতির তৃতীয় আর একটি বস্তুর যে অভ্যুত্থান হয়, এবংবিধ সম্বন্ধসমূহ সাদৃশ্য ও পার্থক্য-সম্বন্ধের অন্তর্ভূত কদাচিৎ হইতে পারে; আর হইলেও তদ্বারা আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয়ের পরিষ্কার ব্যাখ্যা হয় না। এই কারণেই আমরা সম্বন্ধ-শব্দটি স্বতন্ত্ররূপে ও সম্যক্ প্রশস্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি।

অনন্ত বিশ্ব-সংসার অসংখ্য সম্বন্ধ-পরস্পরার সমবায়মাত্র। এই সম্বন্ধসমষ্টি-উদ্ঘাটন-প্রয়াস হইতেই বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি মনুষ্যের যাবতীয় শাস্ত্রের স্রষ্টি। মনুষ্য যে পরিমাণে সম্বন্ধ-পরস্পরার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে প্রকৃতি তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অসীম সম্বন্ধ-শৃঙ্খলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের অধিকার। সমগ্র শৃঙ্খল পরিমাপ করিয়া তাহার প্রকৃতি ও শক্তি নির্ধারণ





করা মনুষ্য-কমতার অতীত। বহিঃপ্রকৃতিগত ও অন্তঃপ্রকৃতিগত যে সকল সম্বন্ধ দর্শন-বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রকর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও বহুবিধ; অতএব সে সমুদায়ের আলোচনা বা উল্লেখ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। কেবল সমালোচনার প্রকৃতি কিরূপ, আর একটু বিশদ করিবার জন্য সম্বন্ধ-ঘটিত কয়েকটি মূল বিষয়ের উল্লেখ করিব।

সম্বন্ধ মোটের উপর দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা,—নিত্য ও পরিবর্তনশীল। অগ্নির সহিত উত্তাপের নিত্য-সম্বন্ধ; কেন-না, অগ্নির সহিত উত্তাপ থাকিবেই থাকিবে; উত্তাপবিহীন অগ্নির অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু অগ্নির সহিত তাহার বর্ণের সম্বন্ধ পরিবর্তনশীল; যে হেতু অবস্থা-ভেদে অগ্নির বর্ণ ভিনু ভিনু প্রকার হইতে পারে। আমরা 'নিত্যসম্বন্ধ'-বিষয়ে একটু আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলেন, নিত্যসম্বন্ধ-জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা কতদূর সম্ভব বলা যায় না। জ্ঞানমাত্রই মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল 'স্বভাবসিদ্ধি বা আত্মপ্রত্যয়' জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। অগ্নিতে ও উত্তাপে নিত্যসম্বন্ধ,—ইহা প্রথমতঃ পরীক্ষা ভিনু মাত্র 'আত্মপ্রত্যয়'-দ্বারা স্থিরীকৃত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

একটু সুস্পষ্টরূপে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, নিত্যসম্বন্ধজ্ঞান একমাত্র স্বতঃ-সিদ্ধ-প্রত্যয়-জনিত নহে,—পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাহার অন্যতম কারণস্বরূপ। প্রথমতঃ পরীক্ষা-দ্বারা অগ্নিতে তাপানুভূতি হইল এবং সকল সময়ে, সকল অবস্থায় ও সর্বত্র অগ্নি হইতে উত্তাপের বিচ্ছিন্নতা কখনই লক্ষিত হইল না। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা-দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মিল যে, অগ্নি ও উত্তাপে নিত্যসম্বন্ধ। এইরূপ পৌনঃপুনিক পরীক্ষা-দ্বারাই ধর্ম-পরম্পরার সমবায়ে নিত্যসম্বন্ধ-বিষয়ক প্রত্যয় জন্মিল। সোডা ও ক্লোরিনের সংমিশ্রণে লবণ প্রস্তুত হয়। ইহাদিগের প্রকৃতিগত এই সম্বন্ধ কখনই বিদ্বস্ত হয় না। যত বার সোডা ও ক্লোরিন একত্র করিলাম, সর্বত্র, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই লবণ প্রস্তুত হইল; সুতরাং সোডা ও ক্লোরিন একত্র হইলেই লবণ প্রস্তুত হইবে, ইহা স্বভাবতঃই প্রত্যয় জন্মিল। অপিচ, ইহাও প্রতীত হইল যে, লবণের পূর্ববর্তী অবস্থা সোডা ও ক্লোরিন, এবং উহাদিগের সংমিশ্রণের পরবর্তী ফল লবণ। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, বিশেষ বিশেষ পদার্থ বা ঘটনা-পরম্পরার সমবায়-দ্বারা অন্যবিধ কতকগুলি পদার্থ বা ঘটনার উৎপত্তি হয়। বলা বাহুল্য যে, পূর্ববর্তী পদার্থ বা ঘটনাগুলি কারণ, আর পরবর্তী পদার্থ-বা ঘটনা-পরম্পরা কার্য্য। এইরূপ কার্য্য-কারণ-নিহিত সম্বন্ধানুসন্ধান হইতেই মনুষ্যের সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান। কারণমাত্রই কার্য্যোৎপাদন-শক্তিসম্পন্ন এবং কার্য্যমাত্রেরই কারণ থাকা একান্ত আবশ্যিক। মনুষ্যের এই সংস্কার পৌনঃপুনিক পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ বা সংক্ষেপতঃ সমালোচনা-দ্বারা লব্ধ। আর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ-পরম্পরার প্রকার-ভেদমাত্র।



দার্শনিকেরা চারি প্রকার কারণ নির্দেশ করেন। এতৎ-সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত আছে। দৃষ্টান্তটি অতি পুরাতন হইলেও কারণ-চতুষ্টয়ের বিশেষ ব্যাখ্যাপ্রয়োজনীয় ; এ কারণ, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।—

কার্য—মুদ্রায় কলস।

১ম কারণ—মৃত্তিকা, অর্থাৎ যে উপাদানে কলসটি গঠিত।

২য় কারণ—চক্র, দণ্ড প্রভৃতি, অর্থাৎ যে সকল যন্ত্রের দ্বারা কলসটি স্বকীয় আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩য় কারণ—কুম্ভকার, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কলস নির্মাণ করিয়াছে।

৪র্থ কারণ—কলসের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জলাদি রক্ষা করা।

একটু অনুধাবন করিলে প্রতীত হইবে যে, এই চারি প্রকার কারণ কলসের চারিটি সম্বন্ধমাত্র।

যে কোনও বস্তু বা বিষয় সমালোচিত হউক না কেন, তাহার আকৃতি, প্রকৃতি, উৎপত্তি-মূল ও উদ্দেশ্য—এই চারিটি বিষয় সাধারণতঃ নির্ণেতব্য।

[ পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯০ ]

## সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি

ঠাকুরলাস মুখোপাধ্যায়

মনুষ্য স্বভাবের সহিত সংগ্রাম করে, অথচ স্বভাবেরই অনুকরণ করে। স্বভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে স্বভাবের অনুকরণ করে। প্রকৃতির উপকরণ লইয়া, প্রকৃতির উপর আধিপত্য করে, বা প্রকৃতির আজ্ঞা পালন করে, অথবা প্রকৃতির প্রয়োজন সাধন, সম্পাদন বা পূরণ করে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করা অর্থে প্রকৃতির আজ্ঞা পালন করা, প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা অর্থে প্রকৃতির অনুকরণ করা ; অনুকরণ করিয়া প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাধন বা পূরণ করা। প্রকৃতির উপকরণ লইয়াই প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণ করা যায়। বাহ্য এবং আন্তর প্রকৃতি ভিনু মানুষ আর কোথায় কি পাইবে? অতি-প্রকৃতি তাহার আয়ত্ত নয়। একটু অনুধাবন করিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান—প্রকৃতি-পর্যালোচনা ; শিল্প-সাহিত্য সেই পর্যালোচনার সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থ অর্থে গ্রন্থি, চিত্র অর্থে ও তাই। প্রকৃতি-পর্যালোচনার ফল, অনুধাবন, অনুকরণ ও বহু দর্শনের ফল, শিক্ষা-দীক্ষা-পরীক্ষার ফল, গ্রন্থে 'গেরো'





দিয়া গেলিখে রাখা হয়—বর্ধমানের স্মরণার্থ, অতীতের গৌরবার্থ, ভবিষ্যতের মঙ্গলার্থ, সভ্যতার উন্নতি ও শ্রীশক্তি-নিমিত্ত। পরন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্য গৃহিত বা গ্রন্থিযুক্ত করা হয়,—জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্যেরই ক্রমবিকাশের সাহায্যার্থ এবং ভিত্তি-স্বরূপে। স্তরের উপর স্তর, তার উপর স্তর। এক স্তরের ফল আর এক স্তর, অথবা এক স্তরে বসিয়া আর এক স্তর নির্মাণ করা হয়। এ সব সহজ কথা, সকলেই বুঝি। তবে সময়ে সময়ে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় এই মাত্র।

শিল্প এবং সাহিত্য স্বভাবেরই অনুধাবন বা অনুকরণ। সাহিত্য, না হয় শিল্পেরই অন্তর্গত হইল, না হয় এক প্রকার শিল্পই হইল, সে কথা হইতেছে না। কথাটা এই হইতেছে যে, উহা স্বভাবের অনুকৃতি বটে। সাহিত্যই এখানে প্রধান বিচার্য। অতএব সাহিত্য কথাই এখান হইতে ব্যবহার করা ভাল। সাহিত্য—স্বভাবের অনুকৃতি। অনুকৃতি বটে, কিন্তু অতিরিক্তও ত বটে। সাহিত্য,—স্বভাবের একটু অতিরিক্ত নয় কি? অতিরিক্ত হইলেই যে বহির্ভূত হয়, অন্তর্ভূত হয় না,—তা নয়। স্বভাবের অন্তর্ভূত অথচ অতিরিক্ত। কথাটা হঠাৎ শুনিতে কতকটা যাব-বিরোধী বটে, তথাচ কথাটা ঠিক। শিল্প-সম্বন্ধেও ঠিক, সাহিত্য-সম্বন্ধেও ঠিক। শিল্প এবং সাহিত্য উভয়ই স্বভাবের অনুকৃত বা অন্তর্ভূত, অথচ অস্বাভাবিক পরিমাণে স্বভাবাতিরিক্ত। স্বভাবাতিরিক্ত অর্থে একেবারেই “দুনিয়া ছাড়া”—তা নয়। স্বভাবের মাল-মসলা লইয়াই স্বভাবাতিরিক্তের সৃষ্টি হয়। যাহা স্বভাবের বহু স্থানে, বহু খণ্ডে বিন্যস্ত, তাহার একত্রীকরণ, সারাংশ সামঞ্জস্য ও সমষ্টিকে এক অর্থে স্বভাবাতিরিক্ত বলা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্য বা আন্তর-প্রকৃতিতে যাহা সচরাচর বা কখনও একাধারে একত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাই স্বভাবাতিরিক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। স্বভাবাতিরিক্ত অর্থে অস্বাভাবিক নয়, সৃষ্টির বহির্ভূতও নয়। ঘোল আনা স্বাভাবিক এবং সম্যকপ্রকারে সৃষ্টি-সম্ভূত। সৃষ্টি-সম্ভূত ও স্বাভাবিক, অথচ সৃষ্টি ও স্বভাবের কিছু অতিরিক্ত। অতিরিক্তটুকু কোথায়? তাহা স্বভাবের সামগ্রীকে মানুষের সাজাইবার কৌশলে,—সংগৃহ করিবার মুন্সিআনায়। মোটের উপর ধরিলে, মোটামুটি হিসাব করিলে, এই কৌশল বা মুন্সিআনাই—শিল্প-সাহিত্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, দোষ, গুণ, দৃশ্য,—সুন্দর মনোহর, ভয়ঙ্কর কুৎসিত কদর্য্য,—মহতের মহৎ, নীচের নীচ,—সংসারে বা স্বভাবে সবই আছে। শিল্প বা সাহিত্য সেই ‘সব’ হইতে ‘রকমারি’ বাছিয়া, ধসিয়া মাজিয়া, ঝালিয়া কাটিয়া ছাটিয়া, চোস্ত দোরস্ত করিয়া, যার পর যোটি বসিলে মানুষের চোখে মানায়, মনের মত হয় ও মনের পরিসর বৃদ্ধি করে, সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, অথচ স্বভাবের সহিত ঘোল আনা সামঞ্জস্য রাখিয়া, স্বভাবের সামগ্রীগুলি নিজেদের বক্ষে ধারণ করে। সাহিত্যের কাট-ছাট এমনতর হওয়া চাই যে, একদিকে তাহা মানুষের মনে ‘মানাইবে’—আর একদিকে স্বভাবের সহিত ঝাপিবে। উভয়ের কেন্দ্রটির ব্যতিক্রম হইলে চলিবে না। মনের ‘মানানগই’ না হইলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য উত্তমরূপে সাধিত হইবে না, স্বভাবের সহিত ঝাপস্তু



হইলেও সেইরূপ ব্যর্থ হইবে ; যাহা স্বভাবের সহিত অধাপত্ত—তাহা অস্বাভাবিক । যাহা অস্বাভাবিক বা নেহাৎ অতি-স্বাভাবিক, তাহা মানুষের মনে ভাল ধরে না । মানুষের মনে ধরে, যাহা স্বভাবাতিরিক্ত অথচ স্বাভাবিক ; শিল্প এবং সাহিত্য মানুষের কৃত, এবং মানুষেরই জন্ম । যাহা মানুষের মনে ধরার উপযোগী, শিল্প এবং সাহিত্যকে তাহাই সংগ্রহ বা সৃষ্টি করিতে হয় । শিল্প এবং সাহিত্য স্বভাব হইতে সামগ্রী লইয়া স্বভাবাতিরিক্ত আর এক সংসার সৃষ্টি করেন । শিল্প-সাহিত্য-সংসারে আমাদের এই ‘ধর-সংসারেরই’ অতিরিক্ত সব থাকে, অথচ তাহা এ সংসারের অতিরিক্ত আর এক সংসার । এ সংসারের উদ্দেশ্য কি ? আবশ্যিকতা কি ? উদ্দেশ্য অনেক । আবশ্যিকতাও অনেক । মানুষের ‘মানুষ’ হইতে, তাহার পর মানুষ হইয়া দেবতা হইতে, কত কি না আবশ্যিক ! মানুষের মাজিত এবং উন্নত হইতে অনেক সামগ্রীর প্রয়োজন হয় ; কাজেই সাহিত্যের উদ্দেশ্যও অনেক । আবশ্যিকতার অনুপাতেই উদ্দেশ্য । ঐ সাহিত্য-সম্ভূত সংসারের উদ্দেশ্য, অবশ্য সাধারণতঃ বলিতে গেলে, মানুষের মনে তৃপ্তি ও তৃপ্তি-সম্পাদন এবং সেই সঙ্গে যুগপৎ মহাদর্শ-সংস্থাপন, উচ্চ উপদেশ-বিজ্ঞাপন, এক কথায়, মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব-সংগঠন । কিন্তু উদ্দেশ্য বা আবশ্যিকতা-সম্বন্ধে আমাদের আপাতত বৈশী কথা নাই । কথা হইতেছে, সাহিত্য-সম্ভূত সংসার লইয়া । বলিয়াছি যে, সে সংসার স্বাভাবিক ; অথচ অল্প-বিস্তর স্বভাবাতিরিক্ত । স্বভাবাতিরিক্ত না বলিয়া সংসারতিরিক্ত বলিলে আমাদের কথাটি আরও বিশদ হয় । এইরূপ স্বাভাবিক ও সেই সঙ্গে স্বভাবাতিরিক্ত বা সংসারতিরিক্ত সৃষ্টির অবতারণা করার পুথ্যাটি সাহিত্যে বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে ।

কথাটা আর এক দিক্ দিয়া দেখা যাউক । মানুষে যাহা কিছু নির্মাণ করে, চিত্র করে, লেখে, বলে, বর্ণনা করে, রচনা করে, সকলেতেই স্বভাবের অনুলিপি নয় । অনুলিপি নয়, কিন্তু তাহা অবিকল নয় না । লইলে চলে না, লইতে পারে না, লওয়া উপযোগী নয়, সম্ভবও নয় । চিত্রে এক ‘পৌঁচ’ বেশীও হয়, এক পৌঁচ কমও পড়ে । লেখা বা বলায় এক-আধর কমও হয়, দু-আধর বেশীও হয় । প্রকৃত প্রতিলেখা বা অবিকল অনুলিপি সম্ভবেও না—ভাষা ও সাহিত্যে তাহা ধাপেও না । ভাষা-বন্ধ বা সাহিত্যভুক্ত করিতে হইলে, লম্বা বিষয় খাট করিয়া লইতে হয়, আবার সংকীর্ণকেও একটু প্রশস্ত করিতে হয় । আবৃতকে অনাবৃত ও অনাবৃতকে আবৃত করিতে হয় । অকুটস্তকে কুটস্ত, কুটস্তকে আরও কুটস্ত করিতে হয় ; আবার অলস্তকেও নিবাইতে হয় । উল্লঙ্গ অনাচ্ছাদিতের উপর আচ্ছাদন দিতে হয় । পরন্তু এই আবৃত ও অনাবৃতকরণ-পুণালীকেও সীমাবদ্ধ করিতে হয় । এ সব না করিলে চলে না । করাতেই ভাষার ভাষাত্ব রক্ষা হয়, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি এবং উদ্দেশ্য সাধিত হয় ।

প্রকৃতির পূর্ণ প্রতিলেখা লওয়া অসম্ভব, কারণ লিপিকর অপূর্ণ । লওয়া উপযোগী নয়, তাহারও ঐ কারণ । সাহিত্যে প্রকৃতির প্রকাণ্ড স্থূল শরীর ধরে না,





স্বভাবের বিরাট দেহের স্থান সাহিত্যে হইতে পারে না। তবে কি সাহিত্য স্বভাবকে সন্যাক্রমে প্রতিকলিত করে না? করে, কিন্তু সুকৃতাভাবে। সাহিত্য স্বভাবের 'সূক্ষ্মশরীর'। প্রকৃতির প্রকাণ্ডতাও সাহিত্য প্রতিকলিত করে,—যেমন মানুষের সুকৃতা শরীরে তাহার স্থূল শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকার বিষয় কথিত আছে। পরন্তু সুকৃতা শরীর যেমন স্থূল শরীরের অন্তর্ভূত অথচ অতিরিক্ত, সেইরূপ সাহিত্য স্বভাবের অন্তর্ভূত অথচ স্বভাবাতিরিক্ত।

যাহা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাত্যহিক, তাহা মনুষ্য-চক্ষে পুরাতন, সাধারণতঃ আকর্ষণ-শক্তি-বজ্রিত; কাজেই অগাধিক পরিমাণে অগ্রাহ্য। তাহাতে নবীনত্ব নাই, বিশেষত্বও নাই; কাজেই মনোরঞ্জন বা চিত্ত-আকর্ষণ করে না। এই জন্য সাহিত্য প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক, নবীনত্ব ও বিশেষত্ব-বিবজ্রিত সাধারণ প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত-সার মাত্র সংকলন করিয়া লয়েন এবং তৎসহযোগে বিশেষত্ব-নবীনত্ব-সমন্বিত, চিত্ত-আকর্ষণ ও মনোমোহন-কর্ম আদর্শ প্রকৃতির সৃষ্টি করেন। প্রকৃতির প্রত্যেক পদক্ষেপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তাহার উনকোটি 'খুঁটিনাটি' সাহিত্য গণনা করেন না; তাহা করেন—বিজ্ঞান; তাও বিশেষ বিশেষ স্থলে। প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনা, ইকি ফুট, বট বুরুল মাপিয়া মাপিয়া তাহার হিসাব-নিকাশ করা, সাহিত্যের কাজ নয়। অন্তত সে কাজ সাহিত্যে এত কাল করেন নাই। করিবার আবশ্যিকতা বুঝেন নাই। আদর্শ চিত্র বা চরিত্র আঁকিয়াই সাহিত্য নিশ্চিত; সে চিত্র বা চরিত্রকে স্বাভাবিক অথচ স্বভাবাতিরিক্ত করিতে সচেষ্টিত। মধুমক্ষিকার মত সৌন্দর্য্য-মধু আহরণ করতঃ, ভাব-বৈভব সংগ্রহ করতঃ, নিজ-বক্ষে ধারণ করিয়া সাহিত্য গৌরবান্বিত। শব্দাঙ্কুর-বিরহিত, শব্দ-সম্পদ-সুসজ্জিত, একটি উপমা বা দুইটি অলঙ্কার-দ্বারা, সাহিত্য অসংখ্য শব্দ, ভুরি ভুরি ভাব, প্রকৃতির অনেকটা অংশ-প্রকাশে সুপটু ও যত্ববান। সাহিত্য এই নিয়মে এতকাল চলিয়া আসিয়াছেন ও এখনও আসিতেছেন। কাব্য কবিতা, সংগীত বজ্জতা, নাটক নবেল, কাহিনী উপন্যাস-আদি সুকৃতা সুকুমার সাহিত্য, সমগ্র রসময় শাস্ত্র, এদেশ সেদেশ সকল দেশেই, উক্ত নিয়মে চলিয়াছে। এখনও যে না চলিতেছে, তা নয়। এখনও চলিতেছে এবং পরেও বোধ করি চলিবে। তবে নিয়মটা সম্বন্ধে ইদানীং একটা কথা উঠিয়াছে; প্রতিকূল সমালোচনাও একটা চলিতেছে। বহু কালের এই পুরাতন নিয়মের পরিবর্তে আর একটা নূতন নিয়ম, অভিনব প্রণালী—অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। পুরাতন স্তরের উপর বসিয়া একটা নূতন স্তর-পুস্তকের অন্ন-বিস্তর উদ্যোগ হইতেছে। উদ্যোগটা অবশ্য হইতেছে, ইয়ুরোপে। তবে ইয়ুরোপই নাকি আজিকাল সকল পৃথিবীর পৃথিবী; সকল দিক্-দেশের অধিনেত্রী; আর ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের "আঁচ" নাকি আমাদের এখানকার সাহিত্যের গায়ে বিশেষ রূপে লাগিয়াছে, লাগিতেছে, লাগিবে,—আর সে "আঁচ" নাকি আমরা এড়াইতে পারি না, এড়াইতে চাই না, তাই অন্যকার এই আলোচনা। নহিলে ইয়ুরোপীয়



সাহিত্যে কোথায় কি হইল, কোন্ স্তরের পর কোন্ স্তর উঠিল বা উঠিবার উপক্রম হইল, তাহার অনুসন্ধান বা আলোচনায় পুস্তক হইবার আমাদের প্রয়োজন কি ?

[নবজীবন, ১২৯৩]

## রাজসিংহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজসিংহ পুথম হইতে উল্টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কানকেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে। এবং সেই অগুসর-গতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই অনিবার্য অগুসর-গতি সফল করিবার জন্য বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক তার দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক তারও বর্জন করিয়াছেন—কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র।

কোনো ভীকু লেখকের হাতে পড়িলে ইহার মধ্যে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বড়ো বড়ো কৈফিয়ৎ বসিত। জবাবদিহির ভয়ে তাহাকে অনেক কথা বাড়াইয়া লিখিতে হইত। সম্রাটের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাদশাহজাদীর সহিত মোবারকের প্রণয়ব্যাপার, তাহা লইয়া দুঃসাহসিকা আতরওয়ালী দরিয়ার প্রগল্ভতা, চঞ্চলকুমারীর নিকট আপন পরামর্শ ও পাঞ্জাগমত যোধপুরী বেগমের দূতীপূরণ, সেনাপতির নিকট নৃত্যকৌশল দেখাইয়া দরিয়ার পুরুষবেশী অশ্বারোহী সৈনিক সাজিবার সম্মতি-গ্রহণ—এ-সমস্ত যে একেবারেই সম্ভবাতীত তাহা না হইতে পারে—কিন্তু ইহাদের সত্যতার বিশিষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু এক একটি ছোটো ছোটো পরিচ্ছেদে ইহাদিগকে এমন অবলীলাক্রমে অসম্বোধে ব্যক্ত করিয়া গেছেন যে কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করিতে সাহস করে না। ভীকু লেখকের কলম এই সকল জায়গায় ইতস্ততঃ করিত, অনেক কথা বলিত এবং অনেক কথা বলিতে গিয়াই পাঠকের সন্দেহ আরো বেশি করিয়া আকর্ষণ করিত।

বঙ্কিমবাবু একে তো কোথাও কোনোরূপ জবাবদিহি করেন নাই, তাহার উপরে আবার মাঝে মাঝে নির্দোষ পাঠকদিগকেও ধমক দিতে ছাড়েন নাই। মাণিকলাল যখন পাথুর মধ্যে হঠাৎ অপরিচিতা নির্মলকুমারীকে তাহার সহিত এক ঘোড়ায় উঠিয়া বসিতে বলিল এবং নির্মল যখন তাহার নিকট বিবাহের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে



মাণিকলালের অনুরোধ রক্ষা করিল, তখন লেখক কোথায় তাঁহার স্বরচিত পাত্রগুলির এইরূপ অপূর্ব ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপূতিত হইবেন তাহা না হইয়া উল্টিয়া তিনি বিস্মিত পাঠকবর্গের পুতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন—

“বোধ হয় কোটশিপটা পাঠকের বড়ো ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালোবাসা-বাগি কথা একটাও নাই—বহুকাল-সঙ্কীর্ণ-পুণ্যের কথা কিছু নাই—‘হে পুণ্য!’ ‘হে পুণ্যধিকা!’ সে-সব কিছুই নাই—বিস্!”

এই গুহবর্ণিত পাত্রগণের চরিত্রের বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বড়ো একটা ভ্রুততা আছে। তাহারা বড়ো বড়ো সাহসের এবং নৈপুণ্যের কাজ করে অথচ তৎপূর্ব্ব যথেষ্ট ইতস্ততঃ অথবা চিন্তা করে না। সুন্দরী বিদ্যুৎরেখার মতো এক নিমেষে নেমাবরোধ ছিনু করিয়া লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে, কোনো পুস্তরভিত্তি সেই পুণ্যগতিককে বাধা দিতে পারে না।

স্ত্রীলোক যখন কাজ করে তখন এমনি করিয়াই কাজ করে। তাহার সমগ্র মনপ্রাণ লইয়া বিবেচনা-চিন্তা বিসর্জন দিয়া একেবারে অব্যবহিত ভাবে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার প্রাত্যহিক গৃহকর্ম্মসীমার বাহিরে তাহাকে অনিবার্য্য বেগে আকর্ষণ করিয়া আনে, পাঠককে পূর্ব্ব হইতে তাহার একটা পরিচয় একটু সংবাদ দেওয়া আবশ্যিক। বন্ধিমবাবু তাহা পুরাপুরি দেন নাই।

সেইজন্য রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদের কাছে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা-শঙ্কা-সংশয়ভারে ভারাক্রান্ত, কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়—কিন্তু রাজসিংহ-জগতে অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।

তাহারা আজকালকার ইংরাজি নভেল বেশি পড়ে তাহাদের কাছে এই লবুতা বড়ো বিস্ময়জনক। আধুনিক ইংরাজি নভেলে পদে পদে বিশ্লেষণ—একটা সামান্যতম কার্য্যের সহিত তাহার দূরতম কারণপরম্পরা গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়—ব্যাপারটা হয় তো ছোটো কিন্তু তাহার নখীটা বড়ো বিপর্য্য। আজকালকার নভেলিষ্টরা কিছুই বাদ দিতে চান না, তাহাদের কাছে সকলই গুরুতর। এই জন্য উপন্যাসে সংসারের ওজন ভয়ঙ্কর বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের মতো পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্রিষ্ট করে।

এই জন্য আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করিতে ভয় হয়। মনে হয় কর্ম্মক্রান্ত মানব-হৃদয়ের পক্ষে বাস্তব-জগতের চিন্তাভার অনেক সময়ে যথেষ্টর অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে, আবার যদি সাহিত্যও নির্দয় হয় তবে আর পলায়নের পথ থাকে না। সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাই না।





কিন্তু গতাকে সম্যক্ প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে ভারের আবশ্যক, সেটুকু ভারে কেবল সত্য ভালোরূপ অনুভবগম্য হইয়া হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করে; করুণা-জগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় স্পর্শ যোগ্য ও চিরস্থায়ী-রূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।

বন্ধিমবাবু রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে গতির স্বারায় তাহা পূরণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ অসন্দিক্করূপে সম্ভবপর ও প্রশংসনীয় করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলা-ভঙ্গীতে চলিয়া গিয়াছেন যে প্রশংসার আবশ্যক হয় নাই। যেন রেলপথের মাঝে মাঝে এমন এক আধটা বিজ্ঞ আছে যাহা পুরা মজবুত বলিয়া বোধ হয় না—কিন্তু চালক তাহার উপর দিয়া এমন দ্রুত গাড়ি নইয়া চলে যে, বিজ্ঞ ভাঙিয়া পড়িবার অবসর পায় না।

এমন হইবার কারণও স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যখন বৃহৎ সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে চলে তখন তাহারা সমস্ত ধরকরুনা কাঁধে করিয়া লইয়া চলিতে পারে না। বিস্তার আবশ্যক দ্রব্যের মায়াও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়। চলৎ-শক্তির বাধা তাহাদের পক্ষে মারাত্মক। গৃহস্থ মানুষের পক্ষে উপকরণের প্রাচুর্য্য এবং ভার-বাহন্য শোভা পায়।

রাজসিংহের গরটা সৈন্যদলের চলার মতো—ঘটনাওলা বিচিত্র ব্যূহরচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। রাজসিংহের সহিত চকলকুমারীর পুণ্যব্যাপারটা তেমন ঘনাইয়া উঠে নাই বলিয়া কোনো কোনো পাঠক এবং সম্ভবত বহুসংখ্যক পাঠিকা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বন্ধিমবাবু বড়ো একটি দুর্লভ অবসর পাইয়াছিলেন—এই সুযোগে কন্দর্পের পঞ্চশরে এবং করুণরসের বরুণবাণে দিগ্বিদিক্ সমাকুল করিয়া তুলিতে পারিতেন।

কিন্তু তাহার সময় ছিল না। ইতিহাসের সমস্ত পুৰাণ তখন একটি সঙ্কীর্ণ সন্ধিপথে বহুস্তনিতরবে ফেনাইয়া চলিতেছে—তাহারই উপর দিয়া সামান্ সামান্ তরী! তখন রহিয়া-বসিয়া ইনিয়া-বিনিয়া প্ৰেমাভিনয় করিবার সময় নহে।

তখনকার যে প্ৰেম, সে অত্যন্ত বাহ্যাবস্থিত সংক্ষিপ্ত সংহত। সে তো বাসর-রাত্রের সুখশয্যার বাগস্তী প্ৰেম নহে—ঘন বর্ষার কালরাত্রের মৃত্যু হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে—মান-অভিमानে লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়া ত্রস্ত নায়িকা চকিত বাহুপাশে নায়ককে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখন সুদীর্ঘ সুমধুর ভূমিকার সময় নহে।

এই অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলায় সকলেই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং আপনার অন্তরবাসী মহাপ্রাণীর স্তানিধন অনুভব করিতেছে। কোথায় ছিল ক্ষুদ্র রূপনগরের অন্তঃপুর-প্রান্তে একটি বালিকা,—কালক্রমে সে কোন্ ক্ষুদ্র রাজপুত্র নৃপতির শত রাজ্যীর



মধ্যে অন্যতম হইয়া অসম্ভব-চিত্রিত নতার উপরে অসম্ভব-চিত্রিত পক্ষী-খচিত শ্রেত-পুস্তরচিত কক্ষপাচীর-মধ্যে পুরু গালিচায় বসিয়া রঙ্গসঙ্গিনীগণের হাসিটিটকারী-পরিবৃত হইয়া আলবোলায় তামাকু টানিত, সেই পুষ্পপুতিমা স্কুমার সুন্দর বালিকাটুকুর মধ্যে কি এক দুর্বীর দুর্ধর্ম প্রাণশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল—সে আজ বাঁধমুক্ত বন্যার একটি গর্বেদ্বাক্ত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত রঙমহলে সুন্দরী জেবুউনিয়া—সে সুখের উপর সুখ, বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অন্তরাত্মকে আরামের পুষ্পরাশির মধ্যে আচ্ছন্ন অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল, সে-দিনের সেই মৃত্যুদোলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশয়্যা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোন্ মহাপ্রাণী এমন নিষ্ঠুর কঠিন বাহ্যবেষ্টনে পীড়ন করিয়া ধরিল, সম্রাটদুহিতাকে কে সেই সর্বত্রগামী দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিল, যে-দুঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও কুটীরবাসিনী কুমককন্যার সহিত এক বেদনাশয়্যায় শয়ন করাইয়া দেয়। দস্যু মাণিকলাল হইল বীর, রূপমুগ্ধ মোবারক মৃত্যু-মাগরে আত্মবিসর্জন করিল, গৃহপিণ্ডরের নির্মলকুমারী বিপ্লবের বহিরাকাশে উড়িয়া আসিল এবং নৃত্যকুশলা পতঙ্গচপলা দরিয়া সহসা অট্টহাস্যে মুক্তকেশে কালনৃত্যে আসিয়া যোগ দিল।

অধ্বরাতির এই বিশুব্যাপী ভয়ঙ্কর জাগরণের মধ্যে কি মধ্যাহ্নকুলায়বাসী পুণয়ের করুণ কপোতকুজন প্রত্যাশা করা যায়?

রাজসিংহ দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। বিষবৃক্ষের স্তম্ভী সুখদুঃখের পাকগুলা পুথন হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া-কাটিয়া বসিতেছিল। অবশেষে শেষ কয়টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে। রাজসিংহের পুথন দিকের পরিচ্ছেদগুলি মনের উপর সেরূপ রক্তবর্ণ স্রুগভীর চিহ্ন দিয়া যায় না তাহার কারণ রাজসিংহ স্বতন্ত্র জাতীয় উপন্যাস।

প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না। স্বাভাবিক পাঠক খাড়া করিয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, রাজসিংহ পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে পুথন পুথন খটকা লাগিতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বড়ই বেশী তাড়াতাড়ি দেখিতেছি—কাহারো যেন মিষ্ট মুখে দুটো ভদ্রতার কথা বলিয়া যাইবারও অবসর নাই। মনের ভিতর এমন আঁচড় দিয়া না গিয়া আর একটু গভীরতররূপে কর্ণণ করিয়া গেলে ভালো হইত।—যখন এই সকল কথা ভাবিতেছিলাম তখন রাজসিংহের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করি নাই।

পর্বত হইতে পুথন বাহির হইয়া যখন নিঝরগুলা পাগলের মতো ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে—মনে হয় না তাহারা কোনো কাছের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছুদূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নিঝরগুলা নদী হইতেছে—ক্রমেই



গভীরতর হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্বত ভাঙিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।

রাজসিংহেও তাই। তাহার এক একটি ঋণ এক একটি নির্ঝরনের মতো ক্ষত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিঝিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি—তাহার পর ঘর্ষণেও দেখি ধ্বনি গভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার সপ্তম ঋণে দেখি কতক বা নদীর স্রোত কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগভীর গর্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরঙ্গীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় ক্রম, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবগান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং বিদ্যাতাপুরুষ—উপন্যাস-অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবুউনিসা।

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী, মাণিকলাল প্রভৃতি ছোটো বড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মেঘদুন্দিন রথযাত্রার দিনে ভারত-ইতিহাসের রথ-রজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে, তথাপি তাহারা এই ঐতিহাসিক অংশেরই অন্তর্গত। তাহাদের জীবন-ইতিহাসের, তাহাদের সুখদুঃখের স্বতন্ত্র মূল্য নাই—অর্থাৎ এ-গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই।

জেবুউনিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ-গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। যোগ আছে কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনার অংশীভূত করিয়া লয় নাই, সে আপনার জীবন-কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিগ্লিত হইয়া দেখ, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্মান্তিক আর্ন্তধ্বনিও—রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্শ করিতেছে—সেই গগনপথে উচ্ছৃগিত হইয়া উঠে, হয় তো সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বন্ধিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

তিনি এই বৃহৎ জাতীয় ইতিহাসের এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।



মোগল সাম্রাজ্য যখন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া একান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিল, যখন সে, সম্রাটের পক্ষে ন্যায়পরতা অনাবশ্যক বোধ করিয়া, পূজার সুখদুঃখে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহার জাগরণের দিন উপস্থিত হইল।

বিলাসিনী জেবুউনিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাটদুহিতার পক্ষে পুনের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াদর্শের মস্তকে আপন জরি-জহরংজড়িত পাদুকাধচিত সুন্দর বামচরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন কোন্ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত পুেন জাগ্রত হইয়া তাহার মর্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখমত্তরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো তাহাকে দগ্ধ করিল—তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত পুেনের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমান্য সমর্পণ করিল—দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়গনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না কিন্তু আপন গচেতন অন্তরাঙ্ককে ফিরিয়া পাইল। জেবুউনিসা সম্রাট-প্রাসাদের অপরূপ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ট হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্ৰহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত জগৎ-বাগিনী রমণী।

ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণ প্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশে বড়ো একটা রোমান্টিকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্যোগের রাত্রে একদিকে মোগলের অশ্রুভেদী পাখাণপ্রাসাদ ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর এক দিকে সর্বভাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে; সেই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃকপাত করিবে—কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্ত্র থাকিয়া সমস্ত ইতিহাস-পর্যায়কে নীরবে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি এই ধূলি-লুপ্ত্যমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেঘ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে এক সঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশোধন উভয়কেই কিছু গর্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারও অগ্রবর্তী না হয় এ-বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখদুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি পুবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি একটি নৌকা ভাগাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই জন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশী করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোনো কোনো অতিকৌতুহলী পাঠক ঐ নৌকার অভ্যন্তরভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, এবং সেই জন্য মনোহোভে লেখককে তাঁহার



নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্তব্য লেখক গ্রন্থবিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পূর্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসঙ্গত নহে। গ্রন্থ-পাঠ্যরস্ত্রে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই এ কথাটা বলিতে হইল।

[১৩০০]

## মানসী

প্রিয়নাথ সেন

সৌন্দর্য্য-উপভোগে আমরা যে আনন্দ লাভ করি, তাহা এক দিকে যেমন বিস্তৃত, অপর দিকে তেমনি প্রখর। প্রখরতা-নিবন্ধন সে আনন্দ আমরা নিজের ভিতর বন্ধ রাখিতে না পারিয়া জগৎ-সংসারকে তাহার ভাগ লইতে আহ্বান করি; এবং বিস্তৃত বলিয়া পরের সহিত উপভোগে সে আনন্দ কমিয়া না গিয়া বরং বাড়িতেই থাকে। ইংরেজ কবি Shelley লিখিয়াছেন, পুনের বিভাগ অর্থে এমন বুঝায় না যে, কাহারও প্রাপ্ত অংশ হইতে তাহাকে কিছুন্মাত্র বঞ্চিত করা। এ কথায় অনেকেরই আপত্তি থাকিতে পারে—কিন্তু সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ ভাগ করিয়া লইলে, আনন্দ যে বাড়ে বই কনে না, তাহা আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। সৌন্দর্য্য-উপভোগ-প্রবৃত্তির মূলে যে পরার্থপরতা আছে, ইহা তাহার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। এবং তাহা হইলেই আমরা বলিতে পারি যে, এই বৃত্তি মঙ্গলময়ী এবং ইহার পরিচালনা শুভোদ্দিষ্ট।

আমাদের সৌন্দর্য্যস্পৃহা নানা উপায়ে চরিতার্থ হয়। কিন্তু বোধ হয়, সুন্দর কাব্য হইতে আমরা যে আনন্দ পাই, তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চিত্র-বিদ্যা, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি অপরাপর কলা-বিদ্যারও উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি, কিন্তু কাব্যে যেমন বাহ্য এবং অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য স্থায়ী, এবং সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কাব্যানুভবী পাঠক, তাই কোনও সুন্দর কাব্যের সন্ধান পাইলে সুখে অধীর হইয়া অপরকে তাহার রসান্বাদনে সুখী করিতে উৎসুক হন। সম্ভবতঃ, সমালোচনার জন্য ইহা হইতেই।

আমরা “মানসী”-পাঠে যে তীব্র এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাইয়াছি, সচরাচর কোন কবিতা-পুস্তক-পাঠে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সেই আনন্দ-উদ্বেগে পুনোদিত





হইয়া মানসী-প্রকাশের কিছু দিন পরেই আমরা উহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা লিখি—কিন্তু কতিপয় কারণবশতঃ উহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি মানসীর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে—আমরাও তদুপলক্ষে আমাদের পূর্ব-রচিত প্রবন্ধ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

আমাদের বিবেচনায় মানসী একখানি অতি উৎকৃষ্ট, অপূর্ব গ্রন্থ। অপর কোনও ভাষাতে এরূপ একখানি গ্রন্থের ভিতর এত উচ্চ দরের অথচ বিভিন্ন প্রকৃতির এতগুলি কবিতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কুড়ি বৎসরের ভিতর ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় এমন কোনও কবিতা-পুস্তক দেখিয়াছি কি?

মানসীর ভাষা এবং ভাব—যেন একই ছাঁচে একেবারে প্রকৃতির হাত হইতে বাহির হইয়াছে। বাস্তবিক ইহার কোথাও কৃত্রিমতার গন্ধ নাই। এই সকল কবিতার অসাধারণ উৎকর্ষের মূলভূত কারণ,—তাহাদের মর্মগত সত্য। কবি মানব-হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাবসমূহের অতলস্পর্শ গভীরতা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই, সেই চির সত্যের ভিতর কবিত্বের অমর সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন। সেইজন্য তাহার অনুঘর্ষণে তাঁহাকে মিথ্যার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতে হয় নাই। প্রকৃতির চির-সৌন্দর্য্যের প্রাণ পর্য্যন্ত দেখিবার চক্ষু তাঁহার আছে বলিয়াই, তাঁহাকে বসিয়া বসিয়া চিরদিন রং ঘুটিতে হয় নাই। তিনি বাহ্য এবং অন্তর্ভূতের এতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে জানেন বলিয়াই, এত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছেন। এই গেল মানসীর ভাব বা প্রাণের কথা। ইহার বাহ্য বিকাশ অর্থাৎ ভাষা এবং ছন্দ-সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই খাটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কবির ভাব ও ভাষা যেন এক সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ সৃষ্টির হৃদয় হইতে তাঁহার হৃদয়-মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের বার্তা আসিয়াছে, তাহা একেবারে কবিত্বের আকার ধরিয়াই আসিয়াছে। সেই জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ আহরণ করিতে হয় নাই—ভাব-প্রকাশের জন্য ইতস্ততঃ করিতে হয় নাই। এ দিকে আবার জোর করিয়া একটা মস্ত কথা বলিবার কোথাও প্রয়াস বা চেষ্টা দেখিলাম না। পূর্ণ প্রাণ হইতে, স্বন্দর এবং পরিণত ভাষা ও ছন্দে, উচ্ছ্বাসোন্মুখ কবিতার মুক্তস্রোত হিলোলময়ী ধারায় নিঃসৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই কবির বলিবার কথা আছে—কথা বলিবার আভ্যন্তর নাই। তাই তাঁহার ভাষা সারগর্ভ, স্বন্দর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং ভাবের পর্দার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট। শব্দ-বিন্যাসে তাঁহার অসাধারণ, বিস্ময়কর ক্ষমতা। আমি কেবল শব্দের লালিত্য বা মাধুর্য্যের কথা বলিতেছি না—কাব্যার্থে তাহাদের সার্থকতার কথা বলিতেছি। এ ক্ষমতা কেবল রবীন্দ্রবাবুর মানসীতেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নহে; তাঁহার শৈশব-কবিতার ভিতরও ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার নির্বাচিত শব্দগুলির ভিতর যেন স্বভাবের চিরসৌন্দর্য্য জাগিয়া রহিয়াছে—প্রকৃতির পূর্ণ-মোহ তাহাদের ভিতর বিদ্যমান। নিকৃষ্ট কবিদিগের বর্ণনার ন্যায় তাহারা নিসর্গের কেবলমাত্র প্রাণহীন photograph বা অন্ধ ছবি নহে। স্বভাবের



সমস্ত জীবন তাহাদের অভ্যন্তরে পুদীপ্ত। পাঠকালে এই শব্দমন্ত্রে আহৃত হইয়া পাঠকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়—কখন বা স্বভাবের উদার, কখনও বা রুক্ষ, কখনও বা বিস্ময়কর দিব্য মূর্তি। কেবল তাহাই নহে; পুষ্কতির সৌন্দর্য্যরাশি দেখিলে হৃদয় যে অব্যক্ত অধীরভাবে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহাদের ভিতর সেই অব্যক্ত অধীরতাটুকুও ব্যক্ত হইয়াছে। তাহারা কেবল বাহ্যজগতে সৌন্দর্য্যরাশি আনিয়া পাঠককে উপহার দিয়া ক্ষান্ত হয় না—কবির অন্তর্জগতের আরও মুগ্ধকর বার্তা আনিয়া দেয়—আনন্দ-উন্মুখ পাঠকের প্রাণে কবির উপভোগ-গলিত তপ্তপ্রাণ ঢালিয়া দেয়। এক কথায়, তাহাদের ভিতর যেমন নিগর্গের চিরপুফুল সৌন্দর্য্যরাশি বর্তমান, তেমনই তাহারই গঙ্গে গঙ্গে কবি-হৃদয়ের মুগ্ধ উপভোগও বর্তমান।

নিকট কবিদের নিকট ছন্দ ভাব-পুকাশের নিগড় বা ব্যাঘাত হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। কিন্তু পুস্তক কবির হাতে ছন্দ ভাষা অপেক্ষা রস-বিকাশের শ্রেষ্ঠতর, যোগ্যতর অবলম্বন। ভাষা যাহা করিতে পারে না, ছন্দ তাহা অনায়াসে করিয়া থাকে। ভাষা যেখানে যাইতে পারে না, ছন্দের স্বর্গীয় রাগিনী সেখানে ভাব-পুকাশের পথ অতি সুগম করিয়া দেয়। পদ্য যদি ছন্দোময়ী রচনা হয়, এবং গীতিকাযা যদি প্রাণের উচ্ছ্বাস হয়, তবে সে উচ্ছ্বাস আর কিছুতেই তেমন পুকাশ পায় না, যেমন ছন্দের আকুল হিল্লোলে। প্রথম শ্রেণীর কবিমাত্রেরই ছন্দের উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ছন্দের উপর ক্ষমতা অর্থে আমি বুঝিতেছি না—মাত্রা, মিল বা যতি-সংস্থাপন-সদ্বন্ধে শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলা। এমন অনেক পদ্য আছে, যেখানে সকল নিয়মই সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে—পড়িতে শুনিতেও যাহা বেশ সুমধুর, অথচ ছন্দের যে সৌন্দর্য্যের কথা আমি বলিতেছি, তাহাতে তাহার কিছুই নাই। সে সৌন্দর্য্য নিয়মের অধীন নয়, শিকারও আয়ত্ত নয়। গায়কের কণ্ঠের ন্যায় তাহা নিতান্ত স্বভাবের সামগ্রী। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে লইয়া যে পুরাতন বিবাদ আছে, এখানে তাহার মীমাংসা হইতে পারে। বিদ্যাপতির ছন্দের উপর এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে—বিদ্যাপতির গলা আছে। চণ্ডীদাসের নাই। চণ্ডীদাসের ছন্দ বেশ সুন্দর এবং মধুর, বেশ তাল-লয়-বিশিষ্ট, কিন্তু তাহাতে বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব মোহ নাই। মলয়-সমীরণের ন্যায় তাহা হঠাৎ হৃদয়কে উৎফুল্ল করে না, প্রাণকে ভাসাইয়া দেয় না। বিদ্যাপতির বংশীর রবে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, চিত্ত চমকিত হয়, বর্তমান ভুলিয়া গিয়া কোথায় কোন্ দিকে ভাসিয়া যাই।

“ কাণের ভিতর দিয়া মরনে পশিল গো  
আকুল করিল মোর প্রাণ। ”

চণ্ডীদাসের এই কয়টি কথায় বিদ্যাপতির সুন্দর কণ্ঠধ্বনি অতি সুন্দররূপেই বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহাতে বিদ্যাপতির ছন্দের ঘোরও একটু আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় নহে; ইহাতেও কেমন একটু আকুলতা আছে, কিন্তু দেখ, সে আকুলতা



এই কয়েক কাতর পদের দীর্ঘ-বিদীর্ণ মর্মোচ্ছ্বাসে ভাগিয়া ধুইয়া মগ্ন হইয়া গেল।—

“এ ভরা বাদর                      মাহ ভাদর  
শূন্য মন্দির নোর।”

বিদ্যাপতি স্বরে মুগ্ধ করেন, চণ্ডীদাস কথায় মুগ্ধ করেন। কিন্তু স্বর লইয়াই ছন্দ এবং ছন্দ লইয়াই কবির কার্য্য। তাই বলিয়া এমন বুঝিও না, চণ্ডীদাসের স্বর নাই বা বিদ্যাপতির কথা নাই।

ছন্দের উপর রবিবাবুর ক্ষমতা বিদ্যাপতি পুভূতি পুথন শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায়। তাহারও ছন্দের স্বরে পূর্ণ কাঁদিয়া উঠে, স্বদূর নিকট হয়, নিকট স্বদূর হয়। দুই চারিটি পদ্যে চক্ষে জল আসিয়া পড়ে এবং ছন্দের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মর্ম্ম কাঁপিতে থাকে। এই মানসীতে তাহার ছন্দ-রচনা-ক্ষমতার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি নূতন মিল, নূতন মাত্রা, নূতন পদ-বিভাগ, যতি-সংস্থাপন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নূতন ছন্দ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাদলা ভাষার সুপ্ত অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে উন্মোচিত করিয়াছেন, এবং আরও বিস্ময়কর ব্যাপার—পুরাতনকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। যুক্তাক্ষর-সম্বন্ধে তাহার অভিনব ব্যবস্থা সকল স্থানে না খাটিলেও, তিনি আমাদের পুরাতন ‘আটপোরে’ পয়ার ছন্দের জরাজীর্ণতার ভিতর অনেকটা জীবনী সঞ্চারিত করিয়াছেন। তাহার সেই অলস নিদ্রাতুর “একঘেয়ে” ভাব বিদূরিত করিয়া, তাহার স্থানে জাগৃত জীবনের সচল ভাব আনিয়া দিয়াছেন। অথচ এই অভিনব বিধানের ভিতর উৎকট কিছুই নাই—ইহা বাদলা ভাষা ও ছন্দের আভ্যন্তরিক বাতুগত স্বাভাবিক গতির সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া মিশিয়া গিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত এই কয়টি চরণের যতি-বিভাগে এবং বিভিন্ন স্বরের উত্থান-পতনে—অথবা জানি না কোন্ নিগূঢ় কারণে,—হৃদয়ের কি ঘোর ব্যাকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে, যেন আবেগতরা প্রাণের গভীর ‘দুরু দুরু’ এই ছন্দের তালে তালে স্পন্দিত হইতেছে।—

“তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি  
শত রূপে শতবার  
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।  
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়  
গাঁথাছে পীতহার,  
কত রূপ ধরে পরেছ গলায়  
নিরেছ সে উপহার,  
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।  
যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,  
প্রাচীন পুনের বাখা,  
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,



অগীম অতীতে চাহিতে চাহিতে  
 দেখা দেয় অবশেষে  
 কানের তিমির-রজনী ভেদিয়া  
 তোমারি মুরতি এসে,  
 চির স্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।”

হাজার কথা দিয়া কেহ যাহা বলিতে পারিত না, তাহা এই কতিপয় অলঙ্কারশূন্য, সাধাসিদ্ধা, অতি সরল, অতি সহজ, অতি সামান্য পদে কি চমৎকার, কি পূর্ণতর উক্তি পাইয়াছে। জানি না, শেষচরণ-পাঠে চক্ষের উপর কত জন্ম কত যুগ ঘুরিয়া যায়। কত সুদূর বৎসরের বিশাল মেঘরাশি ঠেলিয়া পূর্ণ কোথায় ভাসিতে থাকে। অতীতের অনন্ত বিস্তৃতি চক্ষের সন্মুখে খুলিয়া যায়। কত অন্ধকার কত আলো আসিয়া পূর্ণে পড়ে। ইহা অপেক্ষাও আরও মুগ্ধ সুন্দর সুরবিশিষ্ট পদ ও চরণ মানসীতে অনেক আছে। এ স্থলে তাহাদের উল্লেখ করিতে গেলে পূর্বের শেষ হইবে না। সে যাহা হউক, আমি বলিতে চাহি যে, কবির এই মোহমন্ত্রময় শব্দ-বিন্যাস এবং অপূর্ব ছন্দঃসৌন্দর্য্য রস-বিকাশে এবং ভাব-পুকাশে তাহাকে অতুল ক্ষমতা দিয়াছে। ইহা-দ্বারা সকল ভাব সকল রসই বেশ পূর্ণ পরিণত অভিব্যক্তি পাইয়াছে। বিশাল সমুচ্চ বা সুগভীর ভাব—মানব-ভাষা যেখানে পৌঁছিতে পারে না, অতি সুক্স কোমল মৃদু ভাব—কথায় যাহাকে ধরিতে পারা যায় না, হৃদয়ান্তঃপুরচারিণী করনার সেই লাজময়ী কুসুমসুকুমার মুক্তি—ভাষার রূঢ় স্পর্শে যাহা মলিন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, এ সকলই কি চমৎকার, কি অনির্বচনীয় সুন্দররূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। কখন কখন তাহার একটি সমগ্র কবিতা এইরূপ একটি ভাবেই পরিপূর্ণ। অথচ তিনি উচ্চ পুতিভাবে তাহাদিগকে এমনি কবিস্বময় অথচ পরিচিত ভাষায় পুকাশ করিয়াছেন যে, একদিকে যেমন ভাবের নৈসর্গিক গৌরব এবং সুখমা রক্ষিত হইয়াছে, অপর দিকে পাঠকের হৃদয়ে তাহারা শৈশব সুহৃদের ন্যায় অতি সহজে পুবেশ লাভ করে। তাহাতে অপূর্ণ কিছুই নাই—জটিলতার নামগন্ধ নাই। মানসীতে এমন অনেক কবিতা আছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম এবং শেষ কবিতা দুইটির উল্লেখ করিলাম। “উপহারে” যদিও ছন্দের মোহ বা অপূর্বতা কিছুই নাই, তবু কি সুন্দর সরল ভাব ও ভাষায় কবির সমস্ত জীবন-কাহিনী ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। সে চিত্র যেমন সুন্দর, তেমনি সত্য। কবির প্রাণের সেই দুর্দমনীয় সৌন্দর্য্য-পিপাসা, সৌন্দর্য্যকে ধরিবার নিমিত্ত সেই জন্মান্তরীণ আকুলতা, কি অনির্বচনীয় মধুরভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যকে কে কবে আয়ত্ত করিয়াছে, আয়ত্ত করিয়াই বা কে তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিয়াছে? মনে করি এই বুঝি পাইলাম, পলক না ফেলিতে কই কোথায় আবার উবিয়া গেল—‘আধি পানটিতে নাহি পরতীতে যেন দরিদ্রের হেন’—এক যায়, আবার শত শত আসিয়া জীবনকে উষ্ণ করিয়া তুলে—প্রাণের ভিতর চির-চঞ্চলতা, সূচির অশান্তি আনিয়া দেয়। দুইটি কথায় ইহার কি সুন্দর ছবিই অঙ্কিত হইয়াছে—“রচি শুধু





অগীনের গীতা ” এই কয়টি কথায় কবি-জীবনের সমস্ত উন্মত্ত আশা, পূর্ণ-ভরা স্বপ্ন, হৃদয়-ভরা আবেগ এবং পৃথিবী-ভরা ব্যথা কি উক্ত হয় নাই ?

গুপ্তের শেষ কবিতাটিতে পেমিকের জীবন-রহস্য তেমনি সুস্পষ্ট এবং সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। পেমের সর্বস্ব ধর্ম ইহার তিতর উক্ত হইয়াছে। পেমিকের সকল কার্য্য এবং সকল চিন্তার, সকল আশা এবং সকল কল্পনার তিতর যে প্রিয়জনের মধুর মুক্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার অনন্ত বিশাল হৃদয়াকাশ যে প্রিয়জনের সেই ক্ষুদ্র সুন্দর মুখচন্দ্রমার অগীত জ্যোৎস্নায় চির আলোকিত, তিনি তাহার কি সুন্দর বর্ণনাই করিয়াছেন,—

“ নাহি গীতা আগে পাছে,                      যত যাও তত আছে,  
যতই আগিবে কাছে তত পাবে মোরে।  
আমারেও দিয়ে তুমি                      এ বিপুল বিশুভুমি  
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভরে।”

নিম্নলিখিত কয়টি ছত্রে পুরুষের কল্পনাময় (idealising) পেমের অনির্বচনীয় মধুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে,—

“ আমি যা পেয়েছি, তাই                      নিয়ে ভেসে যাই,  
কোন খানে গীতা নাই ও মধু মুখের।  
তুমি স্বপ্ন তুমি স্মৃতি                      তাই নিয়ে থাকি নিতি,  
আর আশা নাহি রাখি সুখের মুখের।”

এই সকলের উপর আবার কি মধুর স্মৃতি ছন্দ। গাদাগিধা সহজ কথা, সরল অথচ মধুর গাঢ় পূর্ণ-ভাগান স্বর। কোনও কল-কৌশল নাই, ভাষা বা ছন্দের কোনও কৃত্রিমতা বা জটিলতা নাই, আমাদের ঘরের বাঙ্গালা, অথচ কি স্বর্গীয় রাগিণী। যেন শরৎ জ্যোৎস্নার শুভ্র সরল আকুল হৃদয়ে শেফালিকা তাহার শুভ্র সরল আকুল পূর্ণাঙ্গানি নীরবে খুলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু বিষয় ও ভাবের অভিনব ও পূর্ণাঙ্গ মাধুর্য্য, এবং ছন্দেরও অভিনব অপাখিব সন্মায়, ‘বর্ষার দিনে’ নামক কবিতাটি রবীবাবুর অসাধারণ শক্তির অপূর্ব দৃষ্টান্ত। তাহার অপর সকল কবিতা হইতে, এবং তাহা হইলেই বঙ্গ-সাহিত্যের অপর সকল কবিতা হইতে ইহা পৃথক্, এবং বিশেষ আসন পাইবার উপযুক্ত। ইহার মত দ্বিতীয় কবিতা তিনি বা অপর কোন্ বঙ্গ-কবি লিখিয়াছেন? বাঙ্গালা ভাষায় বা ছন্দে যে এমন মোহিনী আছে বা থাকিতে পারে, তাহা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, তিনি কেবল তাহার সুন্দর প্রতিভা-বলে আমাদের এই ‘একঘেয়ে’ ভাষায় অভিনব শক্তি দিয়াছেন, বা তাহার পুচ্ছনু সৌন্দর্য্য উদ্ভাবন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই কবিতাটি বহুবার পাঠে আমার মূঢ় বিশ্রাস জন্মিয়াছে যে, অপর কোনও ভাষায় একরূপ সুন্দর ছন্দ রচিত হইতে পারে না, অপর কোনও ভাষায় ইহার উপযুক্ত উপাদান নাই।



আমাদের এই বাঙ্গালা ভাষাতেই কেবল ইহা সম্ভবপর। জ্ঞানি না, অপর কোন্ ভাষাতে এমন কোন্ কবিতা আছে, যাহাতে সমগ্র বর্ষার ধনবোর জীবনের সমস্ত বুকভরা ব্যথা এমন অনির্বচনীয় মনোহরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ষার মেঘ-রুদ্ধ হৃদয় যেন এই কবিতার কাতর ছন্দে বিদীর্ণ হইয়াও হইতেছে না। ইহার প্রত্যেক কথার অন্তরালে প্রাণটের চির-সন্ধ্যা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং মানব-জীবনের অনিবার্য বিবাদ, সেই সন্ধ্যার মূল অন্ধকারে জড়িত রহিয়াছে। এ দিকে কি সুন্দর অবচ সহজ ভাব ইহার প্রাণের ভিতর নিহিত রহিয়াছে! যে সকল কবি বা কল্পনা-ব্যবহারী মানব—জীবনের উন্মুক্ত সাধারণ রাজপথ ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন প্রান্তভাগ বা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রদেশের অপরূপ শোভা-বর্ণনে পটু—Poe, Bandilary বা Hawthorne—তাহাদেরও কবিতা বা রচনার ভিতর এমন কোন অপার রহস্যময় গোখুলির ছায়া দেখি নাই, এমন পবিত্র অপাখিব বিবাদ দেখি নাই। ইহার সুন্দর ছন্দের কাতর মধুর গতিতে সন্ধ্যার হৃদয়-ধ্বনি অনুভূত হয়, এবং তাহার আনুনাগিত কেশের শিথিল অন্ধকার উহার প্রচ্ছন্ন বিষমতার ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

মানসীর উত্তরার্ধে মিত্রাকর পয়ারে যে সকল কবিতা আছে (মেঘদূত, অহল্যা-বিদায়), তাহাদেরও ঠিক এইরূপই প্রশংসা করা যাইতে পারে। বাস্তবিক এই সকল কবিতায় রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গালা পয়ারকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন, তিনি তাহাকে অভিনব জীবন প্রদান করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত তাঁহার নিজের সামগ্রী। তাঁহার পূর্বে কোন বঙ্গীয় কবি এইরূপে পয়ার রচনা করেন নাই। তাঁহার হস্তে ইহা এক অপূর্ব জীবন্ত দপিত গতি লাভ করিয়াছে। কবিতার তীব্র স্রোতে একটি চরণ কেমন আর একটির উপর তরঙ্গায়িত হইয়া উছলিয়া পড়িয়াছে। চরণের উপর চরণের এইরূপ উচ্ছ্বাসকে ফরাসী ভাষায় enjambement বলে। বাঙ্গালায় যেমন এই চতুর্দশ-মাত্রার পয়ার, ইংরাজীতে সেইরূপ Iambic Pentametre এবং ফরাসী ভাষায় Alexandrine। এই তিন ভাষাতে এই তিন অতি প্রাচীন এবং সাধারণ ছন্দ, এবং তিন ভাষাতেই এই তিন ছন্দের প্রতিচরণের অস্তে যতি স্থাপিত হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। আধুনিক কালে Victor Hugo Alexandrine-এর এই নিয়মের নিগড় খুলিয়া দিয়া সাহিত্য-সমাজে মহা বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ফরাসী ভাষায় অমিত্রাকর ছন্দ না থাকিলেও এই শৃঙ্খলমুক্ত Alexandrine সর্বতোভাবে ইংরাজী অমিত্রাকর ছন্দের স্বাধীনতা, সৌন্দর্য এবং বাক্শটুতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, Victor Hugo-র বহু পূর্বে এই enjambement কখন কখন ব্যবহৃত হইত। রবীন্দ্রবাবুই কিন্তু এই প্রথমে বাঙ্গালা মিত্র পয়ারের পায়ের বেড়ী খুলিয়া দিলেন, এবং তাহাতে যে বাঙ্গালা সাহিত্যের বল এবং সৌন্দর্য কতদূর বদ্ধিত হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাকেই বলে প্রতিভার বিক্রম। ইহার এই মিত্রাকর পয়ার পড়িয়া ইংরাজী Pentametre-এর





শীর্ষস্থানীয় Shelley-র Epipsychidion মনে পড়ে। ইংরাজী সাহিত্যেও উচ্চ শ্রেণীর কবি ভিনু মধ্য বা নিকৃষ্ট কবিদিগের লেখায় একরূপ পয়ার দেখিতে পাইবে না। Pope বা Dryden-এ ইহা নাই, কিন্তু Shelley এবং Keats-এ ইহা বহুলপরিমাণে দেখিবে। যাহা হউক, এই এক ছন্দের কথা বলিতে গিয়া, আমি অন্যান্য নানা কথা ভুলিয়া যাইতেছি। উপরি-উক্ত অহল্যা-নামক কবিতা এমন বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ—ইহার ভিতর জড়-জগতের সহিত এমন একটি অসীম ধাতুগত সহানুভূতি রহিয়াছে যে, বোধ হয় যেন Walt Whitman-এর স্রষ্টা বিশাল-পূর্ণ Shelley-র অমর বীণা লইয়া বজ্রকার করিতেছে। যে সকল অন্ধ এবং বধির পাঠক রবিবাবুকে তাঁহার সেই অপোগণ্ড-কালের কবিতা-সমূহের মধ্যেই চিনিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই অহল্যার প্রকাণ্ড করনার পরিচয় লইতে বলি। তাঁহাদের সঙ্গীর্ণ হৃদয়ে অহল্যার সেই “নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধ জাগরণের” বিশাল চিত্র কি স্থান পাইবে?

‘মানসীর বিদায়’ নামক কবিতার পূর্বার্ধে বিনায়গামী দিবসের বিমণ্ড আলাক জড়িত রহিয়াছে, অপরাধে সজ্জার শিখিল হৃদয়ের আকুলতা এলাইয়া পড়িয়াছে। শেষ কয়েকটি চরণে আকাশ, সাগর এবং সাগর-তীরের উল্লেখ বোধ হয়, যেন কোন সুদূর অপরিচিত দেশে কোন সীমা-হীন শূন্য প্রান্তরের ভিতর সজ্জার বিশাল বিজনতার মধ্যে আব্রহারা হইয়া ভাসিতেছি,—মাথার উপর সজ্জাতারা কেবল তাহার গুহ্র বিমল দীপ্তি বর্ণন করিতেছে। জীবনের একটি ক্ষণিক বিনায় অবলম্বনে জীবনের দোষের মহা-বিদায়ের বিদায়। বাস্তবিক প্রকৃতির হৃদয়ের সঙ্গে এক সুরে স্তমিলিতা এমন কবিতা আমি খুব কমই দেখিয়াছি; ইহাতে যেন জড়-জগতের ইহজীবনের একটি ক্ষণিক বিনায়ের বিরহ-বিমাদে থাকিয়া, কবি প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে মহাবিনায়ের সম্ভাষণ করিয়াছেন। এ বিরহ প্রেমিকের বিরহ এবং কবির বিরহ। ইহারই অধীনে প্রেমিক কবি দেখিয়াছিলেন, “ত্রিভুবনমপি তন্যায়ং বিরহে।” তাই সুদূর পুরাসে থাকিয়া কবি বলিতেছেন,—

অকুল সাগর-মাঝে চলেছে ভাসিয়া  
জীবন-ভরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া  
তোমার বাতাস, বহি’ আনি’ কোন্ দূর  
পরিচিত তীর হ’তে কত সুমধুর  
পুষ্পগন্ধ, কৃত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা,  
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।  
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে  
আসনু আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে  
হিরু ধ্রুবতারাগন; সেই অনিমেঘ  
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ  
কোন্ নিরুদ্দেশ মাঝে।”



এবং বিশুচরাচরের সুন্দর উদার বিষণ্ণ পদার্থের সহিত আপনার স্মৃতি বিজড়িত রাখিয়া প্রেমাস্পদের নিকট ভবিষ্যৎ চিরবিদায়-গ্রহণের কথা উপাধন করিতেছেন। প্রকৃতির হৃদয়ের সহিত এক সূত্রে গুণিত এমন কবিতা খুবই বিরল। ইহাতে যেন জড়-জগতের অব্যক্ত মায়া পড়িয়া রহিয়াছে। পড়িলে বোধ হয়, যেন প্রকৃতির কোন মহান বিশাল রাজ্যের ভিতর দিয়া চনিতেছি, যেন উদার বিস্তৃত সাগর-বক্ষে ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের অবসাদ বিদূরিত করিতেছি,—যেন সংসারচক্রে ঘূর্ণমান ক্রান্ত মান হৃদয় প্রসারিত নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানতার মধ্যে কি এক পবিত্র অথচ বিষাদপূর্ণ শান্তি উপভোগ করিতেছি, যেন হৃদয়ের সম্মুখে অনন্তের মহারাজ্য খুলিয়া গিয়া, কোথা হইতে এক মহান অথচ নিরুদ্ধ উদ্দেশ্য আসিয়া প্রাণকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

এইবার দেখিতেছি, আমার কাজ কঠিন হইয়া উঠিল, এইবার আমি মানসীর প্রেম-কবিতাগুলির উল্লেখ করিব। সকল দেশেরই সাহিত্যে প্রেম-কবিতার দোরায়া একটু বাড়িয়াছে। আমাদের দেশের ত কথাই নাই। এখানে বাগ্‌দেবীর বন্দনা শেষ না হইতেই, পঞ্চবাণের মোড়শোপচারে পূজা। কিন্তু সুস্থ সুন্দর সরল কৃত্রিমতাহীন অথচ প্রেমের মধুর উন্মাদনায় পরিপূর্ণ, এমন কবিতা কয়টি আছে? বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের আকুলতা ও গভীরতা পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও, তাহাদের ভিতর অসীম বিস্তৃতির ভাব নাই। তাহাদের গান প্রায় একই কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এক কথা হইলেও তাহা হৃদয়ের কথা এবং প্রগাঢ় অনুভব-শক্তির পরিচায়ক। তাহা ছাড়া, তাহাদের ভিতর অপূর্ণ কিছুই নাই, সেইজন্য 'একধেয়ে' হইলেও তাহারা চিরজীবনে জীবিত। কিন্তু মানসীর প্রেম-কবিতাগুলি কতই বিচিত্রভাবে পরিপূর্ণ, কত দিক্ হইতে কত বিভিন্ন অবস্থায় কবি প্রেমকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা না কেবলমাত্র শরীরের মরুময় নিকৃষ্ট লালসায় জর্জরিত বা পীড়িত, না অপ্রেমিকের মিথ্যা আধ্যাত্মিকতার আড়ম্বরময় অহংভাবে স্ফীত বা বদ্ধিত-দেহ। তাহাদের ভিতর 'ছিব্লেমি' চটুলতা কিছুই নাই, কিন্তু অতল মানব-হৃদয়ের মর্শ্চোচ্ছ্বাস আছে। মানব-জীবনের পূর্ণ প্রদীপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তাহারা জীবিত, উন্মত্ত, আকুল। বাস্তবিক, মানুষের সমুদয় হৃদয়-বৃত্তির মধ্যে প্রেমের যেমন শ্রেষ্ঠতা, তেমনই সকল কবিতা বা গানের মধ্যে প্রেম-কবিতার শ্রেষ্ঠতা। সর্বতোভাবে সুন্দর প্রেম-গীতি বড়ই বিরল। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিরাই ইহার চরম সৌন্দর্য দেখাইয়াছেন, এবং তাহাদের পরিসর ক্ষুদ্র হইলেও তাহারা তাহারই মধ্যে কবিত্বের যথেষ্ট উৎকর্ষ প্রদর্শিত করিয়াছেন। ইংরেজ কবিদিগের মধ্যে বর্তমান শতাব্দীর পূর্বে একা Shakespeare-ই যেমন অপরূপ সকল বিষয়ে, সেইরূপ এ বিষয়েও তাহার অসাধারণ ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তারপর এই বর্তমান শতাব্দীতেই আমরা যাহা কিছু উচ্চদের প্রেম-কবিতা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রবাবুর কিন্তু শৈশব হইতেই প্রেম-কবিতায় অদ্ভুত অসাধারণ ক্ষমতা। তাহার রচিত প্রায় সকল প্রেম-কবিতাই সর্বতোভাবে সুন্দর, সেই ছেলেবেলার "বলি ও আমার গোলাপ-বালা" হইতে



আজিকার এই মানসীর “আমার সুখ” পর্য্যন্ত, তাহাদের কোথাও ভাব, ভাষা বা ছন্দে একটুও খুঁত নাই। আবার তাহাদের মধ্যে দু-একটির তুলনা নাই। একটির উল্লেখ করি,—“আজু গণি মুহু মুহু”।\* বাঙ্গালা, ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্যে মিলন এবং উপভোগের এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত কেহ কখন শুনে নাই। ইহাতে সমস্ত বসন্তের কুসুম-সুঘনা, শারদ-জ্যোৎস্নার সমস্ত মোহ, এবং মলয়-সমীরণের সমস্ত উন্মাদনা বর্তমান।

মানসীর গোড়ার দিকের প্রেম-কবিতাগুলির ভিতর নবীন প্রেমের প্রথম বিরাগ ও বিরহের সুন্দর মোহ এবং আলা-উপভোগ এবং অধীরতা—হর্ষ এবং বিবাদ, কি মধুর ছন্দেই বর্ণিত হইয়াছে। “বিরহানন্দ,” “ক্ষণিক মিলন” প্রভৃতির ছন্দ, দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিকট কবি ধার করিয়াছেন বটে—কিন্তু প্রথম দুইটি কবিতার অমৃত-মধুর ছন্দ তাঁহার নিজের রচিত। তাহাদের কি সুমিষ্ট স্বাদ—কি সুন্দর গুঞ্জন—প্রতি শ্রোকের শেষ ভাগে মাত্রা এবং মিলনের কি অপূর্ব ছটা। কিন্তু এসকল কবিতারও মধ্যে মিথ্যা কিছুই নাই, চটুল ছিব্লেমি বা ন্যাকামি নাই—প্রেমহীন বিরহের হা-হতাশ নাই, “আন্ ছুরি,” “কই বিষ” নাই। এখানে কোকিল অভিসম্পাত বা নির্বাসনের ভয় না রাখিয়া তাহার আনন্দ-বিকশিত কণ্ঠস্বরে ডাকিতেছে, এবং জ্যোৎস্নাও দাহিকা-শক্তি অর্জন করিতে শিখে নাই। এখানেও কবির নিজ-হৃদয় সত্য এবং স্বভাবের চির-স্বস্ততার ভিতর আছে বলিয়াই আর সকলই প্রকৃতিস্থ। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Byronদিগের বোধ হয় ইহা ভাল লাগিবে না।

গ্রন্থের শেষের দিকের কবিতাসমূহে যে প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ণ, উন্নত এবং গভীর। সে প্রেম পরিণত মানব-জীবনের প্রেম। ইহাতে মানুষকে পরিপূর্ণ এবং পবিত্র করে। জীবনের সম্যক সফলতা এবং বিকাশ আনিয়া দেয়। এ প্রেম জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ বা পরিচ্ছেদ নয়—সমস্ত মানব-জীবনই এই প্রেমের। যেখানে এ প্রেম নাই, সেখানে মানব-জীবনের পূর্ণতাও নাই। সূর্যালোকে যেমন দিবসের শূন্য হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, এ প্রেমও সেইরূপ মানব-হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। ইহাতে সঙ্কীর্ণ হৃদয় বিস্তীর্ণ হয়, ক্ষুদ্র হৃদয় উন্নত হয়, অলস হৃদয় উদ্যমে জাগ্রত হয়। এক কথায়, ইহা প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ, উভয়েরই মুক্তি সাধন করে।

গ্রন্থের দুই দিকের প্রেম-কবিতাগুলির ভিতর যেমন ভাবগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, তেমনই আবার তাহাদের ছন্দ ও গঠনের বিভিন্নতা আছে। পূর্বদিকের কবিতা-গুলির ছন্দের বেশ চটক আছে। তাহাদের মাধুর্য্য মদিরতামিশ্রিত, তাই পাঠককে ক্রমশঃ ক্রান্ত করিয়া আনে। অপরাধের কবিতাগুলির মধুরতার ভিতর নিসর্গের মহৎ বস্তুর উদারতা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহাদের গৌন্দর্য্য-উপভোগে প্রাণ উত্তরোত্তর



বিকশিত হয়। পুথমার্দ্ধ বসন্তের উৎকল কোলাহলে ব্যস্ত, অপমার্দ্ধ সাগরোত্তর মধুর, উদার নির্ধোমে ধ্বনিত হইতেছে।

এই সকল কবিতা আবার কল-কোশলে ইউরোপীয় পুথান কবিদিগের রচনা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কিন্তু তাবের উদ্যো এবং রসের গভীরতায় তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে উচ্চ। শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় হৃদয়েও প্রেমের এতদূর মৌলিকতা এবং গভীরতা নাই, সুতরাং ইউরোপে একরূপ কবিতা এখনও জন্মো নাই। কই, আমি ত ইংরেজী বা ফরাসী কবিদিগের গ্রন্থাবলীর ভিতর “পূর্বকালে” বা “অনন্ত প্রেম” পুভূতির ন্যায় কবিতা দেখি নাই। এই দুইটি কবিতারই মর্ম্ম-কথা—যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাহাকে কি সবে এই মাত্র এই জন্মো ভাল বাসিলাম? আমার হৃদয়ে এই যে প্রেমের প্রগাঢ়, দুরন্ত নিবিড় অনুভব, ইহা কি আত্মিকার? এই বিশুবিলোপী প্রেমের স্রোত কি একদিনে জন্মিয়াছে, না অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে? আমরা যে আজ উভয়ের প্রেমে আত্মহারা, ইহার কি পূর্বাপর নাই? হৃদুর অতীতে আমাদের মত যাহারা ভালবাসিয়াছিল, তাহাদের সেই মহান অনুভবের ভিতর কি আমরা ছিলাম না? এবং ভবিষ্যতে কি এই মহান অনুভব নিবিয়া যাইবে? সকল প্রেমিকের মাঝে আমরা ছিলাম, আছি, এবং থাকিব। বর্তমানে নিখিল জগতের সমস্ত প্রেম আমাদের দুই জনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। Walt Whitman-এ এই ধরণের কথা মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে, কিন্তু Walt Whitman মার্কিনদেশীয়, এবং অনেকটা প্রাচ্যভাবে দীক্ষিত। “দ্যান” নামক কবিতাটির সুন্দর ভাব কেবলমাত্র আমাদেরই দেশের ভিতর বদ্ধ না থাকিলেও, অনুভবের গভীরতায় Hugo বা Shelley-র শ্রেষ্ঠতম রচনার সমান ( “তোমার পাইনে কূল তুমি আমি একাকার” পুভূতি—মানসী)। Hugo বা Shelley-র ভিতর এমন সুন্দর পরিপূর্ণ কবিত্বের আকুল উচ্ছ্বাস দেখি নাই। মানসীতে এখনও নানাবিধক কত কবিতা আছে, যাহাদের এ পর্য্যন্ত নাম উল্লেখ করিতে পারি নাই। তাহাদের ভিতর অনেকগুলিই উপরে সমালোচিত কবিতা-সমূহের ন্যায় সুন্দর। যে-সকল পাঠক মানসীর অপর কোন অংশ বুঝিতে বা তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন নাই, তাহারাও “নব বহুদম্পতির প্রেমালাপে”র রহস্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। “নিষ্ফল উপহারে”র বাঁধাবাঁধি ছন্দ, নিয়ন্ত্রিত রচনা, এবং তাবের শাসন, বহু-সাহিত্যে অদ্বিতীয়। “দুরন্ত আশা”র তীব্র দুরন্ত কশাঘাতে সকল জাতির মনে লজ্জা ও ঘৃণার উদ্বেক হইতে পারে। তাহাতে যে বেদুইনেশ বর্ণনা আছে, তাহা কোন্ শ্রেষ্ঠ কবির না উপযুক্ত? “শূন্য ব্যোম অপরিস্রাণ মদ্যগম করিতে পান”—ওমর খায়্যামের যোগ্য—সহসা শুনিলে তাহারই কথা বলিয়া ভ্রম হয়। “সুরদাসে”র প্রার্থনায় সৌন্দর্য্য-বিধুর প্রেমবিহ্বল কবি-হৃদয়ের কি সুন্দর কাতর চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি হৃদয়-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এমন হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, যেন Browning ও Shelley একত্র মিলিত হইয়াছে। ইহার উপান্ত Stanza-র





সুন্দর কবিত্বময় বর্ণনা একবারমাত্র পাঠে মনে চিরকাল রহিয়া যায়। কেমন অল্প কথায়, উজ্জ্বল উপমার ওপে, “ভীষণ মধুরে”র প্রদীপ্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে,—

“উজ্জ্বল যেন দেব রোমানল”

“উদ্যত যেন রাজ”

দুইটি বন্ধুকে লিখিত দুখানি পত্রের ভিতর বন্ধু-হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহশীলতা কবিতার স্রোতের সঙ্গে কেমন সুন্দর মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ইহাদেরও ভিতর স্বভাব-বর্ণনে কবির স্বাভাবিক নোহনদ্র পরিস্ফুট,—

“যেন রে সরল টুটে কুন্দ আর না ফুটে  
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল”।

এই কয়টি কথায় যেন ভরা শ্রাবণের মেঘ-স্নিগ্ধ হৃদয়ের আলোক ও ছায়া, সৌরভ এবং শ্যামকান্তি, প্রাণে আসিয়া পড়ে।

“নারীর উজ্জ্বল” এবং “পুরুষের উজ্জ্বল” ভাল হইলেও আদর্শের উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। পুথ্যটির আরম্ভ অবিকল Browning-এর মতন হইলেও পরে তাহার অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তির কিছুই দেখিলাম না। Browning-এর কথার ধারই ইহাতে নাই, এবং ইহার ভিতর মানব-জীবনের কোন রহস্যও উদ্ভাবিত হয় নাই। “পুরুষের উজ্জ্বল”তে কিন্তু একটি বেশ গভীর সত্য প্রকটিত হইয়াছে।—

“কেন তুমি নুস্তি হয়ে এলে,

রহিলে না ধ্যান-ধারণার।

সেই মায়া উপবন, কোথা হল অদর্শন,

কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাখার।”

তাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর গদ্য কাব্যের নামকের সহিত কেবলমাত্র এক রাত্রি প্রেম-সন্তোগের পর চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া নায়িকা বলিয়াছেন,—“তোমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমার নিকট আসিবার জন্য নিয়তই তাহার পক্ষ সম্বলন করিবে। আমি তোমার চির-বাহিত হইয়া রহিব। তোমার লুপ্ত কল্পনা আমাকে পাইবার জন্য অনুদিন উৎসুক থাকিবে।”—(Mademoiselle de Maupin).

“শূন্য গৃহে” এবং “জীবন-মধ্যাহ্ন” দুইটিই আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। তাহাদের ভাষা ও ছন্দের পারিপাট্য এবং তাবের গাভীর্য্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী। নিম্নলিখিত শ্লোকের করুণ রস কি সরল সুন্দর ভাষাতেই ব্যক্ত হইয়াছে!—“কাল ছিল প্রাণ যুড়ে \* \* \* \* হেন বজ্রপাত” (৭৬ পৃঃ) “তারায় তারায় তার ব্যথা গিরে লাগে”—সৌন্দর্য্যে Tennyson-এর “Star to star vibrates light”—এর অপেক্ষা ইহা কোন্ সংশে ন্যূন নহে। “জীবন-মধ্যাহ্ন”র ন্যায় দ্বিতীয় কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় দেখি নাই। ইহা সুন্দর ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ, এবং পূর্ণ



প্ৰাণের উজ্জ্বল। ইহাতে কোনরূপ ভান বা আড়ম্বর, কোনরূপ ভঙ্গী বা ভেদান নাই। হৃদয়ের যথার্থ ভাবই যথায়থ চিত্রিত হইয়াছে। ইহার এক একটি উপমা অতি মনোহর :—

“ নজ্জা বদ্র জীর্ণ শত ঠাই ”

“ ————— শস্যশীর্ষরাশি

ধরার অঙ্কলতল ভরি ”

আর দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়াই এই দীর্ঘ পুস্তকের শেষ করিব।

“ নিষ্ফল কামনা ” একটি নিতান্ত অভিনব পদার্থ। আমাদের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্র ছন্দে এমন কবিতা রচিত হইতে পারে না। মিলের অভাবে তাহা নিতান্ত শোভাহীন ও শুনিতে নিতান্ত শ্রুতিকঠোর বোধ হইবে। কিন্তু রবিবাবু দেখাইলেন যে, এইরূপ মাত্রাবিভাগে বেশ সুন্দর অমিত্র ছন্দ রচিত হইতে পারে।

“ উচ্ছৃঙ্খল ” নামক কবিতাটির কি চমৎকার, কি সুন্দর, কি কারুণ্যপূর্ণ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে! উচ্ছৃঙ্খলের কি নূতন, কি পরিপূর্ণ চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে! ইহার ভাবে কি গভীরতা! ছন্দে কি আকুলতা! ভাষায় কি তরঙ্গ! ইহার ভাষা ও ছন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবিদিগের ভাষা ও ছন্দের ন্যায় উন্মুক্ত এবং উদার। Shelley বা Swinburne-এর ইংরাজী, Hugo বা Leconte de Lish-এর ফরাসী, ভবভূতি বা জয়দেবের সংস্কৃত, ইহা অপেক্ষা কোন অংশে বেশী গৌরবান্বিত নহে।

উপসংহারে কি বলিতে হইবে যে, মানসীর কবিতাগুলি ভাবপুধান না বস্তুপুধান? তাহারা কোন্ বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, এবং তাহাদের ভিতর কবি কি গুণ তত্ত্ব নিহিত করিয়াছেন? অতি আত্মাদের সহিত বলিতেছি, আমরা এ সকল বিষয়ে কিছুই জানি না, এবং জানিতেও চাহি না। কেবল এই মাত্র জানি যে, সৌন্দর্য্য-অনুভবে তাহাদের জন্ম, সুন্দর অভিব্যক্তিতে তাহাদের বিকাশ। যেখানে এই দুইটি আছে, সেখানে অপর সকলই আছে বা আর কিছুই প্রয়োজন নাই। কাব্য-সম্বন্ধে —আর কেবলই কাব্য-সম্বন্ধে কেন?—সমস্ত কলাবিদ্যা-সম্বন্ধে পুথন এবং শেষ কথা এই যে, সমালোচ্য বিষয়টি সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক কিনা? যদি তাহাতে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ থাকে, তবে তাহার অপর হাজার কেন অভাব থাকুক না, তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না—তাহাতে তাহার নিজ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, কিন্তু হাজার অপর গুণের আধার হইয়াও যদি তাহাতে সৌন্দর্য্যের স্ফুর্তি বা বিকাশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা একেবারে অপদার্থ। তাহার নিজ উদ্দেশ্য তাহাতে সাধিত হয় নাই। পৃথিবীতে তাহার স্থান বা প্রয়োজন নাই। আমার যতটুকু রসাস্বাদন-শক্তি আছে, তাহাতে আমি নিঃসংশয়ে নিদেশ করিতে পারি যে, মানসীতে সৌন্দর্য্যের সর্বদীপ্ত বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং ইহার জ্ঞাতি বা সম্প্রদায়-নির্ব্বাচনের প্রয়োজন দেখি না। ইহা পুথন শ্রেণীর কাব্য। পুথন শ্রেণীর কাব্যের এই এক অসাধারণ



গুণ যে, তাহার সহিত কাহার কোন বিবাদ-বিগ্নবাদ থাকিতে পারে না, সকল শ্রেণীর লোক তথায় স্থান পাইতে পারে। তাহাতে কোন সম্প্রদায়িকতা নাই বলিয়া, সকল সম্প্রদায় তাহার উদার সৌন্দর্যের অসীমতার ভিতর মিলিত হইতে পারে। সে কবিতা বিষয়-অনুসারে বস্তুগত বা ভাবগত। তাহার সৌন্দর্য যেমন অনুভবে, তেমনি অভিব্যক্তিতে,—যেমন করনায়, তেমনি রচনায়,—যেমন অন্তর্দৃষ্টিতে, তেমনি বহির্দৃষ্টিতে। তাহা যেমন জপিবার, তেমনি মাতিবার এবং মাতাইবার। মানসীর ভিতর এমন অনেক কথা আছে, যাহা পাঠে হৃদয় তাহার অন্ধ রুদ্ধ গৃহ হইতে নিজ্জাস্ত হইয়া বিশু-চরাচরে ছড়াইয়া পড়ে—সমস্ত সৃষ্টির ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া যায়—ব্যাকুল প্রাণ জগতের মাঝখানে আগিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। আপনাতে আপনি থাকিতে না পারিয়া জগৎ-সংসারের মাঝে সংসার রচনা করে, এবং সমস্ত মানব-হৃদয়ের সহিত মিলিত হয়। আবার এমনও কথা আছে যে, হৃদয় নিজের পুচ্ছনুতর অন্তঃপুর-মধ্যে সেই একই কথার ধ্যানে নিমগ্ন হয়। বিশু তখন বিলুপ্ত—জগৎ শূন্য। প্রাণ—প্রাণেরই ভিতর পুৰিষ্ট ও আপনাতে আপনই বিভোর। এইরূপে মানসীতে পূর্ণতম সৌন্দর্য, উচ্চতম কবিত্ব, এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। সত্যই ইহা “শ্রেষ্ঠতম প্রাণের বিকাশ,” বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন, এবং কাব্যানোদী ব্যক্তিমান্বেরই আদরের বস্তু।

[সাহিত্য, ১৩০০]

## প্রাচীন সাহিত্যালোচনা

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়। কোন্ অজ্ঞাত অধিত্যকায়, কোন্ অজ্ঞাত শৈলোৎস হইতে নদীর উৎপত্তি। কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্বচ্ছ-পঙ্কিল, কার-স্বাদ্ জলস্রোতে নদীর অঙ্গপুষ্ট। সমবেত গলিল-সমষ্টির কেমন উচ্ছলিত বক্র ধর ভঙ্গীময় গতি। শেষে, সাগরসঙ্গমে নদীর কেমন মত্তর আয়ত শতমুখ ধারা। ভাষা-প্রবাহও নদী-গতির তুল্য।

কোন্ আর্ন্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোন্ পুণরীর পুনোচ্ছ্বাসে, কোন্ বীরের উদ্দীপনায়, কোন্ ভক্তের ভক্তি-সাধনায় ভাষার উদ্ভব, কে স্থির করিবে? কত কবি, গায়ক, লেখক, ভাবুকের কাব্য-স্রোত, গীত-স্রোত, রচনা-স্রোত, চিন্তা-স্রোতে ভাষার কলেবর-পুষ্ট সাধিত হয়। জাতির মধ্যজীবনে সুপুষ্ট ভাষার কেমন গদ্য-পদ্য-নাটক-কাব্য-উপন্যাসময় নব রস-রুচির অভিরাম প্রবাহ লক্ষিত হয়। শেষে,



ভাষার চরম উন্নতির কালে জাতীয় সাহিত্যের কেমন প্রশান্ত, গম্ভীর সর্বতোমুখ প্রসার। তাই বলিতেছিলাম, ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়।

সকল নদীই জলস্রোত ; কিন্তু নদীতে নদীতে কত প্রভেদ। এই প্রভেদ বুঝিতে হইলে, নদীর এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝা চাই। সিন্ধু-নদে বর্ষায় বন্যা না হইয়া শীতকালে কেন বন্যা হয়, আর গঙ্গানদীতে শীতে বন্যা না হইয়া বর্ষাকালে কেন বন্যা হয়—এ প্রভেদ, নদনদীর এই বিশেষত্ব, তাহাদিগের উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি না বুঝিলে বুঝা যায় না। ভাষারও এইরূপ। সকল ভাষাই বাক্যস্রোত। কিন্তু ভাষাতে ভাষাতে কত প্রভেদ। এই প্রভেদ বুঝিতে হইলে, ভাষাগত এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, ভাষার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝা চাই। গ্রীসে হোমর কেন, ইতালীতে দান্তে কেন, ভারতে কালিদাস কেন, ইংলণ্ডে সেক্সপীয়র কেন—এ প্রভেদ, গ্রীক ইতালীয় সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষার এই বিশেষত্ব, তাহাদিগের উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি না বুঝিলে বুঝা যায় না।

নানা কারণে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝিবার জন্য সভ্য জগৎ সচেষ্ট হইয়াছেন। বুদ্ধপুত্রনদ কি মানসগরোরাজ্য, ইহার অঙ্গ কি সাম্পুর জলে পুষ্ট ; নীলনদী কি নাদয়নজা হ্রদ হইতে উদ্ভূত, ইহার অঙ্গ কি অট্‌বরার সলিলে, প্রবৃদ্ধ,—এই সকল কথার সন্ধানার্থে সভ্য জগৎ কত ভূগোলবিদ কত নৌ-যাত্রার শ্রম, ব্যয়, বিপদ ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয়, সভ্য জগতের এই শ্রম, ব্যয়, বিপদ, অধ্যবসায়ের মূলে জাতীয় স্বার্থানুেষণ নিহিত আছে। বোধ হয়, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, জাতীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নদীর গতি বুঝা আবশ্যিক। আর নদীর গতি বুঝিবার জন্য তাঁহার উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝা আবশ্যিক। তাই তাঁহাদিগের নৌ-যাত্রার এত শ্রম, ব্যয়, বিপদ ও অধ্যবসায়-স্বীকার। ভাষার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝিবার জন্যও ভাষা-স্রোতে নৌ-যাত্রা আবশ্যিক। এই নৌ-যাত্রার জন্য প্রয়োজন-মত শ্রম, ব্যয়, বিপদ ও অধ্যবসায় স্বীকার করা আবশ্যিক। অন্যথা ভাষার প্রভেদ, ভাষার বিশেষত্ব—ভাষা-প্রবাহের স্বরূপ বুঝা যাইবে না।

নদীর স্রোতের মত ভাষার স্রোতেও কয়েক বৎসর হইতে সভ্য জগৎ নৌ-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। জননী ল্যাটিন ভাষার কোন্ 'প্রাকৃত' প্রত্যঙ্গ হইতে ফরাসীর উৎপত্তি, বর্তমান যুগের ইংরাজি আদি কবি চরিত্রের সহিত ফরাসী রোমান্স-লেখকদিগের কি সম্বন্ধ, লুথরের বাইবেলের অনুবাদ কি পরিমাণে জার্মান ভাষার শিশু-অঙ্গ পদ্যপুষ্টি করিয়াছিল,—এই সকল কথার সন্ধানার্থে সভ্য জগৎ কত ভাষাতত্ত্ববিদ কত শ্রম, ব্যয়, আয়াস, অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য সভ্য-জগতের এই শ্রম, ব্যয়, আয়াস, অধ্যবসায়ের মূলেও জাতীয় স্বার্থানুেষণ নিহিত আছে। তাঁহারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, ভাষাগত জাতীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ভাষার প্রবাহ বুঝা আবশ্যিক। আর ভাষার প্রবাহ বুঝিবার জন্য তাঁহার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝা আবশ্যিক। তাই তাঁহাদিগের ভাষা-স্রোতে নৌ-যাত্রার এত শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায়।



ভাষার এই উদ্ভব কোথায়? ভাষার এই কলেবর-পুষ্টি কোথা হইতে? দেশ কাল ও অবস্থাতেই ভাষার উদ্ভব কোথায়ও আর্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোথায়ও পূর্ণার প্রেমোচ্ছ্বাসে, কোথায়ও বীরের উদ্দীপনায়, কোথায়ও ভক্তের ভক্তি-সাধনায়। ভাষা-প্রবাহের যে অংশ আমাদের নয়নের সন্মুখে প্রবাহিত হইতেছে, সে অংশ উদ্ভব-স্থান হইতে এত যোজন দূরে, যে বহু আয়াসেও ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণা-নৌকা তত দূর পৌঁছিতে পারে না। সুতরাং অনেক ভাষার উদ্ভব-স্থান আজিও স্থির হয় নাই; কখনও হইবে কি না, বিশেষ সন্দেহ।

কবি, গায়ক, লেখক ও ভাবুকের কাব্য-স্রোত, গীত-স্রোত, রচনা-স্রোত এবং চিন্তা-স্রোত মিলিয়া ভাষার কলেবর-পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণার লক্ষ্য এই প্রাচীন কবি, গায়ক, লেখক, ভাবুকের কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার সংগ্রহ। তাঁহার আলোচনার বস্তু এই প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিবর্তন। ভাষাতত্ত্ববিদ বুঝেন যে, এ সকল না বুঝিলে ভাষার কলেবর-পুষ্টি বুঝা যাইবে না। আর ভাষার কলেবর-পুষ্টি না বুঝিলে ভাষার প্রবাহ বুঝা যাইবে না। সেই জন্যই প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তা বুঝিবার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদের এত শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায়-স্বীকার।

প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই কার্যে প্রবৃত্তি হয়, অন্যথা হয় না। অবশ্যই কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য, কোন উচ্চ জাতীয় স্বার্থসাধনের জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ এই শ্রম, ব্যয়, আয়াস, অধ্যবসায় স্বীকার করিতেছেন। এই প্রয়োজন কি? প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন বিশেষই আছে। আর প্রয়োজন এক নহে, অনেক। কথাটার একটু অনুধাবন করা আবশ্যিক।

প্রথমতঃ, নবীন সাহিত্যের আলোচনায় যে ফল, প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায়ও সেই ফল অনেক পরিমাণে সাধিত হয়। এ ফল কি, কাব্যমোদী মাত্রেরই বিদিত আছে। এ ফল হৃদয়ের একটা প্রসার, জ্ঞানের একটা বিস্তৃতি, চিন্তার একটা গভীরতা, স্বপ্নের একটা পরাকাষ্ঠা, একটা ভূমানন্দ-লাভ। অধিকন্তু প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা আবেগ, একটা প্রথম উদ্দীপনার নব-ভাব, একটা সারল্য, স্বাভাবিকতা, অকপট-ভাব আছে, যাহা নবীন সাহিত্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় এইটুকু অধিক ফল।

দ্বিতীয় কথা, নবীন সাহিত্য সম্যক্রূপে বুঝিতে হইলে তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের বিবর্তনরূপে বুঝা চাই; অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের কোন্ বীজ কিরূপে কত দিনে ক্রম-বিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখা-কাণ্ডে পরিণত হইল, তাহা বুঝা চাই। অর্থাৎ এ সকল বিষয় ঐতিহাসিকের চক্ষে, ইতিহাসের আলোকে দেখা চাই। যেমন বাষ্পীয় যানের স্বরূপ বুঝিতে আমরা চারি সহস্র বৎসর পূর্বের আবিষ্কৃত বাষ্প-ক্রীড়ায়ন্ত্রের ক্রমোন্নতি ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করি, যেমন শব্দের বেদান্ত-মত বুঝিতে আমরা ছয় সহস্র বৎসর পূর্বের প্রচলিত অশ্বৈতবাদের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকরূপে আলোচনা



করি, এইরূপ নবীন সাহিত্য সম্যক বুঝিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করা চাই। এইরূপে আমরা নবীন সাহিত্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব; অন্যরূপে নহে। এ বিষয়ে একজন বিজ্ঞ ফরাসী সমালোচক কতকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সমালোচক ঐতিহাসিকের চক্ষে মহাকাব্যাদি না পড়িয়া স্থাবক বা উপাসকের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ-পাঠের নিন্দা করিতেছেন।—“এরূপ পাঠে আলোচনা হয় না, ইহাতে অযথা উপাসনারই প্রশংসা দেওয়া হয়। ইহাতে আমাদের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপিত হয়, কিন্তু আদর্শের উদ্ভব কিরূপে, তাহা আমরা জানিতে পাই না। বিশেষতঃ, ঐতিহাসিকের পক্ষে মহাকবির কাব্যাদির এরূপভাবে আলোচনা বড় অসম্ভব। এরূপে আমরা কবিকে কালের সম্বন্ধ হইতে অপসৃত করিয়া লই, কবির প্রকৃত জীবন, কবির ঐতিহাসিক সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত করিয়া লই। এরূপে সমালোচনা প্রচলিত অযথা আদরের অনুবর্ত্তী হয়; এবং সাহিত্যের বিকাশক্রমের আলোচনা-বিষয়ে অযত্ন ঘটে।”\*

ফরাসী সমালোচক মহাকবির কাব্য-সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন, নবীন সাহিত্য-সম্বন্ধেও ঐ সকল কথা বলা যায়। নবীন সাহিত্যও ঐতিহাসিক সম্বন্ধবিহীন করিয়া, সাহিত্যের বিকাশক্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রীতিমত আলোচিত হইতে পারে না। নবীন সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দোবদ্ধ, শব্দ-বিন্যাস, রচনা-প্রণালী বুঝিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দোবদ্ধ, শব্দ-বিন্যাস, রচনা-প্রণালীর পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যিক। অতএব প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর এই প্রয়োজন এক নহে, অনেক।

তৃতীয় কথা, ব্যক্তি মানুষের যেমন জীবনের একটা ইতিহাস আছে, সমষ্টি মানুষ-সমাজের তেমনই জীবনের একটা ইতিহাস আছে। আর সমাজের যে প্রধান বন্ধনী—ভাষা, যাহাতে বায়ু-তাড়িত বালুকণার মত ব্যক্তি মানুষ দশ দিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া সমাজে দলবদ্ধ থাকে, সেই ভাষারও একটা ইতিহাস আছে। সমগ্র মানুষের ভাষাও সমগ্র। ভাষাও অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃত, অবিশেষ হইতে বিশেষ, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত, অবিকাশ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ব্যাকৃত বিশিষ্ট ব্যক্ত বিকশিত ভাষারও অঙ্কুর হইতে পল্লব, পল্লব হইতে শাখা, শাখা হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে মহামহীকূলের প্রকাশ লক্ষিত হয়। এই প্রকাশের ক্রমই ভাষার ইতিহাস। ইংরাজি ভাষার ইতিহাসের পাঠক জানেন যে, গথিক হইতে স্যাকসন, স্যাকসন হইতে অর্কস্যাকসন, অর্কস্যাকসন

\* “It (a classic) claims not study but veneration; it does not show us how the thing is done, it imposes upon us a model. Above all for the historian, this creation of classic personages is inadmissible; for it withdraws the poet from his time, from his proper life, it breaks historical relationships, it blinds criticism by conventional admiration and renders the investigation of literary origins unacceptable.”

—M. Charles, d'Hericault quoted in M. Arnold's *Essays in Criticism*



হইতে আদ্য ইংরাজি, আদ্য ইংরাজি হইতে মধ্য ইংরাজি, মধ্য ইংরাজি হইতে পুরাতন ইংরাজি, পুরাতন ইংরাজি হইতে আধুনিক ইংরাজির প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই ইংরাজি ভাষার ইতিহাস।\* এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে, বৈদিক সংস্কৃত হইতে ভাষা-সংস্কৃত, ভাষা-সংস্কৃত হইতে গাথা, গাথা হইতে পালী, পালী হইতে প্রাকৃত মাগধী, মাগধী হইতে আদ্য বাঙ্গালা, আদ্য বাঙ্গালা হইতে মধ্য বাঙ্গালা, মধ্য বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস।† এই ভাষার ইতিহাস-জ্ঞান প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞানসাপেক্ষ। অতএব ভাষার ইতিহাস-জ্ঞানের জন্য প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনার প্রয়োজন।

আর এক কথা। কোন ভাষার ব্যাকরণ সংকলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞান থাকা চাই। ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ, অস্থি মজ্জা মেন মাংস শিরা স্নায়ু প্রভৃতির পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সুসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান আবশ্যিক। এ বিষয়ে পাণিনির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত এই,—“ব্রাহ্মণজাতির প্রাচীনতম কাব্য বেদ অধ্যয়নের ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণের সৃষ্টি। বেদ-মন্ত্রের ভাষা এবং পরবর্তী কালের রচনার ভাষা এই উভয়ের প্রভেদ সম্বন্ধে লিখিত ও রক্ষিত হইত। ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রথম উদ্যমের নিদর্শন প্রাতিশাখ্য। ঐ সকল গ্রন্থের উপর দৃঢ় ভিত্তি করিয়া বৈয়াকরণের পর বৈয়াকরণ যে অদ্ভুত অট্টালিকা নির্মাণ করেন, তাহা পাণিনির ব্যাকরণে সম্পূর্ণতা লাভ করে।”†

এইরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য-পাঠের লক্ষণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে; কারণ কোন ভাষার প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার পরিজ্ঞান না থাকিলে সে ভাষার ব্যাকরণ-সংকলন সর্বদা অসম্ভব।

আর যাহাকে ভাষা-বিজ্ঞান বলে, সে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। যে একই আৰ্য্য ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, গথিক, কেল্টিক ও গুয়াডনিক, এ সকল ভাষার জননী, ইহারা যে পরস্পর ভগিনী-স্থানীয়া, এ তত্ত্বের উদ্ভাবন ও মীমাংসা কেবল ঐ সকল ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা-দ্বারা সম্ভাবিত হয়। এইরূপ যদি আমরা সংস্কৃতের দুহিতভূতা বাঙ্গালা,

\* “The grammar of modern English is not the same as the grammar of Wycliffe. Wycliffe's English, again may be traced back to what we may call Middle English from 1500 to 1330; Middle English to Early English from 1330 to 1230; Early English to Semi-Saxon from 1230 to 110 and Semi-Saxon to Anglo-Saxon.”

—Max Müller, *Science of Language*, First Series, p. 132.

† Max Müller, *Science of Language*, First Series, p. 126.



হিন্দী, গুরুমুখী, মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া, আগামী পুত্ৰিত পুচলিত ভাষার ভগিনী-সম্বন্ধ বুঝিতে ইচ্ছা করি, যদি একটা ভারতীয় ভাষা-বিজ্ঞান রচনা করিবার পুরাস করি, তবে আমাদিগকে ঐ সকল ভাষার প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিত্তার বহন আলোচনা করিতে হইবে।

চতুর্থ কথা, কোন ভাষার পুণালী-বিশুদ্ধ অভিধান সংকলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা চাই। অভিধান বলিলে শুধু পুচলিত শব্দ-সকলের পুচলিত অর্থ-সংগ্রহ বুঝিতে হইবে না। পুণালী-বিশুদ্ধ অভিধানে অধুনা-পুচলিত বা ইতঃপূর্ব পুচলিত সকল শব্দের অর্থ, উৎপত্তি এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবরণ থাকা চাই। এ বিষয়ে মারের নূতন ইংরাজি অভিধানের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অভিধান ভাষা-বিজ্ঞান-বিষয়ে ইংরাজজাতির আয়াস ও অধ্যবসায়ের চরম উদাহরণ। এই অভিধান-সংকলন-বিষয়ে সহস্ সহস্ মনীষী পরিশ্রম করিতেছেন, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে। অভিধান-সংকলনের উদ্দেশ্য-বিষয়ে সম্পাদক মারে সাহেব এইরূপ\* লিখিয়াছেন,—“এই অভিধানে পুত্ৰিক শব্দ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে :—কবে কিরূপে কি আকারে কি অর্থে ঐ শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয় ; কালে কালে উহার আকার ও অর্থের কি বিকাশ হইয়াছে ; ঐ আকার ও অর্থের কোন্গুলি পুচলিত, কোন্গুলি অপুচলিত। কি পুণালীতে, কত দিন হইল, কি নূতন প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বিষয়গুলি আবার দৃষ্টান্তসহ দেখাইবার জন্য সেই শব্দের প্রথম প্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ প্রয়োগ বা আজ-কালকার প্রয়োগ পর্যন্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইরূপে সেই শব্দের ইতিহাস ও অর্থ ক্রম প্রকটিত হইয়াছে ; এবং ঐতিহাসিক নিয়মে, আধুনিক শব্দ-বিজ্ঞানের পুণালী-অনুসারে সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করা হইয়াছে।” বলা বাহুল্য, এই রীতি-অনুসারে অভিধান-সংকলন হওয়া উচিত ; আর এইরূপে অভিধান সংকলিত করিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের পুত্ৰিত আলোচনা আবশ্যিক। মারের অভিধান-গত একটা শব্দের প্রুতি দৃষ্টিপাত করিলে এ কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিভ শব্দের প্রুতি লক্ষ্য করুন। ঐ শব্দের অর্থ বুঝাইতে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য হইতে অন্ততঃ দেড়শত প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যাদি হইতে উদ্ধারের

\* “It endeavours (1) to shew with regard to each individual word when how in what shape and with what signification it became English ; what development of form and meaning it has since received ; which of its uses have in the course of time become obsolete and which still survive ; what uses have since arisen by what processes and when : (2) to illustrate these facts by a series of quotations ranging from the first known occurrence of the word to the latest or down to the present day : the word being thus made to exhibit its own history and meaning : and (3) to treat the etymology of each word strictly on the basis of historical fact and in accordance with the methods and result of modern philological science.”—Murray's *New English Dictionary*, Preface.



সংখ্যা অধিক। প্রায় নয় শত বৎসর পূর্বের রচিত গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধারেরও অভাব দৃষ্ট হয় না। অতএব এই একটি শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য নয় শত বৎসরের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিতে হইয়াছে। বোধ হয়, এখন সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অভিধান-সংকলনের জন্য প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিত্তার পুত্ত আলোচনা আবশ্যিক।

প্রথম কথা, পাশ্চাত্যেরা যাহাকে তন্তু-বিচ্ছেদ\* বলেন, ভাষার উদ্ভাবন যৌবনে প্রায়ই তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা। শিক্ষাবিস্তারের সহিত ভাব ও ভাষার একটা আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের আরম্ভ হয়। তাহার ফলে জাতীয় সাহিত্য বিজাতীয় আদর্শের অনুগামী হইয়া বিকৃত হইয়া পড়ে। অবশ্য বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণে জাতীয় সাহিত্যের অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়; কিন্তু প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের যে সংযোগ-তন্তু, যে ধারাবাহিক ক্রম, তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। এ বিষয়ে বাদলা ভাষার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। বহুদিন হইতে ইংরাজি সাহিত্যের ভাব ও ভাষার অনুকরণে বাদলা সাহিত্য জাতীয় বিশেষত্ব হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই সুকান্দর্শী চন্দ্রনাথবাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন, “এখনকার বাদলা কবিতা (সাহিত্য বলিলে হয় না?) প্রায়ই চিনিতে পারি না; সে জন্য আমি বড় কাতর।” মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“এখনকার বাদলা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরাজি যে না জানে, সে বোধ হয়, সকল সময়ে বুঝিতে পারে না।” এই বিকৃতি দূর করিবার জন্য, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের সংযোগ-তন্তু অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যিক। বিজাতীয় আদর্শের পার্শ্বে প্রাচীন জাতীয় আদর্শ সাহিত্যসেবীর নয়নের সম্মুখে রাখা আবশ্যিক। অতএব প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিত্তার আলোচনার এই আর এক প্রয়োজন।

শেষ কথা, জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিক্রিয়া। কবির হৃদয় প্রশস্ত দর্পণ-তুল্য; যে কালে জাতীয় জীবনের যে ভাব, জাতির যাহা রীতি-নীতি, পুণালী-পদ্ধতি,—সেই কালের কবির কাব্যে তাহার ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। সেক্সপীয়র যে, নাটকে স্বভাবের প্রতিবিম্ব-গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই মর্মেণের কথা। এ হিসাবে কবি সমসাময়িক কালের নিপুণ ঐতিহাসিক। কত সহস্র বৎসর বৈদিক যুগ অতীত হইয়াছে; সে বৈদিক ঋষি, বৈদিক যাগ, বৈদিক জীবন, বৈদিক আচার-ব্যবহারের চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু বেদের সূক্তে তৎসমুদয়ের কেমন সুস্পষ্ট ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এইরূপ ইলিয়াদ† অতীত গ্রীক-জীবনের এবং এদায়‡ অতীত স্ক্যান্ডিনেভীয়-জীবনের চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত আছে। বাস্তবিক, জাতীয় ইতিহাস-লেখকের জাতীয় সাময়িক সাহিত্য উৎকৃষ্ট অবলম্বন। মেকলে সাহেব

\* Solution of continuity.

† Homer's Iliad.

‡ The two Eddas.



সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিতে তাৎকালিক নাটকাদি হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। অতএব অতীত যুগের জাতীয় জীবন, সেই কালের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিবার জন্য তখনকার রীতি-নীতি, আচার-বিচার, পুণালী-পদ্ধতি জানিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন—কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার বহুল আলোচনার প্রয়োজন।

সেই জন্য বলিতেছিলাম, প্রয়োজন যথেষ্টই আছে; আর প্রয়োজন এক নহে, অনেক। প্রথম, প্রাচীন কাব্যাদির অকপট ভাব ও স্বাভাবিকতার আশ্বাদ; দ্বিতীয়, নবীন সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের বিকাশের ঐতিহাসিক ক্রমনির্ণয়; তৃতীয়, ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ-সংকলন এবং ভাষা-বিজ্ঞান-রচনা; চতুর্থ, পুণালী-বিশুদ্ধ অভিধান-পুণ্যন; পঞ্চম, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ; শেষ, জাতীয় অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত-জ্ঞান। এই সকল প্রয়োজন-গিদ্ধির জন্য প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনা অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, এই সকল অতি উচ্চ প্রয়োজন, এবং ইহাদিগের সম্যক সাধনেই জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং উর্দ্ধগতি।

[বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০১]

## মহাকাব্যের লক্ষণ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ইংরাজি এপিক্-শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে, আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকাব্যের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং এই সকল মহাকাব্য সম্ভবত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্বদা সন্মত হন না। প্রথমত, এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলি অত্যন্ত উৎকটরূপে



লক্ষন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, বর্নশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে বোধ করি এই দুই গ্রন্থের মর্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য ধ্বংস করা হয়।

বস্তুতই মাহাত্ম্য ধ্বংস করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জুনীয় যে শ্রেণীর—যে পর্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও বর্নশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। মহাশি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে পুচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয় ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহাশিদেরকে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না। কেন না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সম্ভবত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব-কিরাতার্জুনীয়কে আপাতত মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সহদ্বন্দ্ব রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে; অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উজ্জ্বল মত এই উজ্জ্বলতিকেও সুদীর্ঘনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আশঙ্কালন সত্ত্বেও ইউরোপখণ্ডে কবিত্বের যেক্রপ ক্ষুদ্রতা দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উজ্জ্বল ভিতর একটি পুচ্ছনু সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্চণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি শরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যিক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আনুষ্ঠানিক-সম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। \* বধুবংশ, কুমারসম্ভব ও প্যারাডাইস্ লষ্টকে আমি এস্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্যায়ের কাব্য, সেই পর্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সে-ই কোন-কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে পুচ্ছিত





গ্রন্থ দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্যদেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না; কিন্তু শেক্সপীয়ারের নাম মনে রাখিয়াও অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও একবারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল; তাহার পর কত-হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন একরূপ হইল, তাহার কারণ চিস্তনীয়; কিন্তু সেই কারণ আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক-একবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্তমান অবস্থাই বোধ করি আর সেই-শ্রেণীর মহাকাব্য উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্য-সমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন করুনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্যস্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ধীমারে তুলিয়া পুস্তান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েনকে গাড়ির চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন নাই। সিডান্সকেত্রো বিসমার্ক লুই নেপোলিয়নকে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার বুক চিরিয়া নেদপোলিয়ন-বংশের শোণিতের আত্মদগ্ধরণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রোতায়ুগ-অবসানের বহুদিন পরে বুয়রদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্ম লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে, মনেহ নাই; কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক আছে, একালে সে দিকটাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক একসময় আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিতাল্দির দিন গত হইয়াছে। শিতাল্দি-নামক অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যের অপূর্ব্ব বিশ্রুণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্তপান করিয়া জিবাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে; কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষমাত্র-শ্রাণনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে,





কিন্তু ভীমরতিগুপ্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজি-দ্বীপে নিব্বাসন গ্রহণ করিতে পুস্তক থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশুখানা ঘোর নিশাকালে সুখসুখ বালক-বৃদ্ধের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রুরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রুরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিধয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শক্রশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সভ্য, কিন্তু তাঁহাদের লোহবর্ষের অন্তরালে কারেন্সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি-হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্তিটা অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে সভ্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও বোধ করি সময়মত কৌপীনধারী হইয়া সভ্যমধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না; কিন্তু এখনকার অনুহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোষাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রুরতা ছিল, বর্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ, কোনরূপ রঙ-ফলান ছিল না। একালেও ক্রুরতা, বর্বরতা ও পাশবিকতা হয় ত ঠিক তেমনি বর্তমান আছে; তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটলা ও জর্জিয়ার প্রেতারার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতই চারি-হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদলায় নাই; তবে সমাজের মূর্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা যে কাব্যগ্রন্থে প্রতিকলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্তিও যে তদনুসারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে, তাহা আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুল, তখন বড় কবির ও বড় কাব্যের অসম্ভাব কখন হইবে না, কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের বোধ করি আবির্ভাব আর হইবে না।



বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক-একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্মিত কৃত্রিম কারু-কার্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক-একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষণ-কলেবরের অন্ধদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত-সহস্র-বৎসর কাল অন্ধে রাখিয়া লালনপালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বন্ধোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরসপ্ৰবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিদ্ধ করিয়া ‘সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা’ পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে,—সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া বহুকোটি লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্ট ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রম-বিন্যস্ত স্তর-পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থি-কঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুন্দি হইতে উদ্ঘাটন করেন, সেইরূপ পুত্ৰতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তর-পরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

ভূতত্ত্ববিৎ তাহার মানসচক্ষু অতীতকালের পরপারে প্রসারিত করিয়া দেখিতে পান, বস্তুন্ধরার ইতিহাসে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন মহাকাল স্বয়ং আপনার ভীমবাহু প্রসারণ করিয়া উত্তম ধরাগর্ভে বিপুল শক্তিরশি কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই পুঞ্জীকৃত শক্তিসমষ্টি আপনাকে প্রসারিত করিয়া ভুবন্ধ বিদারণ করিয়া বহির্গত হইল। ভীষণ ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ মুহূর্মুহ আলোড়িত হইল। সাগর-বন্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া পুনরায় ভীতিভরে অপসরণ করিল। পূর্বসাগরের বেলাভূমি হইতে পশ্চিমসাগরের বেলাভূমি পর্য্যন্ত ভূগর্ভ বিদারণ করিয়া মহাকায় পাষণকলেবর হিমাচল গাত্রোথান করিল। তাহার তুহিনমণ্ডিত সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহ বোষ্টিত করিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু ঘোররাবে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ধুমবর্ণ কাদম্বিনীর বন্ধোদেশে সৌদামিনী সফুরিত হইতে লাগিল। শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল; দ্রোণদেশে অধিত্যকায় উষিত হইল ও অধিত্যকা দ্রোণদেশে নামিয়া গেল; অরণ্যানী





অনিয়া উঠিল, জীবকুল নীরব হইল, মহাকালের তাণ্ডবনর্তনের সহকারে অটহাস্যে দিগন্ত নিনাদিত হইতে লাগিল।\*

কেন এমন হয় জানি না, কিন্তু নিসর্গের ইতিবৃত্তে যেমন মহাকাল মাঝে মাঝে এইরূপ তাণ্ডবনর্তনের উন্মত্ত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন, মানবসমাজের ইতিবৃত্তেও সেইরূপ সময়ে সময়ে তাঁহার অটহাস্যের নির্ধোরধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের ঘটনা প্রাচীন ভারতসমাজের একদেশে সংঘটিত হইলেও, ইহাকে আমরা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের একটা মহাবিপ্লবের চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মনুষ্যহৃদয়ের ঈর্ষ্যা, ঘেম, জিগীষা ও জিয়াংসা প্রভৃতি উৎকট দুর্দমন প্রবৃত্তিসমূহ কালে কালে কেন্দ্রাকৃষ্ট ও পুঞ্জীকৃত, ঘনীভূত ও স্তূপীকৃত হইয়া যখন আপনার শক্তিতে আপনি বাহির হইতে চাহে, তখন উহা লেনিহান অগ্নিজিহ্বা ব্যাদান করিয়া সমাজমধ্যে আপনার জ্যোতির্গম্যী জ্বালা প্রসারণ করে; ভক্তিশূদ্ধা, প্রীতিপ্রেমের উৎস পর্য্যন্ত সেই ভীষণ উত্তাপে শুকাইয়া যায়; সমগ্র সমাজের পৃষ্ঠদেশ বিপ্লবের ভূমিকম্পে মুহূর্ত্ত আন্দোলিত হইয়া উঠে। অন্তর্নিহিত শক্তিরূপী সমাজের কলেবরকে বিদীর্ণ করিয়া, সহস্র খণ্ডে চূর্ণ করিয়া, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে; লক্ষ বৎসরের সঞ্চিত সৌন্দর্য্যরাশি ও রূপরাশি সেই তরল অনলপ্রবাহে ভস্মীভূত হইয়া যায়। মহাভারতের বর্ণিত ঘটনার মধ্যে আমরা মহাকালের অটহাস্যের প্রতিধ্বনি দূর হইতে শুনিতে পাইয়া শুক্ক হই ও মুহ্যমান হই। এ সেই মানবসমাজের চিরন্তন বিপ্লবের ইতিহাস—যাহা যুগযুগান্তরে দুরিয়া-ফিরিয়া প্রত্যাবর্তন করে; যাহা সাগরগর্ভকে মালক্বেত্রে উত্তোলিত করিয়া মালক্বেত্রে সাগরগর্ভে নিমগ্ন করে; যাহা পর্ব্বতচূড়ার সহিত পর্ব্বতচূড়ার সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া পুলকিত হইয়া উঠে। সেই অগ্নিশিখায় অরণ্যানী মরুভূমিতে পরিণত হয়, জীবকুল ধরাপৃষ্ঠে অস্থি-কঙ্কাল রাখিয়া কালের কুক্ষিতে অস্তিত্ব হারায়। ইহা সেই সনাতন অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, যাহা দলিত, পীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়া ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনের জন্য মহেশ্বরের মহেশ্বরের অবতারণা আবশ্যক হয়—ভীত, বিগ্নিত মানবচিত্ত যখন সেই ঐশ্বর্য্যের মহিমায় মোহ-প্রাপ্ত হইয়া তাহার চরণোপান্তে আপনাকে নুষ্ঠিত করে।

মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসে বাস্তবিকই কোনদিন এইরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল কি না, তাহা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনুসন্ধান করিবেন। হয় ত কোন ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানব-সমাজের মহাবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের মহাসমরের—চিত্র ভবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ভূগর্ভে সঞ্চিত যে শক্তির বলে হিমাচল ভূগর্ভ তিনু করিয়া

\* তৃত্ত্ববিদের মধ্যে যাহারা লাব্যালের শিখা, তাঁহাদের হিমালয়োৎপত্তির এই কাল্পনিক বর্ণনায় শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। প্রাদেশিক catastrophe লাব্যালের মতের বিরোধী নহে।



গাত্রোখান করিয়াছিল, সে শক্তি এখন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উপশান্ত হইয়াছে ; এখন হিমাচলের সানুদেশ নিবিড় বনস্থলীতে শ্যামায়মান হইয়াছে ; তাহার আশ্রিত বক্ষে এখন নিবিড় জলদমালা বারিবর্ষণ করিয়া সেই শ্যামভূমির হরিৎকান্তি অব্যাহত রাখিয়াছে ; আর সেই জলদমালার বহু উর্দ্ধে ধবলগিরি ও গৌরীশঙ্করের শুভ্রোজ্জ্বল দেহ দূর হইতে দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে ।

যে সামাজিক বিপুলে, যে অধর্মের অভ্যুত্থানে প্রাচীন ভারতসমাজে অশান্তির ঝটিকা বহিয়াছিল, ধর্মের প্রতিষ্ঠার পর সেই ব্যাপারের স্মৃতি পর্যন্ত প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; ঝটিকা শান্ত হইয়াছে ; মহাসিদ্ধুর কল্লোল শুক্ক হইয়াছে, বনানীর দাবাগ্নি-গর্জন নীরব হইয়াছে ; এখন সেই মহাভারত হইতে সহস্র সাহিত্যধারা প্রবাহিত হইয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় জীবনে শাখাপল্লবের ও পত্রপুষ্পের উদ্গম করিয়া তাহাকে বিকশিত ও প্রফুল্ল রাখিয়াছে ; আর আমরা দূর হইতে ভীমার্জুন, কর্ণ-দুর্যোধন, ভীষ্ম-দ্রোণ, অশ্বত্থামা-কৃতবর্মা দৃঢ়গঠিত, উন্নতশীর্ষ, জ্যোতির্দীপ্ত কলেবরকে ধবলমুকুটধারী কিরণোজ্জ্বল ধবলগিরির ন্যায় ভারত-সমাজক্ষেত্রের দূরস্থিত দিগুলায়ে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছি ।

এই হিমালয়যাচিত উপমাটা এতক্ষণ অনুগ্রহপরায়ণ পাঠকবর্গের নিতান্তই কর্ণ-শূল হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সম্পর্কে আর একটা কথা না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না । মহাভারতকে আদর্শ মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া এবং হিমগিরির সহিত তাহার তুলনা করিতে গিয়া লেখক মহাকাব্যের একটা লক্ষণ নির্ধারণ করিয়া ফেলিয়াছেন । বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কার জগতের যাবতীয় অনাকারশাস্ত্রের রোমহর্ষ উৎপাদন করিবে ! তাহা জানিয়াও সেই আবিষ্কারটি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার দুঃসাহস আশ্রয় করিলান ; আশা করি, তাঁহাদের শুভ্রোজ্জ্বল দর্শনচছটা লেখককে বণারস্ত্রেই পৃষ্ঠপুর্দর্শনে বাধ্য করিবে না ।

লেখকের মতে যে কাব্য পড়িতে হয় না, তাহারই নাম মহাকাব্য । না পড়িয়াই আমরা মহাকাব্যের কাব্যরসাস্বাদনে অনেকটা অধিকারী হইতে পারি । রামায়ণের চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকের ও মহাভারতের লক্ষশ্লোকের অধিকাংশই অপঠিত রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে বোধ করি পাঠকসমাজের অধিকাংশই লজ্জিত হইবেন না । তথাপি এই পাঠকসমাজ উভয় মহাকাব্যের কাব্যরসের আস্বাদন জানেন না, ইহা স্বীকার করিতে তাঁহারা কখনই সক্ষম হইবেন না । রামচরিত্র ও কৃষ্ণচরিত্র, লক্ষণ-চরিত্র ও কর্ণচরিত্র, দশাননচরিত্র ও দুর্যোধনচরিত্র, ভীমচরিত্র ও ভীষ্মচরিত্র, মহাকাব্যের গহনবন ভেদ করিয়া এই সকল মহামানব-চরিত্রের স্পর্শলাভ আমাদের অধিকাংশের তাগোই ঘটে নাই । আমরা দূর হইতে উহা নিরীক্ষণ করিয়াছি মাত্র ; তথাপি দূর হইতেই তাহার মাহাত্ম্যে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি । জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে আর্য্যসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মাতৃস্তন্য পান করিয়া বদ্ধিত হইয়াছে, অথচ রামচরিত্র ও গীতাচরিত্রের পুণ্যধারা সেই



মাতৃভক্ত্যের পুর্বাধার মত তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয় নাই, স্নানুতন্ত্রীতে তাড়িতস্রোতের সঞ্চালন করে নাই, তাহার অস্থিতে, তাহার মজ্জায়, তাহার পেশীতে বল বিধান করে নাই, সেই হতভোগ্যের—সেই পিণ্ডীভূতজড়ের— ভারতসমাজে স্থান কোথায়? পঞ্চবিংশতি-কোটি হিন্দুসন্তানের অধিকাংশ, অন্য কারণ না থাকিলেও, শুদ্ধ ভাষাজ্ঞানের অভাবে, সেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর মূল প্রস্রবণে গিয়া তৃষ্ণানিবারণে অশক্তি আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু লক্ষ্যণের মত ভাই, হনুমানের মত দাস, ভীষ্মের ন্যায় পিতামহ ও কর্ণের ন্যায় বৈরীর জাগ্রত-জীবন্ত পুতিমুক্তি কয়জনের মানসচক্ষুর সন্মুখে দণ্ডায়মান নাই? আমাদের বঙ্গদেশেরই অসংখ্য নরনারী মাতৃমুখে লঙ্কাদহনের ও লক্ষ্যণভোজনের কথা শুনিয়াছে; কথকের মুখে, গায়কের মুখে মহারার লাক্ষ্মী ও অঙ্গদ-রাবণ-সংবাদের অতিরঞ্জনে আমোদিত হইয়াছে; যাত্রায়, গানে ভরতমিলন ও সীতানিব্বাসন অভিনীত হইতে দেখিয়া অশ্রুবিগর্জন করিয়াছে; কৃত্তিবাসী রামায়ণ-হস্তে অবকাশরঞ্জন করিয়াছে; এবং শেষের সেদিন রামনাম শুনিতে শুনিতে জগৎসংসারের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু সেই আদিকবির অমৃতলেখনীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আপনি জ্ঞানী, আপনি পণ্ডিত, আপনি কলাবিৎ, আপনি সমালোচক, আপনি সমজ্জদার, আপনি সন্তরণ দিয়া সংস্কৃতসাহিত্য-সমুদ্রের পার দেখিয়াছেন, আপনার সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আদ্যন্ত কঠিন রহিয়াছে, আপনার যদি বিশ্বাস থাকে যে, ঐ পল্লীবাগিনী মুখ বৃদ্ধার অপেক্ষা আপনি নিঃসংশয়ে রামরসায়নে অধিকতর রসগ্রাহী হইয়াছেন, তাহা হইলে আপনাকে হস্ত বলিয়া নির্দেশ করিব।

বস্তুতই আমার বিশ্বাস, মহাকাব্যের লক্ষণ এই যে, উহার আগাগোড়া অক্ষরে-অক্ষরে পড়িবার প্রয়োজন নাই। মূল হোমার পৃথিবীতে কয়জন লোক পড়িয়াছে? পণ্ডিতসমাজের মধ্যে কয়জন লোক হোমারের তর্জমা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন? অধিকাংশের পক্ষে কেবল হোমারের গল্প শুনা আছে মাত্র। অথচ ট্রয়-নগরের প্রাকার-সম্মুখে সমুদ্রবেলা পূর্ণ করিয়া আমরা আগামেমন-পরিচালিত গ্রীক্ অক্সোহিণার সন্নিবেশ বর্তমান মুহূর্ত্তে চক্ষের সন্মুখে স্পষ্ট তুলিকায় চিত্রিত দেখিতেছি। সেই বিস্তীর্ণ স্তম্ভ সেনাকুলিত রণাঙ্গনের উপর দিয়া একিলীস্, অজাক্স ও দায়োমীদেব বিশালবাক্য পরিণক্কক্কর শালপ্রাণ্ড জীবন্ত মূর্ত্তি বিচরণ করিতেছে; বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইতেছে, কিন্তু ট্রয়-নগরের দুর্ভেদ্য প্রাকার ভগ্ন হইল না; গ্রীক্ বীরগণের শিবিরमध्ये মানবহৃদয়ের সনাতন ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ ধূমায়মান হইতে লাগিল। সেই ধূম হইতে অগ্নি জলিয়া উঠিল, গ্রীক্ বীরগণ কণেকের জন্য উদ্দেশ্য-হস্ত ও লক্ষ্য-দৃষ্ট হইয়া পরস্পর আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইলেন; তার পর-অন্ধের যবনিকা তুলিবামাত্র অক্সোহিণীর চিত্তাধূম প্রশমিত হইতে না হইতে একিলীসের রোমাণ্ডি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; রোমাণ্ডিদীপ্ত রক্তমূর্ত্তি ছুঁকার করিয়া গর্জন করিল; পরক্ষণেই দেখিতে পাই, মহাবীর হেক্টরের শব্দেই সেই ভীমকর্ণার রথচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া



কৃষিরধারায় বর্ণক্ষেত্র শোণিতাক্ত করিতেছে ও নর্ত্ত্য নরগণের ও আকাশে দেবগণের মুগ্ধনেত্র বিস্ফারিত হইয়া সেই ক্রুর কর্ণের পুতি নীরবে নিকশিত রহিয়াছে।

পাঠকবর্গ যদি এতক্ষণ বুঝিয়া থাকেন, কৃষ্টিবাস পড়িলেই বাণ্যীকি পড়ার কাজ হইবে, এবং যে সকল পাঁচালী-পয়ার শুনিয়া কাশীদাস ভারতকথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই পাঁচালী পড়িলেই আর দ্বৈপায়ন-ধর্মির শরণ লইতে হইবে না, তাহা হইলে লেখকের নিতান্ত দুর্ভাগ্য। বদরিকাশ্রমযাত্রী যাহারা হিমালয়ের চড়াই-উত্থাই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, কৈলাসযাত্রী যিনি ঘোলহাজার ফুট উপরে উঠিয়া 'নীতি-পাস্' অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এমন কি দার্জিলিঙে কিংবা সিমলা-শৈলের আলোকমণ্ডিত রাজপথে যাহারা বিহার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা হিমালয়ের যে সৌন্দর্য দেখিয়াছেন, হিমালয়ের পাদদেশের সমতলবাসীর পক্ষে তাহা ইন্দ্রিয়মনের অগোচর, সন্দেহ নাই। কিন্তু আশঙ্কা হয়, হিমালয়ের এক এক দেশে, এক এক অঙ্গে, তাহার কিনুরীসেবিত গুহামধ্যে, তাহার সরলদ্রুমাচ্ছন্ন সানুদেশে, তাহার গৈরিকখচিত উপত্যকায়, তাহার মারুতপূর্ণ রক্ত আপাদিতবেণুকৃত্য কীচকবনে, তাহার হিমশীকরবাহি-পবন-সেবিত গিরিনির্ব্বারপ্রান্তে চিত্তবিভ্রমকর অতুল্য শোভা আছে সত্য; কিন্তু সেই একদেশব্যাপী শোভা, সেই প্রাদেশিক মুক্তি, সমগ্র হিমাচলের পুতি নিরীক্ষণের বড় অবকাশ দেয় না। হিমাচলের বিরাট মুক্তির শোভা হৃদগত করিতে হইলে যেন দূরে থাকিয়া তাহার তুঙ্গ শিখররাজির দিকে অবলোকন আবশ্যক। সেইরূপ রামায়ণ-মহাভারতের বিশাল মহাকাব্যের মধ্যে অসংখ্য ঋণকাব্য নিবিষ্ট রহিয়াছে; অনেক বনজঙ্গল ভেদ করিয়া, অনেক পুস্তরকঙ্কর অতিক্রম করিয়া, অনেক চড়াই-উত্থাই পার হইয়া, ক্রান্তশরীরে সেই সকল ঋণকাব্যের সৌন্দর্য্য-দর্শনে অধিকারী হইতে পারিলে, দর্শকের মন আনন্দরসে অভিপ্লুত হয়, সন্দেহ নাই; সেই সকল ঋণকাব্যের উপমাও অন্যত্র দুর্লভ, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমগ্র মহাকাব্যের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির বিষয়ে সেই ঋণকাব্যের আলোচনা বিশেষ সাহায্য করে না। সমগ্র মহাকাব্যের মহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে, যেন মহাকাব্য হইতে কতকটা দূরে থাকাই সম্ভব। সেই সকল ঋণকাব্যের ঋণ সৌন্দর্য্যকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া মহাকাব্যের বিশালায়তনের পুতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করাই সম্ভব।

আমাদের মধ্যে অনেকেই মূল মহাকাব্য পড়েন নাই, কিন্তু সকলেই দূর হইতে সেই মহাকাব্য দেখিয়াছেন; ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-অশ্বখামার উন্নত চরিত্র হিমগিরির উন্নত শৃঙ্গের ন্যায় দূর হইতে সকলেরই নেত্রগত হইয়াছে। তথাপি আমরা মহাকাব্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি। ইউরোপীয় সমালোচকদের অবস্থা অন্যরূপ। রামায়ণ-মহাভারতের ইউরোপীয়গণের লিখিত সমালোচনা পড়িয়া আমরা বিগত নিরাশ হইতে হয়। তাঁহারা আমাদের মত দূর হইতে নয়ন ভুরিয়া মহাকাব্যের কাব্য-সৌন্দর্য্য দেখিতে পান নাই; নিকটে গিয়াও সমগ্র মহাকাব্য অধ্যয়নের অবকাশ তাঁহাদের পক্ষে ঘটে না। বিশেষত পর্ব্বতে উঠিবার সময়ে তাহার বনজঙ্গল, তাহার পুস্তরকঙ্কর,



তাহাদিগকে ক্রান্ত ও অবসন্ন করিয়া দেয় ; তাহাদের বৈর্য ও অধাবসায় পরাস্ত হইয়া যায় । তবে যিনি সৌভাগ্যক্রমে কোন একটা প্রদেশের, কোন একটা অঙ্গের, শোভা-দর্শনে সফল হন, তিনি সেই শোভা বর্ণনা করিয়াই আপনার কাজ শেষ হইল, মনে করেন । মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলার উপাখ্যান, নলোপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণকাব্য সৌন্দর্য্য-গৌরবে গরিষ্ঠ, সন্দেহ নাই ; ইউরোপীয় সমালোচকেরা ঐ সকল উপাখ্যানের প্রশংসা করেন । কিন্তু আমরা জানি, ঐ সকল ঋণকাব্যের যতই সৌন্দর্য্য থাক, মহাকাব্যের বিশাল সৌন্দর্য্যের নিকট তাহা স্থান পায় না । কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকের লেখনী এই সকল ঋণকাব্যের সমালোচনায় যেমন উদার হইয়া পড়ে, মূল মহাকাব্যের প্রশংসায় তেমন উদারভাব দেখাইতে পারে না ।

যাহা পড়িতে হয় না, তাহাই মহাকাব্য ; মহাকাব্যের এই লক্ষণ-নির্দেশের অর্থ বোধ করি এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে । মহাকাব্য না পড়িলে চলিতেও পারে ; কিন্তু যাহা মহাকাব্য নহে, তাহা না পড়িলে একেবারেই চলে না । কালিদাস খুব বড় কবি, হয় ত ব্যাস-বাল্মীকি হইতেও বড় কবি ; কিন্তু তিনি মহাকাব্য লেখেন নাই । কুমারসম্ভব বুঝিতে হইলে তাহার গল্প শুনিতে চলিবে না, তাহার অনুবাদ পড়িলে চলিবে না ; তাহা হইলে মূল কুমারসম্ভব তনুতনু করিয়া স্কুলের ছাত্রের মত টীকাটিপ্পনীসহ পড়িতে হইবে । নহিলে কুমারসম্ভব পড়াই হইবে না । কালিদাসের ভাষা, কালিদাসের ছন্দ, কালিদাসের ধ্বনি, কালিদাসের নিকটে না গেলে শুনিতে পাইবে না ; দূর হইতে তাহার কিছুই বুঝিবে না । কালিদাস শিল্পী ; তিনি পাতরের উপর পাতর বসাইয়া সৌধনির্মাণ করিয়াছেন, শাদা ধপ্পপে মার্বেলের ইটের উপর ইট বসাইয়া দেয়াল তুলিয়াছেন, সেই দেয়ালের গায়ে মণিমাণিক্য-রত্ন-প্রবালের লতাপাতা কাটিয়া তাহাকে বিচিত্র শোভায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন । তিনি তাজমহল গাথিয়াছেন, আলহাম্ব্রা গাঁথিয়াছেন ; সেই সকল কাকশিল্পের শোভা দেখিতে হইলে নিকটে যাইতে হইবে ; সকলেও সে শোভা দেখিবে না ; সমজ্ঞানের চোখ লইয়া ও সমালোচকের রুচি লইয়া সেখানে যাইতে হইবে । নতুবা দেখিতে পাইবে না ও বুঝিতে পারিবে না ।

শেক্সপীয়র হয় ত আরও বড় কবি, তাহার স্থান হয় ত হোমারেরও অনেক উচেচ, কিন্তু তিনিও মহাকাব্য লেখেন নাই । গ্রীক কবির হেলেনকে আমরা চোখে দেখি নাই, তাহার গল্প শুনিয়াছি মাত্র ; কিন্তু যে রূপের আওনে ট্রয়-নগর ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা আমাদের কল্পনার নেত্রকেও অদ্যাপি ঝলসিয়া দিতেছে । কিন্তু শেক্সপীয়রের নাট্যকাগণের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে কেবল গল্প শুনিতে বা অনুবাদ পড়িলে চলিবে না । তাহাদিগকে নিকটে গিয়া স্বচক্ষে দেখিতে হইবে ; সমজ্ঞানের চোখ লইয়া দেখিতে হইবে । শেক্সপীয়রের ভাষা, তাহার ছন্দ, তাহার ধ্বনি হইতে দূরে থাকিয়া শেক্সপীয়রকে চিনিবার আশা করা যায় না । এক-একবার মনে হয় বটে, শেক্সপীয়রের



এক-একখানা ঋণকাব্যের ভিতর হইতে যেন সাগর-কল্লোরের অথবা ভূগর্ভ-তরঙ্গের মত শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছে, যেন দাবদাহের গম্ভীর শব্দ দূর হইতে কাণে বাজিতেছে, কিন্তু নিকটে না গেলে সে শব্দের পুঙ্খ পরিচয় পাওয়া যায় না। শেক্সপীয়ার হয় ত একালের মহাকবি, কিন্তু তিনি মহাকাব্য রচনা করেন নাই।

কৃত্রিম পদার্থের সৌন্দর্য্যের সহিত স্বাভাবিক পদার্থের সৌন্দর্য্যের ঠিক তুলনা হয় না। কোন্ সৌন্দর্য্য বড়, তাহার তুল্যদণ্ডে পরিমাপ চলে না। মনুষ্য-পুতিভা সময়ে সময়ে যেন বিধাতার স্রষ্টাকেও পরাস্ত করে। সেইজন্য কৃত্রিমের পার্শ্বে স্বাভাবিককে দাঁড় করাইয়া কে ছোট কে বড় নির্দেশ করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। কৃত্রিমে যাহা আছে, তাহা স্বাভাবিকে থাকে না; আবার স্বাভাবিকে যাহা থাকে, তাহা কৃত্রিমে থাকে না। উভয় বস্তু ভিন্ন পর্যায়ে। মহাকাব্য চতুরাননের বদন হইতে বিনির্গত হয় নাই, উহা মনুষ্যেরই রচনা, সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাতে একটা স্বাভাবিক আছে, তাহা সেই মনুষ্যের রচিত অন্য উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টতর কাব্য নাই। তাহাতে বনজঙ্গল, প্রস্রবকঙ্কর থাকিলেও তাহার একটা গৌরব আছে, তাহাকে দূর হইতে দেখিলেই চেনা যায়; তাহার গর শুনিলে মন অভিভূত হয়; তাহাকে বুঝিতে হইলে সমজ্ঞদার হইতে হয় না, শিক্ষানবিশী করিতে হয় না; চণ্ডমা পরিতে হয় না, স্বভাবদত্ত চক্ষু লইয়াই তাহাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এই অলঙ্কারহীন, পরিচ্ছদহীন মুক্ত স্বাভাবিকতাই মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। মনুষ্যের সভ্যতা, অস্তিত বর্ত্তমানকালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম বস্তু। এই কৃত্রিমতার আমি নিন্দা করিতেছি না; হয় ত কৃত্রিমতাই মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ; হয় ত কৃত্রিমতা মনুষ্যত্ব হইতে অতিনি; অস্তিত মানবিকতার সহিত পাশবিকতার যাহা পার্থক্য, তাহারই নাম কৃত্রিমতা। স্বতরাং কৃত্রিমতার নিন্দা করিলে মনুষ্যের বিশিষ্ট ধর্ম্মকেই নিন্দা করা হয়। এইজন্য কৃত্রিমতার নিন্দা করিতে চাহি না। কৃত্রিমতাই মনুষ্যের গৌরব বলিলেও বিস্মিত হইব না। কৃত্রিমতাতেই মনুষ্যত্বের চরম স্ফুর্তি, তাহাও বলা যাইতে পারে। কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের স্রষ্টাতেই মানবপুতিভার পরাকাষ্ঠা, তাহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তথাপি কৃত্রিম শিল্প কৃত্রিম। উহাতে চাকচিক্য আছে, গাঁথনি আছে, ওস্তাদি আছে, ও সকলের উপরে উহার চেষ্টাকৃত নির্মাণকল্পনায়—উহার ডিজাইনে—মনুষ্যের স্রষ্টিকর্মেই আভাস আছে; আর যাহা স্বাভাবিক তাহাতে চাকচিক্য নাই, গাঁথনি নাই, তাহা অযত্নকৃত অযথাবিন্যস্ত ঋটিকাতণু বারিধারাবধিত বৃহৎ দ্রব্যের সমাবেশে গঠিত। মানুষের বর্ত্তমানকালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম। সেইজন্য মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ যে স্বাভাবিকতা, সেই স্বাভাবিকতার অভাবে বোধ হয় বর্ত্তমান সভ্যতার মহাকাব্যের উৎপত্তির পুতিরোধ করে। আধুনিক সভ্যতা কবিত্বস্রষ্টির অন্তরায় নহে, কিন্তু মহাকাব্যস্রষ্টির বোধ হয় অন্তরায়। এখন কর্ণযন্ত্রে ভ্রমণ মনুষ্যকে তাহার নিরবকাশ জীবনের কথঞ্চিৎ-লব্ধ অবসরের ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলিকে ঋণকাব্যের ও ঋণ-সৌন্দর্য্যের আলা ও বৈচিত্র্য দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়, বৃহৎ পদার্থে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া



তাহার বিশাল সৌন্দর্যের উপভোগের অবকাশ থাকে না। সেইজন্যই বোধ হয়, সভ্যসমাজে শেক্সপীয়ার জন্মিয়াছেন, কালিদাস জন্মিয়াছেন, কিন্তু হোমার জন্মেন নাই বা বাল্মীকি জন্মেন নাই। ইহাতে মনুষ্যজাতির ক্ষতি কি লাভ, তাহা গণনার অবসর লেখকের নাই। আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই আমরাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। সংসারের স্রোত উল্টাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও মহাকবির উৎপাদনে সমর্থ হইব না। তবে কাল নিরবধি ও পৃথ্বী বিপুল; আবার যদি কালের স্রোতে মহাকবির উৎপত্তি ঘটে, তাহাতেও আমরা বিস্মিত হইব না।

[ বঙ্গদর্শন ( নবপর্ধ্যায় ), ১৩০৯ ]

## সাহিত্য-সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘরে বসিয়া আনন্দে যখন হাসি এবং দুঃখে যখন কঁাদি, তখন এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, আরও একটু বেশি করিয়া হাসা দরকার বা কান্নাটা ওজনে কিছু কম পড়িয়াছে। কিন্তু পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ দেখানো আবশ্যিক হইয়া পড়ে, তখন মনের ভাবটা সত্য হইলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অনুযায়ী না হইতে পারে।

এমন কি, মা-ও যখন শব্দ বিলাপে পল্লীর নিদ্রা-তন্ত্রা দূর করিয়া দেয়, তখন সে যে শুদ্ধমাত্র পুত্রশোক প্রকাশ করে, তাহা নয়,—পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ করিতেও চায়। নিজের কাছে দুঃখ-সুখ প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না—পরের কাছে তাহা প্রমাণ করিতে হয়। সুতরাং শোক-প্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক, শোক-প্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে স্বর চড়াইয়া না দিলে চলে না।

ইহাকে কৃত্রিমতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে অন্যায় হইবে। শোক-প্রমাণ শোক-প্রকাশের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ। আমার ছেলের মূল্য যে কেবল আমারই কাছে বেশি, তাহার বিচ্ছেদ যে কতখানি মর্গাস্তিক ব্যাপার, তাহা পৃথিবীর আর কেহই যে বুঝিবে না, তাহার অভাব-সত্ত্বেও পৃথিবীর আর সকলেই যে অত্যন্ত স্বচ্ছ-চিত্তে আহার-নিদ্রা ও আপিস-যাতায়াতে প্রবৃত্ত থাকিবে,—শোকাতুর মাতাকে তাহার পুত্রের প্রতি জগতের এই অবজ্ঞা আঘাত করিতে থাকে। তখন সে নিজের শোকের প্রবলতার দ্বারা এই ক্ষতির প্রাচুর্যকে বিশুর কাছে ঘোষণা করিয়া তাহার পুত্রকে যেন গৌরবান্বিত করিতে চায়।



যে অংশে শোক নিজের, সে অংশে তাহার একটি স্বাভাবিক সংঘম থাকে ; যে অংশে তাহা পরের কাছে ঘোষণা, তাহা অনেক সময়েই সঙ্গতির সীমা লঙ্ঘন করে। পরের অগাধ চিন্তকে নিজের শোকের দ্বারা বিচলিত করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় তাহার চেষ্টা অস্বাভাবিক উদ্যম অবলম্বন করে।

কেবল শোক নহে, আমাদের অধিকাংশ হৃদয়-ভাবেই এই দুইটা দিক্ই আছে, —একটা নিজের জন্য, একটা পরের জন্য। আমার হৃদয়-ভাবে সাধারণের হৃদয়-ভাব করিতে পারিলে তাহার একটা সাধনা, একটা গৌরব আছে। আমি যাহাতে বিচলিত, তুমি তাহাতে উদাসীন,—ইহা আমাদের কাছে ভাল লাগে না ; কারণ, নানা লোকের কাছে প্রমাণিত না হইলে সত্যতার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমিই যদি আকাশকে হৃদয়ে দেখি, আর দশ জনে না দেখে, তবে তাহাতে আমার ব্যাধিই সপ্ৰমাণ হয়। সেটা আমারই দুর্বলতা।

আমার হৃদয়-বেদনায় পৃথিবীর যত বেশি লোক সমবেদনা অনুভব করিবে, ততই তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যাহা একান্তভাবে অনুভব করিতেছি, তাহা যে আমার দুর্বলতা, আমার ব্যাধি, আমার পাগলামি নহে, তাহা যে সত্য, তাহা সর্ব-সাধারণের হৃদয়ের মধ্যে প্রমাণিত করিয়া আমি বিশেষভাবে সাধনা ও স্মৃতি পাই।

যাহা নীল, তাহা দশ জনের কাছে নীল বলিয়া প্রচার করা কঠিন নহে, কিন্তু যাহা আমার কাছে স্মৃতি বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, তাহা দশ জনের কাছে স্মৃতি বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া প্রতীত করা দুর্লভ। সে অবস্থায় নিজের ভাবকে কেবলমাত্র প্রকাশ করিয়াই খালাস পাওয়া যায় না ; নিজের ভাবকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে পরের কাছেও তাহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে।

সুতরাং এইখানেই বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা। দূর হইতে যে জিনিষটা দেখাইতে হয়, তাহা কতকটা বড় করিয়াই দেখানো আবশ্যিক। সেটুকু বড়, সত্যের অনুরোধেই করিতে হয় ; নহিলে জিনিষটা যে পরিমাণে ছোট দেখায়, সেই পরিমাণেই মিথ্যা দেখায়। বড় করিয়াই তাহাকে সত্য করিতে হয়।

আমার স্মৃতি-দুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই বলিতে হয়।

সত্যরূপপূর্বক এই বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক, তেমনি লিপিবদ্ধ করি সাহিত্য নহে ; কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।

প্রাকৃত-সত্য এবং সাহিত্য-সত্য এইখানেই তফাৎ আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে, প্রাকৃত-মা তেমন করিয়া কাঁদে না। তাই বলিয়া সাহিত্যের



মার কান্না মিথ্যা নহে। প্রথমত, প্রাকৃত-রোদন এমন প্রত্যক্ষ যে, তাহার বেদনা আকারে, ইঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে, চারিদিকের দৃশ্যে এবং শোক-ঘটনার নিশ্চয় প্রমাণে আমাদের প্রতীতি ও সমবেদনা উদ্রেক করিয়া দিতে বিলম্ব করে না। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত-মা আপনার শোক সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারে না, সে ক্ষমতা তাহার নাই, সে অবস্থাও তাহার নয়।

এই জন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথার্থ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এ স্থলে একটি অপরটির আরশি হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না।

এই প্রত্যক্ষতার অভাববশত সাহিত্যে ছন্দোবদ্ধ-ভাষাভঙ্গীর নানাপ্রকার কল-বল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।

এখানে 'অধিকতর সত্য' এই কথাটা ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে। মানুষের ভাব-সম্বন্ধে প্রাকৃত-সত্য জড়িত-মিশ্রিত, ভগ্নখণ্ড, ক্ষণস্থায়ী। সংসারের চেউ ক্রমাগতই ওঠা-পড়া করিতেছে—দেখিতে দেখিতে একটার ঘাড়ে আর একটা আসিয়া পড়িতেছে, তাহার মধ্যে প্রধান-অপ্রধানের বিচার নাই—তুচ্ছ ও অসামান্য গায়ে-গায়ে ঠেলাঠেলি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির এই বিরাট রঙ্গ-শালায় যখন মানুষের ভাবাভিনয় আমরা দেখি, তখন আমরা স্বভাবতই অনেক বাদ-গাদ দিয়া বাছিয়া লইয়া, আন্দাজের দ্বারা অনেকটা ভিত্তি করিয়া, কল্পনার দ্বারা অনেকটা গড়িয়া তুলিয়া থাকি। আমাদের একজন পরমাত্মীয়ও তাঁহার সমস্তটা লইয়া আমাদের কাছে পরিচিত নহেন। আমাদের স্মৃতি নিপুণ সাহিত্য-রচয়িতার মত তাঁহার অধিকাংশই বাদ দিয়া ফেলে। তাঁহার ছোট-বড় সমস্ত অংশই যদি ঠিক সমান অপক্ষ-পাতের সহিত আমাদের স্মৃতি অধিকার করিয়া থাকে, তবে এই স্থূপের মধ্যে আসল চেহারাটি মারা পড়ে ও সবটা রক্ষা করিতে গেলে আমাদের পরমাত্মীয়কে আমরা যথার্থভাবে দেখিতে পাই না। পরিচয়ের অর্থই এই যে, যাহা বর্জন করিবার তাহা বর্জন করিয়া যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করা।

একটু বাড়াইতেও হয়। আমাদের পরমাত্মীয়কেও আমরা মোটের উপরে অল্পই দেখিয়া থাকি। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ আমাদের অগোচর। আমরা তাঁহার ছায়া নহি, আমরা তাঁহার অন্তর্দামীও নহি। তাঁহার যে অনেকখানিই আমরা দেখিতে পাই না, সেই শূন্যতার উপরে আমাদের কল্পনা কাজ করে। ফাঁকগুলি পূরাইয়া লইয়া আমরা মনের মধ্যে একটা পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তুলি। যে লোকের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা খেলে না, যাহার ফাঁক আমাদের কাছে ফাঁক থাকিয়া যায়, যাহার প্রত্যক্ষগোচর অংশই আমাদের কাছে বর্তমান, অপ্রত্যক্ষ অংশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট—অগোচর, তাহাকে আমরা জানি না, অল্পই জানি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এইরূপ আমাদের



কাছে ছায়া, আমাদের কাছে অসত্যপ্রায়। তাহাদের অনেককেই আমরা উকিল বলিয়া জানি, ডাক্তার বলিয়া জানি, দোকানদার বলিয়া জানি—মানুষ বলিয়া জানি না; অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যে বহির্বিষয়ে তাহাদের সংগ্রহ, সেইটাকেই সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া জানি—তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা বড় যাহা আছে, তাহা আমাদের কাছে কোন আনন্দ পায় না।

সাহিত্য যাহা আমাদের কাছে জানাইতে চায়, তাহা সম্পূর্ণভাবে জানায়; অর্থাৎ স্বায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবাস্তবকে বাদ দিয়া, ছোটকে ছোট করিয়া, বড়কে বড় করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আলংকারকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়। প্রকৃতির অপকৃতি প্রাচুর্যের মধ্যে মন যাহা করিতে চায়, সাহিত্য তাহাই করিতে থাকে। মন প্রকৃতির আরশি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিষকে মানসিক করিয়া লয়—সাহিত্য সেই মানসিক জিনিষকে সাহিত্যিক করিয়া তোলে।

দু'য়ের কার্যাপ্রণালী প্রায় একই রকম। কেবল দু'য়ের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ কারণে তফাৎ ঘটিয়াছে। মন যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা নিজের আবশ্যকের জন্য—সাহিত্য যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা সকলের আনন্দের জন্য। নিজের জন্য একটা মোটামুটি নোট করিয়া রাখিলেও চলে—সকলের জন্য আগাগোড়া স্বসম্বন্ধ করিয়া তুলিতে হয়; এবং তাহাকে এমন জায়গায়, এমন আলোকে, এমন করিয়া ধরিতে হয়, যাহাতে সম্পূর্ণভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে—সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সংগ্রহ করে। মনের জিনিষকে বাহিরে ফলাইয়া তুলিতে গেলে বিশেষভাবে সজ্ঞানশক্তির আবশ্যক হয়। এইরূপে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে, তাহা অনুকরণ হইতে বহুদূরবর্তী।

প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে, আমাদের সুখ-দুঃখকে, শুদ্ধ বর্তমান কাল নহে,—চিরন্তন কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। সুতরাং সেই সুবিশাল প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রের সহিত তাহার পরিমাপ-সামঞ্জস্য করিতে হয়। ক্ষণকালের মধ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যখন চিরকালের জন্য গড়িয়া তোলা যায়, তখন ক্ষণকালের মাপকাঠি নইয়া কাজ চলে না। এই কারণে প্রচলিত কালের সহিত, সঙ্কীর্ণ সংসারের সহিত উচ্চসাহিত্যের পরিমাপের প্রভেদ থাকিয়া যায়।

অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার, নিজের জিনিষকে বিশৃঙ্খলার এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশৃঙ্খল-মন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে মন আপনার জিনিষ সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশৃঙ্খল-মন পুনশ্চ নিজের জিনিষ নির্বাচন করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।



বুঝিতেছি, কথাটা বেশ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে ; আর একটু পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। কৃতকার্য হইব কি না, জানি না।

আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি,— একটা অংশ আমার নিজস্ব, আর একটা অংশ আমার মানবস্ব। আমার ঘরটা যদি সচেতন হইত, তবে সে নিজের ভিতরকার ঝগাকাশ ও তাহারই মহিত পরিব্যাপ্ত মহাকাশ, এই দুইটাকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিত। আমাদের ভিতরকার নিজস্ব ও মানবস্ব সেই পুকার। যদি দু'য়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়াল তোলা থাকে, তবে আত্মা অন্ধকূপের মধ্যে বাস করে।

পুঙ্খ সাহিত্যকারের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজস্ব ও মানবস্বের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে, তবে তাহা করনার কাচের সারশির স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনাপরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না। এমন কি, এই কাচ দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণের কাচের কাজ করিয়া থাকে—ইহা অদৃশ্যকে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে।

সাহিত্যকারের সেই মানবস্বই সৃজনকর্ত্তা। লেখকের নিজস্বকে সে আপনার করিয়া লয়, ফণিককে সে অমর করিয়া তোলে, ঝগকে সে সম্পূর্ণ তা দান করে।

জনতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশু-মনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি, মনোরাজ্যের কথা আসিয়া পড়িলে সত্যতা বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কালোকে কালো প্রমাণ করা সহজ, কারণ অধিকাংশের কাছেই তাহা নিশ্চয় কালো ; কিন্তু ভালকে ভাল প্রমাণ করা তেমন সহজ নহে, কারণ এখানে অধিকাংশের একমত সাক্ষ্য সংগ্রহ করা কঠিন।

এখানে অনেকগুলি মুকিলের কথা আসিয়া পড়ে। অধিকাংশের কাছেই যাহা ভাল, তাহাই কি সত্য ভাল,—না, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে যাহা ভাল, তাহাই সত্য ভাল ?

যদি বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে প্রাকৃতবস্তুগত্রে এ কথা নিশ্চয় বলিতে হয় যে, অধিকাংশের কাছে যাহা কালো, তাহাই সত্য কালো। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, এ সম্বন্ধে মতভেদের সম্ভাবনা এত অল্প যে, অধিক সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু ভাল যে ভালই এবং কত ভাল, তাহা লইয়া মতের এত অটনৈক্য ঘটিয়া থাকে যে, সে সম্বন্ধে বিরূপ সাক্ষ্য লওয়া উচিত, তাহা স্থির করা কঠিন।

বিশেষ কঠিন এই জন্য, সাহিত্যকারদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্ত্তমান কালের জন্য নহে। চিরকালের মনুষ্যসমাজই তাঁহাদের লক্ষ্য। যাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিখিত, তাহার অধিকাংশ সাক্ষী ও বিচারক বর্ত্তমান কাল হইতে কেমন করিয়া মিলিবে ?



ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক তাহাই অধিকাংশ লোকের কাছে সর্বপ্রধান আসন অধিকার করে। কোন একটি বিশেষ সময়ের সাহিত্য-সংখ্যা গণনা করিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে অবিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এই জন্য বর্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্যনিবেশ করিতে হয়।

কালে-কালে মানুষের বিচিত্র শিক্ষা, ভাব ও অবস্থার পরিবর্তন-সত্ত্বেও যে সকল রচনা আপন মহিমা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহাদেরই অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গেছে। মন আশাদের সহজগোচর নয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে অবিশ্রাম গতির মধ্যে তাহার নিত্যানিত্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। এই জন্য সুবিপুল কালের পরিদর্শনশালার মধ্যেই মানুষের মানসিক বস্তুর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। ইহা ছাড়া নিশ্চয় অবধারণের চূড়ান্ত উপায় নাই।

কিন্তু কাজ চলিবার মত উপায় না থাকিলে সাহিত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইত। হাইকোর্টের আপিল-আদালতে যে জজ-আদালতের সমস্ত বিচারই পর্যাপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। সাহিত্যেও সেইরূপ জজ-আদালতের কাজ বন্ধ থাকিতে পারে না। আপিলের শেষ-নীমাংসা অতিদীর্ঘকাল-সাপেক্ষ—ততক্ষণ মোটামুটি বিচার এক রকম পাওয়া যায় এবং অবিচার পাইলেও উপায় নাই।

যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক-একজনের পুতিভা সর্বকালের পুতিনিবদ্ধ গ্রহণ করে,—সর্বকালের আসন অধিকার করে, তেমনি সমালোচনার পুতিভাও আছে। এক-একজনের পরধ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা কণিক, যাহা সঙ্কীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়-লাভ করিয়া নিত্যস্থের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতগারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন—স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আবার ব্যবসাদার সমালোচকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত-পুঁথাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জনগর্জন, ঘৃণ ও ঘৃষির কারবার করিয়া থাকে—অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়িছুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বীণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরলবেশে দীনের মত মার কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাধাণ করেন। তাহারা কখন-কখন তাঁহার গুহ অঞ্চলে কিছু-কিছু ধুলিফেপও করে—তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এই সমস্ত ধূলা-মাটি-সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন—দেউড়ির দরওয়ানওলা তাহাদিগকে চিনিবে কোন্ লক্ষণ দেখিয়া? তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই।





সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে, তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান—তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোধেন।

[বঙ্গদর্শন (নবপরিচয়), ১৩১০]

## কথা-সাহিত্য

দীনেশচন্দ্র সেন

এ দেশের লোকেরা সাধারণতঃ আপনাদের ভোগবিলাসে কুণ্ঠিত ছিলেন। নিজেরা খড়ো ঘরে থাকিয়া দেবমন্দির পাকা করিয়া গাঁথিতেন। তাঁহাদের যাহা কিছু উৎসব, তাহা ঠাকুর দেবতা লইয়া। দ্বিজ জনার্দন, কাণা হরিদত্ত পুভূতি করেক জন প্রধান কবি অতি ছোট-খাট বৃত্তকথার রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডী, মনসা পুভূতি দেবতা-দিগের পূজা দেখিতে বড় লোক সমবেত হইত। গৃহস্থ তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। এই উপলক্ষে বৃত্ত-কথা 'গানে' ও 'গান' 'কাব্যে' পরিণত হইল। মল্লী, শীতলা, ত্রিনাথ, সত্যনারায়ণ, শনি, মাণিকপীঠ, সত্যপীঠ পুভূতি হিন্দু ও অহিন্দু সমস্ত দেবতারই ছোট-খাটো বৃত্তকথা আছে। এই সকল বৃত্তকথার সকলগুলিই উত্তরকালে বিকাশ পায় নাই; অনেকগুলি কোরক-অবস্থাতেই লয় পাইয়াছে। বড় বড় দেবতার বৃত্ত-কথা শুনিতে আসর জমিয়া যাইত। সেগুলি ক্রমশঃ কবিগণের তুলিকায় স্তরশ্রিত ও সূচিচিত্রিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। হিন্দুর প্রতিভা চিরকালই পূজামণ্ডপে বিকশিত হইয়াছে। যজ্ঞবেদীর আয়তন নির্ণয় করিতে রেখা-গণিতের সৃষ্টি হইয়াছে; যজ্ঞের কালগুহ্ম-বিচারের জন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সূত্রপাত হইয়াছে। ঋক্ মন্ত্রে দেবতার যে আহ্বান ও প্রার্থনাবাদী শ্রুত হওয়া যায়, এই সকল বৃত্ত-কথার মুখবন্ধে অগ্নি, সূর্য্য পুভূতি দেবতার স্তবে অনেক স্থলে সেই আদি স্তোত্রের পুতিধ্বনি বর্তমান যুগে আমাদের শ্রুতিগোচর হয়।

উড়িষ্যার জগন্নাথ-মন্দিরের গাঁত্রে যেক্রপ মনুষ্য-সমাজের বিচিত্র চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহার সকলগুলি ঠাকুর-দালানে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। অনেক চিত্র শীতলাকে অতিনাত্রায় অতিক্রম করিয়াছে। সেইরূপ, পূর্ব্বোক্ত বৃত্তকথাগুলির মধ্যে নিদয়ার গর্ভ ও তদবস্থায় তাহার রুচিকর খাদ্যের তালিকা হইতে বিদ্যা ও স্নানের নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়-সেবা পুভূতি অনেক বিষয়ই অবতারিত হইয়াছে। এ সমস্তই ঠাকুরকে শুনাইবার জন্য গীত হইয়া থাকে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই;



কিন্তু আগাদের দেশে ঠাকুর গৃহস্থের অনেকটা অন্তরঙ্গ। তিনি প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে একটি প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া পারিবারিক সমস্ত সুখ-দুঃখের সুস্কৃতম অবস্থার সন্ধান রাখেন; গৃহস্থ তাঁহাকে লুকাইয়া কোনও আমোদ করিতে সাহস পান না।

বৃত্ত-কথাগুলি প্রধানতঃ চণ্ডী, মনসা, শীতলা, সত্যনারায়ণ, এই সকল দেবতা লইয়াই বিশেষ ভাবে জমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু শিব-গীতিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষে বিরচিত হইয়া থাকিবে। “ধান ভান্তে শিবের গীত” প্রবাদ অতিপ্রাচীন। প্রাচীন “শিবায়ন” দুই একখানি পাওয়া যায়। সার্ক তিনি শত বৎসর পূর্বের কবিচন্দ্র একখানি শিব-গীতির রচনা করেন। কৃষ্টিবাসের উত্তর-কাণ্ডে শিবধর্ম-সম্বন্ধে অনেক পুসঙ্গ দৃষ্ট হয়। উহা প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বের বিরচিত হইয়াছিল। কবিরঞ্জন স্বয়ং বাল্যকালে ‘শিব-সঙ্গীত’ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আত্ম-পরিচয়ে লিখিয়াছেন।

কিন্তু শিব-গীতি এ দেশে তেমন বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। শঙ্কর-পুণোদিত শৈব-ধর্মের মূলে অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের মতে জীব স্বয়ং শিব। সাধারণ লোক বেদান্তমূলক এই উন্নত ধর্মভাব-গ্রহণে সমর্থ নহে। তাহারা স্বয়ং সাহস করিয়া ঠাকুরের আসন গ্রহণ করিতে পারে না; যে দেবতা দুঃখের সময়ে তাহাদিগকে বরিয়া তুলিবেন, বিপদে সহায় হইবেন, চণ্ডী, মনসা, সত্যনারায়ণ তাহাদের নিকট সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেবতা। দ্বৈতবাদ স্বীকার না করিলে সাধারণ লোকের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে; এই জন্য বঙ্গদেশে চণ্ডী ও মনসা পুত্ৰুতি দেবতার গানের দল এইরূপ অসামান্য পুষ্ট লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব ও শাক্তধর্মোক্ত প্রত্যক্ষ-দেবতা-বাদ হিন্দুকে প্রত্যক্ষ-ঈশ্বরবাদী জলন্ত-বিশ্বাসপরায়ণ ইসলামের আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল; শৈবধর্ম জন-সাধারণকে ইসলামধর্ম-গ্রহণ হইতে রক্ষা করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

চণ্ডী ও মনসা পুত্ৰুতি দেবতা-সম্বন্ধীয় কাব্যের আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, শিব স্বীয় ভক্তগণ-সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট। চন্দ্রধর সদাগর শিবের পরমভক্ত; মনসা দেবীর কোপে পড়িয়া তিনি কতই না কষ্ট সহ্য করিলেন; যে হস্তে তিনি শূলপাণির পূজা করিয়া থাকেন, তাহার অঞ্জলি অন্য কোনও দেবতার পদে দেয় নহে, এই অকুণ্ঠিত বিশ্বাসের ফলে আজীবন কষ্ট সহিলেন। এমন ভক্ত-শ্রেষ্ঠের বিপদে শিব একবারও সহায় হইলেন না। ধনপতি সদাগর চণ্ডীর কোপে কারারুদ্ধ হইলেন; জগদল পুস্তর তাঁহার বক্ষের উপর স্থাপিত হইল। চণ্ডী তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তিনি সেই অমার্চিত সাহায্য উপেক্ষা করিয়া চণ্ডীকে বলিলেন, “যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।” অথচ শিব এহেন ভক্তকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। চন্দ্রকেতু রাজা শীতলা দেবীর নিগ্রহে কত বিপদে পতিত হইলেন, তথাপি তিনি শিবের পুতি বিশ্বাসে অটল রহিলেন; কিন্তু শিব তাঁহারও কোনও সহায়তা করেন নাই।





শৈব ধর্মের সহিত শাক্ত ধর্মের বিরোধের আভাস আমরা এই সকল উপাখ্যানে প্ৰাপ্ত হই। শিবের নিশ্চেষ্টতা ও অপরাপর দেবতাদের তত্ত্বকে রক্ষা ও অবিশ্বাসীকে দণ্ড দিবার আগ্রহের মূলমন্ত্র আমরা এই স্থানে দেখিতে পাই। শৈব ধর্ম অদ্বৈতবাদ-রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; উহাতে সাহায্যকারী উপাস্য ও সাহায্যপ্রার্থী উপাসক,—কেহ নাই। জীব ও শিব অভিনু। কিন্তু শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের মূলে দ্বৈতবাদ; সেখানে দেবতা ভক্তের জন্য সর্বদা সচেতন।

শৈবধর্মাবলম্বী আপনাকেই যথাসাধ্য বড় করিয়া দেখিয়াছেন; নিজে বড় হইয়া জীব বুদ্ধের আসন পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সাহসী হইয়াছেন। বাঙ্গালা শিব-সঙ্গীতে শিবের মাহাত্ম্য চণ্ডী পুত্ৰভূতি দেবতার মাহাত্ম্য অপেক্ষা স্বতন্ত্র। কৃষ্ণবাসের রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শিব-সঙ্গন্ধে একটি উপাখ্যান আছে;—গঙ্গাদেবী কোনও সময়ে স্মনস্ত মুনির আশ্রমে ছিলেন। একদা দেবগৃহে রুক্মণ ও পরিবেশনাদির জন্য দেবতার মুনির নিকটে গঙ্গাদেবীকে প্রার্থনা করেন। স্মনস্ত মুনি গঙ্গাদেবীকে যাইতে অনুমতি দান করেন; কিন্তু বলিয়া দেন, যেন তিনি সন্ধ্যার পূর্বে আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। কর্ণবাহন্যবশতঃ গঙ্গাদেবীর ফিরিয়া আসিতে অনেক রাত্রি হয়। স্মনস্ত মুনি গঙ্গাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ-ভাবে বলিলেন, “এত রাত্রে তুমি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছ; দেবতা-দিগকে পরিবেশন করিবার কালে তোমার অঙ্গপুত্যাঙ্গে তাঁহাদের লোলুপ-দৃষ্টি পতিত হইয়াছে; তাঁহাদের দুষ্ট দৃষ্টির ভাজন হইয়া তুমি পতিতা হইয়াছ; আমি তোমাকে এই আশ্রমে আর স্থান দিতে পারি না।” অপবাদ-ভয়ে কোনও দেবতাই গঙ্গাকে স্থান দিতে সাহস করিলেন না। গঙ্গা অনাথিনীর বেশে ঘাটে ঘাটে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে পাগল ধূর্জটি তাঁহাকে মস্তকে স্থান দিয়া কৈলাসে নইয়া আসিলেন। পরিত্যক্তাকে একপ আশ্রয় তিনি ভিনু দেব-সমাজে আর কে দিতে পারিত? সমুদ্র-মহনকালে যে সকল বস্তু উঠিয়াছিল, তাহা দেবতাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিল। তখন মহাদেব শ্যুশানভঙ্গ্য দেহে মাখিয়া পাগলের ন্যায় হাসিতেছিলেন। কিন্তু যখন হলাহল উঠিয়া জগৎ স্বংস করিতে উদ্যত হইল, অমরাবতী ভঙ্গ্যসাৎ হইবার সম্ভাবনা ঘটিল, তখন শ্যুশানচরী মহাদেব আসিয়া সেই হলাহল পান করিলেন; ত্রিভুবন রক্ষা পাইল। কিন্তু সেই বিষ-ভকণে তাঁহার যে উৎকট যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহার ফলে মহাদেবের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গেল। বৈষ্ণব-পদাবলীতে দেব-গোষ্ঠ-বর্ণনায় লিখিত আছে,—গোপ-বালকবেশী হরি যখন গোষ্ঠে লীলা করিতেছিলেন, তখন বৃদ্ধা, ইন্দ্র, বরুণ পুত্ৰভূতি সকল দেবতা আসিয়া কৃতজ্ঞলিপুটে তাঁহাকে পূণ্যাম করিয়া-ছিলেন; গোপ-বালকের অপাঙ্গদৃষ্টিতেই তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন ভঙ্গ্যভূষিতদেহ শ্যুশানবাসী পাগলবেশী শিব উপস্থিত হইলেন, তখন হরি অগুসর হইয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এবং বলিলেন, “আপনি আমার বৈষ্ণবী মায়া অতিক্রম করিয়াছেন, এই জন্য আমার পুণ্য। আপনাকে আমি স্বর্ণময়ী কৈলাসপুরী দিয়াছিলাম, কুবেরকে আপনার ভাণ্ডারী করিয়া দিয়াছিলাম,



কিন্তু আপনি সেই দিগন্তই আছেন, এবং শাশানের ছাই অঙ্গে মাখিয়া থাকেন ; আমার সমস্ত শক্তি আপনার নিকট পরাজিত !”

এই দেব-মাহাত্ম্য, তাগের এই উন্নত আদর্শ জনসাধারণ ততটা বুঝিতে পারে না ; কিন্তু তাহারা ভোগের দেবতাদের পূজার ও তাঁহাদের পুস্তক ঐশুর্য্যের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে। পরবর্তী শিবায়নগুলিতেও শিব অপেক্ষা চণ্ডীর মাহাত্ম্য বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। স্মরণ্য তাহা খাঁটি শিব-মঙ্গীত নহে।

প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত মনসা, চণ্ডী, শীতলা প্রভৃতি দেবতাদিগের কার্য্যকলাপ সর্বত্র শোভনভাবে বর্ণিত হয় নাই। মনসা দেবী লক্ষ্মীন্দরের লৌহবাগেরে সর্প-প্রবেশযোগ্য একটি ছিদ্র রাখিবার জন্য গৃহ-নির্মাণা কাবিনাকে অনুরোধ করিতেছেন ; কখনও বা চাঁদ সদাগরের সংগৃহীত ভিক্ষার ঝুলির তড়ুল-কণা নষ্ট করিবার জন্য গণদেবের নিকট মূখিক ভিক্ষা করিতেছেন ; চাঁদ সদাগরকে বিপদে ফেলিবার জন্য কখনও বা হনুমানকে সমুদ্রে ঝড় উঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। চণ্ডীদেবীও নানা সূত্রে ধনপতি ও শ্রীমন্তকে বিপন্ন করিতেছেন ; ভক্তের স্মরণমাত্র ইঁহারা যে সকল ক্রিয়া-কলাপে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহা সর্বত্র শোভন বা মর্যাদামুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু বিষয়টি অন্য ভাবেও আলোচনীয়। জনসাধারণের বিশ্वास কতক পরিমাণে অমার্জিত থাকিবেই ; তাহাদের জন্যই এই সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। এই জন্য এই সকল রচনার সর্বত্র সুরুচি ও স্তম্ভাব রক্ষিত হয় নাই। পাঠক প্রাচীন রচনায় সর্বত্র খাঁটি সোনার প্রত্যাশা করিবেন না। আকরের স্বর্ণে যেকোন অন্য ধাতুর মিশ্রণ থাকে, খাদ বর্জন করিয়া তবে খাঁটি সোনার উদ্ধার করিতে হয়, তেমনই এই দেব-উপাখ্যানের মধ্যেও একটা উজ্জ্বল সত্য আছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবতার পূর্বোক্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা সামগ্রীর প্রাচুর্য্য আছে ;—তাহা সন্তানের জন্য মাতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতা। উপায় ও কার্য্যপুণালীতে উচ্চ নীতির সম্মতি থাকুক আর না থাকুক, সন্তান কষ্টে পড়িলে মাতা যেকোন নানা উপায়ে তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হন, এই সকল দেবতার বিচিত্র কার্য্য সেই প্রকার সচেষ্ট মাতৃ-ভাব-প্রণোদিত।

এক দিকে বেদান্ত-মূলক শৈবধর্ম, নির্গুণ ঐশ্বর-তত্ত্ব। তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন, সাধারণ লোকে তাহাতে প্রত্যক্ষ ও সগুণ দেবতার প্রতি অচলা ভক্তি, তৃপ্তি পায় নাই। অপর দিকে অশোভন পুণালীতে পরিব্যক্ত হইলেও, বেদান্তের সুক্ষ্ম তত্ত্ব ও শৈবধর্মের তাগের মহিমা সকলের আয়ত্ত নহে। তাহার স্থলে তত্ত্ব দুর্বল, অসহায় ও পাপী-তাপী হইলেও, শরণ লইবামাত্র তাহার জন্য দেবতার কোড় প্রসারিত হয়, এই বিশ্वास সাধারণের চিন্তে এক অভূতপূর্ব শান্তির স্রষ্টি করিয়াছিল ; পদ্মাপুরাণ, শীতলা-মঙ্গল, হরিলীলা, চণ্ডী-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যোক্ত দেবতার উপাখ্যান এই ভাবে দেখিলে অনেক বিসদৃশ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে।



এই কথা-সাহিত্যের আলোচনা করিলে আর একটি বিষয়েও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অতি-প্রাচীন সাহিত্যে বরং পুরুষ-চরিত্রগুলিতে কতকটা পৌরুষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার উন্নতির সহিত এই কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত কাব্যগুলি যতই শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতে লাগিল, ততই কাব্য-নাট্যকগণের চরিত্র খর্ব ও হীনতার বশে চিত্রিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে পৌরুষ ও চরিত্র-বলের যে অধোগতি হইয়াছে, প্রাচীন-সাহিত্যের আলোচনা করিলেও তাহা সপ্ৰমাণ হয়।

কবিগণ যে সকল উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বারা কাব্যনাট্যকগণের চরিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতে পারিতেন। কিন্তু কাব্যে তাহার বিপরীত হইয়াছে।

মনসার ভাসানে চাঁদ সদাগরের চরিত্রের যে আভাস আছে, তাহাতে ইঁহাকে পুরুষকারের জীবন্ত উদাহরণ বলিয়া মনে হয়। মনসাদেবীর ক্রোধে ইঁহার গুয়াবাড়ীর স্বংস হইল; একটি একটি করিয়া ছয়টি পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল; সপ্ত ডিঙ্কা ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ‘মধুকর’ জলযান দেবীর কোপে কালীদহে ডুবিয়া গেল;—চাঁদ সদাগর একটিবার বাম হস্তে মনসার পদে অঙ্গুলি দিলেই এই সকল উৎপাতের অবসান হইত। তখনও যদি সদাগর সম্মত হইতেন, তাহা হইলে মনসার কৃপায় মৃত পুত্রগণের পুনর্জীবন ও নষ্ট বৈভবের পুনরুদ্ধার হইত। কিন্তু চাঁদ সদাগরের পণ বজ্র-কঠিন। কালীদহের আবের্ডে পড়িয়া চাঁদ মৃতকর, অবিম্বৃত-পত্র-সঙ্কুল পদ্ম-লতা দেখিয়া আশ্রয়ের জন্য চাঁদ হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন; কিন্তু মনসার এক নাম পদ্মা, ইহা স্মরণ হইবামাত্র নামের সংস্রব-হেতু চাঁদ ধূলায় হস্ত প্রত্যাবর্তিত করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইলেন। তিন দিন অনাহারের পর চাঁদ প্রিয়স্বহৃৎ চন্দ্রকেতুর গৃহে আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে গুনিতে পাইলেন, চন্দ্রকেতুর গৃহে মনসাদেবীর ঘট স্থাপিত আছে; তখন কিছুমাত্র না খাইয়া সরোমে বন্ধুগৃহ হইতে পুত্ৰান করিলেন। সর্বাপেক্ষা কঠোর বিপদ্ উপস্থিত হইল। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, শোকদগ্ধা সনকা-রাণীর বন্ধের ধন লক্ষ্মীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হইল। কিন্তু চাঁদ সদাগরের সঙ্কল্প অটুট রহিল। একপ বীরপুরুষের মর্যাদাও প্রাচীন কবিগণ কিছুমাত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই; বরং নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে চাঁদ সদাগরের চরিত্রবলের সম্মান কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু কেতকাদাস, ফেমানন্দ প্রভৃতি পরবর্তী কবিগণ এই তেজস্বী চরিত্রকে উপহাস্যম্পদ করিয়া তুলিয়াছেন।—যখন তিনি কালীদহে পতিত হইয়াছেন, তখন কবি বর্ণনা করিয়াছেন,—“চোকে চোকে জল খায় চাঁদ অধিকারী।” চন্দ্রকেতুর আশ্রয় হইতে যখন তিনি সরোমে উঠিয়া আসেন, তখনকার বর্ণনা এইরূপ,—

“পাগল দেখিয়া তারে, কেহ চোকা চুকি মারে,  
কেহ মারেনাথায় ঠোকর।”



বনের পাখীগুলি চাঁদ সদাগরের পাদক্ষেপে উড়িয়া গেল ; ব্যাধগণ আগিয়া তাঁহাকে বলিল,—

“ কেন তুই পক্ষী দিলি ভেড়ে,  
কোথা হোতে কান তুই এলি ভেড়ের ভেড়ে ।”

কাঠের বোঝা মাথায় রাখিতে না পারিয়া মনগাদেবী কর্তৃক চাঁদ যখন বিড়ম্বিত হইতেছেন, তখন কবি লিখিয়াছেন,—

“ কাঠ বোঝা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে ।  
ঘাড়ে হস্ত দিয়া সাধু বাপ বাপ ডাকে ।”

এমন কি, স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াও অন্ধকারে তিনি স্বীয় ভৃত্য নেড়া কর্তৃক চোর-ব্রমে দগ্ধিত হইতেছেন,—

“ কলাবনে চাঁদ বেণে খুসুর মুসুর নড়ে ।  
লক্ষ দিয়া নেড়া তার ঘাড়ে গিয়া পড়ে ।  
চোর চোর বলিয়া মারিল চড় লাথি ।  
বিনা পরিচয়ে তাহে অন্ধকার রাতি ॥”

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই তেজস্বী বীর-চরিত্রের মহিমা কবিগণ কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ; হীন উপহাস ও বিক্রপের খেলনা-স্বরূপ করিয়া তাঁহাকে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন ।

কালকেতুর উপাখ্যানটি মুকুন্দরামের ন্যায় প্রতিভাবান কবির রচিত । কালকেতুর বীরত্ব অতি অপূর্ব । পশু-জগতের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁহার যে পরাক্রম দেখিতে পাই, তদপেক্ষা মহত্তর বিক্রম তাঁহার চরিত্রবলে বিদ্যমান । ব্যাধযোগ্য বর্ষরতার ক্রটি নাই, কিন্তু তাঁহার নৈতিক সাবধানতা ঋষি-তুল্য । দেবী চণ্ডী রূপসী ললনা সাজিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ব্যাধ-নায়ক তাঁহার কপট নীরবতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতেও উদ্যত হইয়াছিল । এই অমাজিত চরিত্র যেমন নৈতিক-বল-সম্পন্ন, তেমনই উদার ও সরল । মুরারি শীলের ন্যায় শঠ বণিকের সহিত তাঁহার ব্যবহারে আমরা সেই সারল্যের চিত্র সমুজ্জ্বলরূপে চিত্রিত দেখিতে পাই । এ পর্য্যন্ত মুকুন্দরাম পৌরুষের যে পট অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা নিখুঁৎ । কিন্তু কলিঙ্গ-রাজের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কালকেতু যে ভীকৃত্য প্রদর্শন করিল, তাহাতে বাঙ্গালী-কবি পৌরুষের চিত্রাঙ্কনে স্বভাবতঃই কিরূপ অপটু, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । মুকুন্দরাম এত বড় কবি হইয়াও কালকেতুর চরিত্রে সামগ্র্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই । ইহাতে তাঁহার বিশেষ অপরাধ নাই । যে সমাজে তিনি বাস করিতেছিলেন, সে সমাজে পুরুষের বীর্য্যবত্তা বিদায়োন্মথ হইয়াছিল । শ্রেষ্ঠ কবিগণ সমাজের প্রতিলিপিই প্রদান করিয়া থাকেন । কালকেতু যুদ্ধে হারিয়া স্ত্রীর উপদেশে ভীকৃত্যের একশেষ দেখাইল,—

“ কুরুর কথা শুনি, হিতাহিত মনে গুণি  
লুকাইল বীর রাধন ঘরে ।”



কিন্তু মাধবাচার্য্যের তুলিতে কালকেতুর চরিত্র এ ভাবে নষ্ট হয় নাই। মাধবাচার্য্য কবি-কঙ্কণের পূর্ববর্তী; তিনি পূর্ব-বদ্বের কবি। সে সমাজে প্রাচীন আদর্শ তখনও বিনষ্ট হয় নাই। মাধবাচার্য্য অন্য সর্ববিষয়ে কবি-কঙ্কণ অপেক্ষা অল্প-শক্তিশালী হইয়াও কালকেতুর চরিত্র-বর্ণনে বীর্য্যবস্তুর আদর্শ অধিকতর অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যখন কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর কুল্লরা কালকেতুকে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার উপদেশ দিল, তখন—

" শুনিয়া যে বীরবর,                      কোপে কাঁপে খর খর,  
 স্তন নামা আমার উত্তর ।  
 করে লয়ে শর গাণ্ডী,                  পূজিব মঙ্গলচণ্ডী,  
 বলি দিব কলিঙ্গ-ঈশ্বর ॥  
 যতেক দেখহ অশু,                    সকল করিব ভগ্ন্য ;  
 কুল্লর করিব লঙডও ।  
 বলি দিব কলিঙ্গ-নাথ,                তুমিই চণ্ডিকা নাথ,  
 আপনি ধরিব ছত্রদণ্ড ॥"

বন্দী অবস্থায় কালকেতু যখন রাজ-গভায় আনীত হইল, তখন, “রাজগভা দেখি  
বীর প্ৰণাম করে।”

ধনপতির চরিত্র-বর্ণনাতেও এই ভাবের অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। তাঁহাকে সিংহলরাজ বন্দী করিয়া অন্ধকূপে রাখিয়া দিলেন। বকে গুরুভার পামাণ। এই ভাবে বহুবৎসর যাপন করিয়াও তাঁহার অদম্য তেজ কিছুনাশ ক্ষুণ্ণ হইল না। চণ্ডীদেবী এই অবস্থায় তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “যদি আমার পূজা কর, তবে তোমার নষ্ট সৌভাগ্য উদ্ধার পাইবে।” পাষাণ-নিপীড়িত-বন্ধ, অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর ধনপতি উত্তর করিলেন— “যদি বন্দীশালে মোর বাহিরার প্রাণী। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।” এমন চরিত্রবান্ ব্যক্তি গোড়ে যাইয়া গণিকা-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, এবং খুলনা ও লহনা সপত্নীত্বের বিবাদে যে নিশ্চেষ্ট ভীকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে আমাদের কষ্ট হয়।

বর্ষমঙ্গল-কাব্যে লাউসেনের চরিত্রও প্রাচীন কবিগণ এই ভাবে শ্রীহীন করিয়াছেন। কাব্যে তাঁহার যে সকল বীরত্ব ও কীৰ্ত্তির কথা উল্লিখিত আছে, তাহা-দ্বারা একখানি মহাকাব্য রচিত হইতে পারিত। লাউসেন কাঙুরের কানবলকে অজ্ঞেয় কাটারীর পুত্রে পরাস্ত করিতেছেন; চেকুর দুর্গের ইছাই ঘোষ তাঁহার হস্তে নিহত হইল; গোড়েগুর-পুত্রিত প্রবীণ মল্লগণ তাঁহার বলপুত্রে পরাজয় স্বীকার করিল; নয়ান-সুল্লরী, সুরিকা পুভূতি গণিকাগণ তাঁহাকে পুলুক করিতে আসিয়া হতগর্ভ হইল; চারি দিকের রাজন্যবর্গ তাঁহার অপূর্ব বীরত্ব ও চরিত্র-পুত্রে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া লাউসেনকে আপনাদের রূপলাবণ্যবতী দুহিতাদিগকে পত্নীস্বরূপ উপহার দিয়া বন্য হইল। অবশেষে লাউসেন দুষ্টর তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলেন। তাঁহার তপঃ-



পুতাবেগ পূর্ণতার চিত্তস্বরূপ সূর্য্যাদেব পশ্চিম দিক্ হইতে উদিত হইলেন। এই সকল কথা কাব্য-ভাগে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; তদ্বারা আমাদের চক্ষেও কোন উজ্জ্বল বীর-চরিত্র প্রতিফলিত হয় নাই। ঋগ্‌ঠাকুর লাউসেনের বিপদ-দর্শনমাত্র তাঁহার গাত্র হইতে নশকটি পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিতেছেন। স্মরণ্য লাউসেনের কোনও চরিত্র-গৌরব উপলব্ধি করিবার অবকাশ কবিগণ রাখেন নাই। তিনি বিপন্ন হইবামাত্র স্বয়ং ঠাকুর আসরে অবতীর্ণ হইবেন, দুই এক পালা পাঠ করিবার পরেই পাঠকের মনে এই ধারণা বদ্ধনুল হইয়া যায়; তখন লাউসেনের বিপদে পাঠকের কোনও ভ্রাস উপস্থিত হয় না, এবং তাঁহার জয়েও তদীয় চরিত্রের প্রতি কোনও শুদ্ধার সঙ্কর হয় না।

এই সকল কাব্যে দেবমাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই কবিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; মনুষ্য-চরিত্র কবির চক্ষে তত দূর গুহ্য হয় নাই। এই সকল চিত্রে বঙ্গসমাজে পুরুষ-চরিত্রের অধোগতিই সূচিত হইতেছে। ক্রমশঃ পুরুষগণ দুর্বলতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। ঋগ্‌ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুন্দর, কামিনীকুমার, চন্দ্রভাল ও চন্দ্রকান্ত কাব্য-নায়ক-রূপে বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহারা অন্তঃপুরের নায়কতায় যেরূপ পটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদের জাতীয় লজ্জার বিষয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল কবি রমণী-চরিত্র-অঙ্কনে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এ দেশে সীতার পার্শ্বে বেহলা অন্যায়সে স্থান পাইতে পারেন। কোথায় বাল্মীকি, আর কোথায় কেতকাদাস; স্বর্ণ ও গীসে যে প্রভেদ, এই উভয় কবির প্রতিভায় তদপেক্ষাও অধিকতর তারতম্য; অথচ যদি আমরা অমার্জিত কথা মার্জনা করি, গ্রাম্যতা ও মূর্খতা সহ্য করিয়া পল্লীকবির কাব্য পাঠ করি, তাহা হইলে দীনহীনা বেহলার চরিত্র পাঠ করিতে করিতে আমাদের হৃদয় বেদনাতুর হইবে। এই রমণীকে ব্যাগের সাবিট্রী বা বাল্মীকির গীতা অপেক্ষা কোনও অংশে হীন মনে হইবে না। কলার মান্দাসে অকুল নদীতরঙ্গে বেহলা ভাসিয়া যাইতেছেন; স্বামীর শবে তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প। আত্মীয়-স্বজন সকলে তাঁহার নিব্বন্ধিতা দেখিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার নব-যৌবন ও অনিন্দ্যরূপ দেখিয়া কত দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু বেহলা অগত্যা উপেক্ষা করিয়া ভেলায় ভাসিতেছে; কখনও নবঘনবিনিমিত নিতম্ব-লম্বী কেশপাশ মুক্ত করিয়া রূপপ্রতিমা বেহলা দেব-সভায় নৃত্য করিতেছে; কখনও স্বামীর শব হইতে ক্রমিকীট তাড়াইয়া নিবিষ্ট-মনে তাহা হইতে মাছিতা ভাঙিতেছে; কখনও কর্ণে কুণ্ডল ও গলায় শঙ্খের মালা পরিয়া বেহলা যোগিনী-বেশে মাতা অমলা ও পিতা গায় বেণেকে সাধনা দিতেছে; কখনও বা ডুনুনী সাজিয়া ব্যজনীহস্তে শুল্ক-গৃহের সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। বেহলার দুষ্টর তপস্যা এই সমস্ত ব্যাপারকে শুদ্ধে ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। পাঠক বেহলার কথা পড়িয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারিবেন না। পল্লী-কবিগণের মূর্খতা ও সহস্র ভ্রষ্টা তাঁহার নিকট মার্জনা লাভ করিবে।





ফুল্লরার চরিত্রেও সেই উজ্জ্বল পাতিব্রত্য। দরিদ্র স্বামিগৃহে ভেরাণ্ডার খান, তাহা কাল-বৈশাখীতে পুতাহ ভাঙ্গিয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালের দারুণ রৌদ্রে পথের বালি উত্তপ্ত হয়, পা পুড়িয়া যায়; ফুল্লরা মাংসের পসরা মাথায় করিয়া হাটে হাটে পর্যটন করে। শীতকালে পুরাতন দোপাটোখানি গায়ে দিতে শত স্থান ছিন্नु হয়; বনে তখন শাক পাওয়া যায় না। ফুল্লরার তাল-পত্রের ছাউনী ভাঙ্গা কুঁড়েতে একখানি মাটিয়া পাথর পর্য্যন্ত নাই; গর্ভ করিয়া অমানি রাখিতে হয়। কখনও পসরা মাথায় করিয়া পরিশ্রান্ত ফুল্লরা তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; যদি বা কোথাও মাংসের পসরা নানাইয়া পুকুরের জল খাইতে গিয়াছে, অমনই চিলে আধা-আধি মাংস সাবাড় করিয়া ফেলিয়াছে। আশ্বিন মাসে যখন বঙ্গের ঘরে ঘরে উৎসব, তখন দুঃখিনী ফুল্লরার মাংসের বিক্রয় নাই; কারণ, সকলে দেবীর পুসাদমাংস লাভ করিত, ফুল্লরার পসার কে কিনিবে? সেই সময়ে চতুর্দিকে আনন্দের চিত্র;—নববস্ত্র-পরিহিত নরনারী আমোদে মত্ত; ফুল্লরা বস্ত্রের অভাবে হরিণের ছাল পরিয়া থাকিত। বসন্তকালে পুনোৎসব; যুবক ও রমণীরা সুখাভিলাসী; ফুল্লরা ক্ষুধার আলায় কুঁড়ে-ঘরে ছট্‌ফট্‌ করিত। এই তাহার বার মাসের কথা। কিন্তু যে দিন ঘোড়শীকপিণী চণ্ডী অতুল ঐশ্বর্য্যে পুনরুৎসব করিয়া দুঃখিনী ব্যাধরমণীর স্বামিপ্রেমের কণিকা প্রার্থনা করিলেন, সে দিন দেখা গেল, স্বামিপ্রেমের তুলনায় কুবেরের অতুল ঐশ্বর্য্যও অতি অকিঞ্চিৎকর। ফুল্লরা কালকেতুর মোহাগে দুঃসহ দারিদ্র্য মাথায় বরণ করিয়া লইয়াছিল, তাহাতেই তাহার সমস্ত বল ও সেই প্রেমের কণামাত্র হানি হইলে সে জীবন্মৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ রমণী-চরিত্র হিন্দু কবির কাব্যে তিনু অন্যত্র স্মৃত নহে।

খুলনা অতি তরুণবয়স্কা। এই বয়সেই নারী পুথন ভালবাসার আশ্বাদ পাইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ ছেলি রাখিবার ছুতায় বনে আনিয়া চম্পক ও কাঞ্চন কুসুমের পাশে এই কাঞ্চনপুতিমাকে স্থাপন করিয়া কাব্যের সাধ মিটাইয়াছেন। সেখানে সে যুক্তকরে ভ্রমরকে বলিতেছে, সে যদি ফিরিয়া গুপ্তরণ করে, তবে ভ্রমরীর মাথা খাইবে—এই শপথ। কোকিলকে বলিতেছে, সুদূর গৌড় দেশ, যেখানে তাহার স্বামী আছে, সেইখানে যাইয়া কোকিল কেন ডাকে না? অশোকতরুকে লতাবেষ্টিত দেখিয়া সে লতাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছে, এবং ‘সই’ বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে! এই নায়িকা শুধু কাব্যের উপযোগিনী নহে, ইহাকে স্নগুহিণী ও সন্তানবৎসলা-রূপে পরিণত করিয়া কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন। যেখানে খুলনার ছেলে ধান্যক্ষেত্রে উৎপাত করিতেছে, এবং কৃষকগণ তাহাকে গালি দিতেছে, সেই সময়ে ইহার দুঃখমলিন মুখখানি আমাদিগকে বেদনা প্ৰদান করে। আর যে দিন সর্ব্বসী ছাগলকে শূগালে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, লহনা জানিতে পারিলে তাহাকে মারিয়া খুন করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কায় ও কষ্টে খুলনা চণ্ডীর শরণ লইতেছে, সেই দিন তাহার চিত্রখানি ভক্তিগঙ্গায় অবগীহন করিয়া উজ্জ্বলতর হইয়াছে; তাহার কষ্ট সন্তোষেও সেদিন আর তাহাকে কৃপা করা যায় না। ইহার পরে আর এক দৃশ্য,—খুলনা স্বামী ও



জাতিবর্গের ভোজনের জন্য রন্ধন করিতেছে, রন্ধনশালায় খুলনা অনুপূর্ণাকৃপিনী, এবং যখন স্বামী জাতিবর্গকে নিরস্ত করিবার জন্য উৎকোচদানে উদ্যত, তখন গম্বিতা সাধ্বী স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া উৎকট পরীক্ষা দিতেছে, তখন খুলনা আমাদের নমস্যা হইয়াছে। তখন আর কৃপা করা যায় না।

অপর দিকে কাণাড়া ও কলিঙ্গার যুদ্ধে গর্ব ও তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বঙ্গঐতিহাসের সুদূর অধ্যায়ের ইঙ্গিত করিতেছে; সে অধ্যায় ঐতিহাসিক যুগের পূর্ববর্তী—তাম্রশাসন ও পুস্তরলিপির যুগ। তখন বঙ্গীয় বীরগণ দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ছিলেন; গোড়েশ্বর পালরাজগণের আদেশে তখন এক দিকে কামরূপের ও অপর দিকে উড়িষ্যার রাজারা এক পতাকার নিম্নে সমবেত হইতেন। বঙ্গীয় মহিলাগণের তখন কবি-বর্ণিত কটাক্ষ-সন্ধানই একমাত্র গুণবত্তা ছিল না। তাঁহারা ধনুর্বাণ নইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। কাণাড়ার যুদ্ধকে আমরা কেবল কাব্য-কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। দুর্গাবতী, ঝাঁসীর রাণী পুতুতির ছবি তখনও বঙ্গদেশে হইতে লুপ্ত হয় নাই।

সুতরাং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দেবলীলা ও অদৃষ্টবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পুরুষ-চরিত্রের গৌরব লুপ্ত হইলেও, রমণী-চরিত্রের মহিমা সুচিহ্নিত হইয়াছিল। যাহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বামীর চিত্তানলে আরোহণ করিতেন, সীতা-সান্নিধ্যের পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিতেন, এবং নানা প্রকার পারিবারিক দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করিয়া গহিষুতার প্রতিমূর্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন, কবিগণ তাঁহাদের পুত্রাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

ক্রমে যখন কবিগণ হিন্দু অন্তঃপুরের আদর্শ ত্যাগ করিয়া মসলমান কবির বর্ণিত জেনানার বিলাস ও লালসার সূচক চিত্রের ভাবে অধিকতর অনুপ্রাণিত হইলেন, তখন হীরা মালিনী ও বিদ্যার ন্যায় উপনায়িকা ও নায়িকাগণের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তখনও এ দেশের স্নেহশীল সাধ্বীগণের প্রভাব বঙ্গসাহিত্য হইতে বিদায়গৃহণ করে নাই। কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজবল্লভের মুসলমানী দরবারের আদর্শে গঠিত রাজসভা হইতে সুদূরে পল্লী-কবিগণ 'কবি' ও যাত্রাসঙ্ঘীতে উমা, মেনকা, যশোদা পুতুতির চিত্রে এ দেশের অন্তঃপুরবাসিনীগণের ছায়া পুনঃপুনঃ পুতিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত নহে।

[ সাহিত্য, ১৩১৫ ]





## নাট্যকার

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মানব-হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিন্যাস উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিনু দেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিনু। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কলাবিন্যাস পার্থক্য লইয়া আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যে দেশভেদে বিভিন্নতা। এমন কি, ইংলও ও স্কটলওে বিভিন্নতা দেখা যায়। কবিতা, চিত্রপট, সঙ্গীত সকলই কিঞ্চিৎ ভিনু। তাহার কারণ, বোধ হয়, ভিনু দেশে ভিনু ভিনু প্রকৃতির ছবি। নির্মল আকাশতলবাসী ইটালিয়ানের হৃদয়-ভাব—কুজ্জাটিকাবৃত, ঝটিকা-আলোড়িত, তমাচ্ছন্ন পর্বতশৃঙ্গ-নিবাসী স্কট্ হইতে অবশ্যই ভিনু। স্কটের সঙ্গীতে বিষাদ-ছায়া নিশ্চয় পতিত হইবে। সেইরূপ ইটালিতে হর্ষোৎফুল্লভাব প্রতিফলিত হইতে থাকিবে। চিত্তবিমোহন কাশ্মীর-প্রকৃতি-শোভা কালিদাসের কবিতা সুললিত করিয়াছে,—নাটকেও কাটাকাটি, হানাহানি নাই। কিন্তু সেক্সপিয়ার উচ্চ কবি হইলেও তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটকসকল বিয়োগান্তজনিত ঘোর ভীষণতাপূর্ণ। এক দেশের নাটক অপর দেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচিত হইতে পারে না। দার্শনিক জার্মান সিলার নাটকে ভার্জিন মেরির অবতারণা করিয়া উচ্চ “জোয়ান অফ্ আর্ক” নাটক রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সে ভাবে সেক্সপিয়ারের নাটক রচিত নয়। পশু-যুদ্ধ-আনন্দপ্রিয় স্পেনের নাটক নির্দয়তাপূর্ণ। ফরাসী-বিপ্লবের অগ্রগামী ও পশ্চাদ্বেষ্ঠী নাটকসকল প্রায়ই বিপ্লবের ভীষণতায় পরিপূর্ণ। সেক্সপিয়ারের ‘টেন্‌পেইট্’ নাটকের সহিত কালিদাসের ‘শকুন্তলা’ নাটকের বার বার তুলনা হইয়া থাকে। কিন্তু ‘টেন্‌পেইট্’ বায়ু-বিহারী দেহী ও কুহক-আশ্রয়ে রচিত। ‘শকুন্তলা’ ঋষির অভিশাপ ও অঙ্গরার পুনর-ভিত্তি-স্থাপিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে সপ্রমাণ করা যায় যে, ভিনু দেশে ভিনু মস্তিষ্ক-প্রসূত নাটক ভিনু ভাবাপনুই হইয়া থাকে; এবং এক দেশেই সময়-বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়। যথা—এলিজাবেথের সময়ের নাটকসকল দ্বিতীয় চার্লস-এর সমসাময়িক নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকল বস্তুই দেশকাল-পাত্র উপযোগী। সেই হেতু ভিনু দেশস্থ বা ভিনু সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাঁহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না। যদি কোনও রঙ্গালয়ে ‘শকুন্তলা’ সুন্দররূপে অনুবাদিত হইয়া অভিনীত হয়, তবে তাহা দর্শকের নন কতদূর আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহার স্থিরতা নাই। পাশ্চাত্য পুদেশে অনুবাদিত ‘শকুন্তলা’ দর্শক আকর্ষণ করিয়াছিল সত্য, কাব্যেরও পুশংসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী-রূপে গৃহীত হয় নাই এবং হইতেও পারে না। অনেকেই বলেন, ‘ওথেলো’ অনুবাদিত হইয়া অভিনীত হউক। অবশ্য মানব-হৃদয়-সম্প্রসৃত পুদীপ্ত ঈর্ষয়ার ছবি





দর্শকের মন স্পর্শ করিবে। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ যোদ্ধা মুরের পুত্রে অনিন্দ্যসুন্দরী ডেগ্‌ডিমোনার পিতৃগৃহ-ত্যাগ নিভূতে পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে। উভয়ের পুণ্য-নুরাগে ভালবাসার কথা নাই, কেবল যুদ্ধ-বিক্রম ও কঠোর সংকট হইতে কেশ-ব্যবধানে উদ্ধার-লাভ বর্ণিত। স্থির চিত্তে নিভূত পাঠে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেক্সপিয়ার-বর্ণিত 'ওথেলো'র মুখে অনুরাগ-চিত্র সহজে সাধারণের উপলব্ধি হয় না। বীরহে আকর্ষিত সুন্দরী-বর্ণনা সেক্সপিয়ারের পূর্বে সেদেশে পুনঃপুনঃ হইয়াছে। দর্শকও তাহা পাঠ করিয়া ডেগ্‌ডিমোনার অনুরাগ বুঝিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ নায়িকার প্ৰেমোদীপ্তভাবে গাঁহার অভ্যস্ত নন, তাঁহাদের নিকট উপবনে সুন্দর শোভা-হার-বিভূষিত স্থানে নায়ক-নায়িকার প্ৰেমানাপ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়।

এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিতক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-সোত—তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। বর্ধপুণ হিন্দু বর্ধপুণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু,—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব। যেক্রপ বীর-চিত্র যুদ্ধপিয় বীরজাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী ও বর্ধ-সম্মানকারী নায়ক হিন্দু-হৃদয়ে স্থান পাইবে। ভ্রোপদীকে দুঃশাসন আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া, স্থির-গম্ভীর যুধিষ্ঠিরের তাব হিন্দুর পিয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের মস্তকচ্ছেদন পাশ্চাত্যপিয় হইত। এদেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিক বর্ধপুসূত হইবে। বহুগুণযুক্ত রাজা ব্যতিচারী হইলে সতীত্বপূজক হিন্দু তাহাকে ঘৃণা করিবে। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণ-সীতা গঠিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন, শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজা। অস্থি-ত্যাগী দধীচি আদর্শ ত্যাগী ও অতিথি-সেবক। কিন্তু এক্রপ ত্যাগ বা এক্রপ নির্গমতা কঠোর দেশে বাতুলতা বলিয়া যদিচ উপহসিত না হয়, ভ্রান্তিমূলক বলিতে ক্রটি করিবে না। সতী নারীর অভিমান, প্রত্যেক দেশেই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পাতাল-প্ৰবেশোন্মুখী-জানকীর অভিমান, পতি-সহবাস-পরিত্যক্তা অভিমানিনী হইতে অনেক প্রভেদ। শেখোক্ত নায়িকা—“যেন রাম আমার জন্ম-জন্মাস্তরে স্বামী হন”—একথা বলিয়া অভিমান করেন না। স্বামীকে দেখিলে বসনে বদন আচ্ছাদন করেন, বাক্যালাপ করেন না। এইরূপ প্রত্যেক রসেই বিভিন্নতা দেখা যায়। এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্ৰথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয় লক্ষ্য—আত্মগোপন।

কবি বা উপন্যাসিক সকল স্থানে আসিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দিতে পারেন। কঠিন সমস্যাস্থলে অবস্থা বর্ণনা করিয়া পাঠকের উপর মনোভাব বুঝিবার ভার দেওয়া তাঁহার চলে এবং তার দেওয়া অনেক স্থলে উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা,—আয়েষা তিলোত্তমাকে আভরণ প্রদান করিয়া, দূর-দেশে গমন করিবে বলিতেছে। যথায় দোষ ধরিবার সম্ভাবনা, তাহা তিনি স্বয়ং খণ্ডন করিয়া যান,—



সর্বস্থানেই স্বয়ং উপস্থিত আছেন। এমন কি, সমালোচকের পুতি কটাক্ষ করিয়া আপনার সমালোচনা আপনি করিতে পারেন। উপন্যাস-গুরু ফিল্ডিং-এর 'টম জোন্স' তাহার উদাহরণস্থল। উপন্যাসিকের আর এক সুবিধা, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাহার উপন্যাসগত ব্যক্তিসকলের পরিচয় এককালে দিতে বাধ্য নহেন। পাঠকের কৌতুহল জন্মাইবার নিমিত্ত কাহাকেও বা অন্য সাজে রাখিতে পারেন, পাঠক তাহার পরিচয় পায় না, আগুহের সহিত কে সে ব্যক্তি, অনুসন্ধান করে। উপন্যাসিক সুযোগ বুঝিয়া তাহার পরিচয় দিয়া পাঠককে চমৎকৃত করেন। গার্ড ওয়ালটার স্কটের "পাইরেট" উপন্যাস এই উপন্যাসিক-কৌশলের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। নাট্যকার তাহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তির নিকট কাহাকেও গোপন রাখিতে পারেন, কিন্তু দর্শক তাহার পরিচয়-প্রাপ্ত। তাহাকে অন্য নাটকীয় কৌশলে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতে হইবে, যেমন 'মার্চেন্ট অফ্ ভিনিগ'-এ সাইলক বুকের নাংস কাটিতে পারিবে, কিন্তু বুকের রক্ত যেন না পড়ে। নায়িকা বিচারালয়ে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নিকট আব্রগোপন করিয়াছে, কিন্তু দর্শকের নিকট নয়। উপন্যাসিক এস্থলে দুই পুকার ধাঁধা দিতে পারিতেন। আইনজ্ঞ-বেশে বিচারালয়ে কে আসিল, তাহার পরিচয় দেওয়া তাহার আবশ্যক নয়, কিন্তু আইনজ্ঞ-বেশে পোসিয়া উপস্থিত, তাহা নাট্যকারকে বলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা নাটককারের এক স্বতন্ত্র কৌশল। এ কৌশল সাধারণ শক্তি-উদ্ভূত নয়। আব্রগোপনই নাটককারের জীবন।

উপন্যাসিক বা কবি গল্পের ভিত্তি বর্ণনা করিতে পারেন, সমস্ত অবস্থাই তাহার আয়ত্ত; কিন্তু নাটককারকে হৃদয়ের ঘাতপ্ৰতিঘাতে আমূল গর করিতে হইবে। তুলিকা স্থান অধিক্ত করিয়া নাটককারকে সাহায্য করে, কিন্তু তাহা চিত্রপট বলিয়া অনুভূত হয়, শক্তি-চালিত-লেখনী-চিত্রের ন্যায় সমস্ত ছবি স্বরূপভাবে পুতিফলিত হয় না। তুলিকা-চিত্রিত দৃশ্যে ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া কুসুমের বসিতে পায় না, কপোত-কপোতী পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করে না, মধুস্বরে পাখী গায় না। এ সমস্ত লেখনী বর্ণনায় করে; কিন্তু নাট্য-কবিরও পাখীর গান, ভ্রমর-গুঞ্জন দর্শককে শুনাইতে হইবে, বর্ণনায় নয়—ঘাত-প্ৰতিঘাতে। কেবল বর্ণিত হইলে নাট্যরস থাকিবে না। 'রোমিও-জুলিয়েট'-এ চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তাহা বর্ণিত চন্দ্র নয়, হৃদয়-প্ৰতিঘাতী চন্দ্র। তপোবনে বারি-গিঞ্জন, ভ্রমর-গুঞ্জন বর্ণিত নহে—হৃদয়-প্ৰতিঘাতকারী। সে তপোবনে, সে ভ্রমর-গুঞ্জে—পার্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া, দীর্ঘ-শিখাধারী কবি কালিদাস নাই; আছেন—শকুন্তলা ও দুহ্যন্ত এবং নাট্য-কৌশলে অলঙ্কিতে মদন। সেই ভ্রমর তপোবনে গুঞ্জন করিয়া, বিরহ-তাপিত দুহ্যন্তের করস্থিত চিত্রপটে আসিয়া আবার সজীব হইয়াছে, দুহ্যন্তের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে। নাটককারের দৃশ্যগুলি এইরূপ সর্বস্থানে সজীব হইয়া নায়কের হৃদয়ে আঘাত করিবে।



যথায় উৎকট সমস্যা-স্থল, তথায় নাট্যকারকে আবরণ খুলিয়া মনোভাব দেখাইতে হইবে। উপন্যাসের নায়িকার মত 'বিষপাত্র' পান করিলেই চলিবে না। 'হ্যাম্লেট' আত্মহত্যা করিবে কিনা, তাহা বিরলে বসিয়া ভাবিতেছে বলিলে চলিবে না, তাহার জড়িত মস্তিষ্কে কিরূপ জড়িত ভাব প্রসূত হইতেছে, তাহা দেখাইতে হইবে। "দুঃখের সাগর-বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ" (Take up arms against a sea of troubles)-রূপ জড়িত উপমা—অবস্থায় প্রসূত হইবে। এই উপমা অনেকেই সর্বদ্বন্দ্বীপ নয় বলিয়া দোষ দেন, কিন্তু নাট্যকার এরূপ সমালোচনার ভয় করিয়া উপমা সর্বদ্বন্দ্বীপ করিতে পারিবেন না। তিনি যাহা অন্তরে বা বাহিরে দেখিয়াছেন, তাহাই নাটকে দেখাইবেন। অতি-নিকট সম্বন্ধ হইলেও যুবক-যুবতীর এক গৃহে বাস অসম্ভব, এ কথা আত্ম-নির্গলতাভিমानी সমাজে বলিতে ভয় পাইবেন না। তরল স্ত্রী-চরিত্র যে অতি দুঃখের সময়ে চাটুকারের প্রতারণায় চঞ্চল হইতে পারে; যথা—তৃতীয় রিচার্ডের কাপট্যে 'অ্যানি'র হৃদয়, তাহাও নিতীকচিহ্নে প্রদর্শন করিবেন। ধর্মের পুরস্কার—আর্থিক লাভ নয়; তাহা হইলে ধর্ম একটি উচ্চ ব্যবসায় হইত। ধর্মের পুরস্কারই ধর্ম, ইহা দেখাইয়া সাধারণের বিরজিতাজন হইয়াও তাঁহাকে অটল থাকিতে হইবে। সংসারের অবস্থা যেন তাঁহার কল্পনা-মুকুরে প্রতিফলিত হয়। ইহাতে সংসারের অপ্রিয় হইতে হইলেও তিনি তোষামোদী কথায় সংসারকে সম্বলিত করিতে পারিবেন না। আঘাত দিতে হয়—আঘাত দিবেন, তাহাতে বিরাজাজন হইতে পারেন, কিন্তু কর্তব্য-পরায়ণ হইবেন, এবং কর্তব্য-পালন-ফলে অমরত্ব নিশ্চয়ই লাভ করিবেন।

[ নাট্যমন্দির, ১৩১৭ ]

## নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাস, তিনটিই মনুষ্য-চরিত্র লইয়া রচিত। কিন্তু এই তিনটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে।

মহাকাব্য—একটি বা একাধিক চরিত্র লইয়া রচিত হয়। কিন্তু মহাকাব্যে চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গমাত্র। কবির মুখ্য উদ্দেশ্য—সেই প্রসঙ্গক্রমে কবির কবিত্ব দেখানো। বর্ণনাই (যেমন প্রকৃতির বর্ণনা, ঘটনার বর্ণনা, মনুষ্যের প্রবৃত্তির বর্ণনা) কবির প্রধান লক্ষ্য। চরিত্র উপলক্ষ্য মাত্র; যেমন রঘুবংশ। ইহাতে কবি প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রগুলির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—কতকগুলি বর্ণনা।



অজ-বিলাপে ইন্দুমতীর মৃত্যু উপলক্ষ্য মাত্র। এ বিলাপ অজের সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, যে কোনও পৌরিক স্বামী-সম্বন্ধে সেইরূপ খাটে। কবির উদ্দেশ্য—চরিত্র-নিবিশেষে প্রিয়জনের বিচ্ছেদে শোকের বর্ণনা করা ও সেই বর্ণনায় তাঁহার কবিত্ব দেখানো। উপন্যাসে, চরিত্রাবলি লইয়া একটা মনোহারী গল্পের রচনা করাই গুরুকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। উপন্যাসের মনোহারিত্ব সেই গল্পের বৈচিত্র্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

নাটক—কাব্য ও উপন্যাসের মাঝামাঝি; তাহাতে কবিত্ব চাই, গল্পের মনোহারিত্ব চাই। তাহার উপরে ইহার কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে।

প্রথমতঃ, নাটকে একটা আখ্যানবস্তুর ঐক্য (unity of plot) চাই। একটি মাত্র বিষয়ই একখানি নাটকে প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য ঘটনা তাহাকে ফুটাইবার জন্যই উদ্ভিষ্ট।

উদাহরণতঃ—উপন্যাসের গতি ধাবমান লঘু মেঘখণ্ডগুলির মত; তাহাদের গতি একদিকে বটে, কিন্তু কোনটি কোনটির অধীন নহে। নাটকের গতি নদীর স্রোতের মত,—অন্যান্য উপনদী তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে মাত্র। অথবা উপন্যাসের আকার একটি শাখার মত,—চারিদিকে নানা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া সেখানেই তাহাদের বিভিন্ন পরিণতি হইয়াছে। কিন্তু নাটকের আকার মোচার মত, এক স্থান হইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত হইয়া একস্থানেই তাহা শেষ হইতে হইবে। পুঁন নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, সেই পুঁনের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন রোমিও ও জুলিয়েট। লোভ মুখ্য বিষয় হইলে, সেই লোভের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন ম্যাক্বেথ। উচ্চাশয় নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, তাহার পরিণামেই তাহার পরিণতি; যেমন জুলিয়স সিজার। নাটক প্রতিহিংসায় আরম্ভ হইলে, অন্তিমে প্রতিহিংসারই ফল দেখাইতে হইবে; যেমন হ্যামলেট।

তাহার উপরে, নাটকের আর একটি নিয়ম আছে। মহাকাব্য বা উপন্যাসে একরূপ বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। নাটকে প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা চাই। নাটকের মধ্যে অবাস্তব বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না। সকল ঘটনা বা সকল বিষয়ই নাটকের মুখ্য ঘটনার অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া চাই। নাটকে এমন একটি ঘটনা বা দৃশ্য থাকিবে না, যাহা নাটকে না থাকিলেও, নাটকের পরিণতি বর্ণিতরূপ হইত। নাটককার নাটকে যত অধিক ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন, ততই এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ পাইতে পারে; আখ্যানবস্তু ততই মিশ্র হইতে পারে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলি সেই মূল ঘটনার দিকেই চাহিয়া থাকিবে, তাহাকেই আগাইয়া দিবে, কিংবা পিছাইয়া দিবে। তবেই তাহা নাটক, নহিলে নয়। উপন্যাস একরূপ কোন নিয়মের অধীন নহে। মহাকাব্যে ঘটনাবলির একাগ্রতা বা সার্থকতা—কিছুরই প্রয়োজন নাই।



কবিত্ব নাটকের একটি অঙ্গ ; তাহা উপন্যাসে না থাকিলেও চলে। চরিত্রাঙ্কন নাটকে থাকা চাই ; কাব্যে তাহা না থাকিলেও চলে।

নাটকের আর একটি প্রধান নিয়ম আছে, যাহা নাটককে কাব্য ও উপন্যাস উভয় হইতেই পৃথক্ করে। ঘটনার ঘাত-প্ৰতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্য চরিত্র কখনও সরল রেখায় যায় না। জীবন একদিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে ধাক্কা পাইয়া তাহার গতি অন্য দিকে ফিরিল ; পুনরায় ধাক্কা পাইয়া আবার অন্যদিকে অগ্রসর হইল—নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে। উপন্যাসে বা মহাকাব্যে ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের জীবন, যত সামান্যই হউক না কেন, কিছু-না-কিছু ধাক্কা পায়ই। কোনও মনুষ্য-জীবন একেবারে সরল রেখায় চলে না। একজন বেশ লেখাপড়া করিতেছিল, সহসা পিতার মৃত্যুতে তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হইল। কেহ বা বিবাহ করিয়া, বহু পুত্রকন্যা হওয়ায় বিবৃত হইয়া পড়িয়া, দাস্য স্বীকার করিল। একরূপ ঘটনা-পরম্পরা প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনে ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য যে কোনও ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস লিখিতে হইলে তাহা নাটকের আকার কতক ধারণ করেই। কিন্তু প্রকৃত নাটকে এই ঘটনাগুলি একটু প্রবল ধাঁজের হওয়া চাই। ধাক্কা যত অধিক এবং যত প্রবল হইবে, ততই তাহা নাটকের যোগ্য উপকরণ হইবে।

অন্ততঃ নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি—বাধা অতিক্রম করিতেছে, বা সে চেষ্টা করিতেছে, একরূপ দেখানো চাই। কেন্দ্রীয় চরিত্র যেখানে বাধা অতিক্রম করে, সে নাটককে ইংরাজিতে comedy বলে। বাধা অতিক্রান্ত হইলেই সেইখানেই সেই নাটকের শেষ। যেমন, দুই জনের বিবাহ যদি কোনও নাটকের মুখ্য ব্যাপার হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ নানাবিধ বিষু আসিয়া তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইতে না দেয়, ততক্ষণ নাটক চলিতেছে। যেই বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল, সেইখানেই যবনিকা পড়িবে।

পরিশেষে বাধা অতিক্রান্ত নাও হইতে পারে। বাধা অতিক্রম করিবার পূর্বেই জীবনের বা ঘটনার শেষ হইতে পারে। দুঃখ দুঃখই রহিয়া যাইতে পারে। একরূপ স্থলে ইংরাজিতে যাহাকে tragedy বলে, তাহার স্রষ্টা হয়। যেমন, উপরি-উক্ত উদাহরণ ধরুন—যদি নায়ক বা নায়িকা, বা উভয়েরই মৃত্যু হয়, কিংবা একজন বা উভয়ই নিরুদ্দেশ হয়। তাহার পরে আর কিছু বলিবার নাই। তখন সেইখানে যবনিকা পড়িবে।

ফলতঃ, সুখের ও দুঃখের বাধা ও শক্তি, চরিত্র ও বহির্ঘটনার সংঘর্ষে নাটকের জন্ম। যুদ্ধ চাই ; তা সে বাহিরের ঘটনাবলির সহিতই হউক, কিংবা নিজের সঙ্গেই হউক।

অন্তর্দৃষ্টি যে নাটকে দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক ; যেমন—হ্যাম্লেট বা কিং লিয়ার। বহির্ঘটনার সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নাটকের উপাদান ;



যেমন ওথেলো বা ম্যাক্বেথ। ওথেলোকে ইয়োগো বুঝাইল যে তাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা। মুখ অমনই তাহাই বুঝিল। তাহার মনে কোনও দ্বিধা হইল না। ওথেলোতে কেবল একস্থানে ওথেলোর মনের মধ্যে দ্বিধা আসিয়াছে। সে দ্বিধা স্ত্রী-হত্যার দৃশ্যে। সেখানেও কিন্তু যুদ্ধ পূর্বে ও ঈর্ষায় নহে; সেখানে যুদ্ধ—রূপনোহে ও ঈর্ষায়। ম্যাক্বেথে যেটুকু দ্বিধা আছে, তাহা এতদপেক্ষা অনেক উচ্চ অঙ্গের। উংকান্কে হত্যা করিবার পূর্বে ম্যাক্বেথের হৃদয়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ধর্ম ও অধর্ম, আতিথে ও লোভে। কিং লিয়ারের যুদ্ধ অন্য রকমের। সে যুদ্ধ অজ্ঞানে ও জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও সন্দেহে, অক্ষমতায় ও পুষ্টিতে। হ্যামলেটের মনে যে যুদ্ধ, তাহা আলস্য ও ইচ্ছায়, পুতিহিংসায় ও সন্দেহে। এই যুদ্ধ নাটকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত চলিয়াছে।

এই অন্তর্ভুক্ত সব মহানাটকে আছেই আছে। পুষ্টি ও পুষ্টির সংঘাতে তরঙ্গ না উঠাইতে পারিলে, বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ধূণি-ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে, কবি জমকালো রকম নাটকের সৃষ্টি করিতে পারেন না।

অন্তবিরোধ না থাকিলে উচ্চ অঙ্গের নাটক হয় না। বাহিরের যুদ্ধ নাটকের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করে না। তাহা যে-সে নাটককার দেখাইতে পারেন। যে নাটকে কেবল তাহাই বর্ণিত হয়, তাহা নাটক নহে—ইতিহাস। যে নাটক বাহিরের যুদ্ধকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া মনুষ্যের পুষ্টিসমূহের বিকাশ করে, তাহা অবশ্য নাটক হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চ অঙ্গের নাটক নহে। যে নাটক বৃত্তিসমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।

বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য উচ্চ অঙ্গের নাটকে বহুল-পরিমাণে থাকে; যেমন সাহস, অধ্যবসায়, পুতুংপনুমতি, দয়া ইত্যাদি গুণের সমবায়। কিংবা ধেম, জিহাংসা, লোভ ইত্যাদি বৃত্তিসমূহের সমবায় একটি চরিত্রে থাকিতে পারে।

অনুকূল বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নাটক লেখা তত শক্ত নহে। তাহাতে মনুষ্য-হৃদয়-সঙ্কে নাটককারের জ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আদর্শ চরিত্র তিনু পুতোক মনুষ্য-চরিত্র দোষ-গুণে গঠিত। দোষগুলি বাদ দিয়া কেবল-মাত্র গুণগুলি দেখাইলে একটি সম্পূর্ণ মনুষ্য-চরিত্র দেখানো হয় না। যে নাটককার একটি আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করিতে বসিয়াছেন, তাহার বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা। তিনি মনুষ্য-চরিত্র দেখাইতে বসেন নাই। তিনি দেব-চরিত্র—মনুষ্য-চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত—তাহাই দেখাইতে বসিয়াছেন। বস্তুতঃ, তিনি নাটকাকারে ধর্ম-পুচার করিতে বসিয়াছেন। আমি এ গ্রন্থগুলিকে নাটক বলি না—ধর্ম-গ্রন্থ বলি। তাহাতে তিনি সে চরিত্রের যতপূকার গুণরাশি একত্র একখানি নাটকে দেখাইতে পারেন, ততই তাহার গুণপনা প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহাতে মনুষ্য-চরিত্রের চিত্র হয় না।

বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখানো অপেক্ষাকৃত দুর্লভ ব্যাপার; এখানে নাটককারের কৃতিত্ব বেশী। যিনি মনুষ্যের অন্তর্ভুক্ত উদ্ভাটিত করিয়া দেখাইতে



পারেন, তিনি প্রকৃত দার্শনিক কবি। বল ও দৌর্বল্য, জিঘাংসা ও করুণা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গর্ব ও নম্রতা, ক্রোধ ও সংযম—এক কথায় পাপ ও পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের নাটক হয়। ইহাকেই আমি অন্তবিরোধ বলিতেছি। মানুষকে একটি শক্তি ধাক্কা দিতেছে, আর একটি শক্তি ধরিয়া রাখিতেছে, অশুচালকের ন্যায় কবি এক হস্তে চাবুক মারিতেছেন, অপর হস্তে রশ্মি ধরিয়া টানিয়া রাখিতেছেন, এইরূপ কবিই মহা-দার্শনিক কবি।

আর একটি গুণ নাটকে থাকা চাই। কি নাটক, কি উপন্যাস, কি মহাকাব্য, কোনটিই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ, সকল সুকুমার কলাই প্রকৃতির অনুবর্তী। প্রকৃতিকে সাজাইবার বা রঞ্জিত করিবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার নাই।

এখন আমরা দেখিলাম যে, নাটকে এই গুণগুলি থাকা চাই; যথা—(১) ঘটনার ঐক্য, (২) ঘটনার সার্থকতা, (৩) ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত-গতি, (৪) কবিত্ব, (৫) চরিত্র-চিত্রণ, (৬) স্বাভাবিকতা।

[ সাহিত্য, ১৩১৮ ]

## কবিতার কষ্টিপাথর

বিপিনচন্দ্র পাল

কেবল ভাল লাগে বলিয়াই কোনও কবিতাকে শ্রেষ্ঠ, আর ভাল লাগে না বলিয়াই কোনও কবিতাকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। আমরা যাহাকে ভাল-লাগা বলি, তাহা একটা মিশ্র-অনুভূতি। কবিতা-বিশেষ লিখিয়া বা পড়িয়া যে আনন্দানুভব হয়, তাহাতে বর্তমানের প্রত্যক্ষ এবং অতীতের বহুতর স্মৃতি অতিশয় ওতপ্রেত হইয়া জড়াইয়া থাকে। কবির কাব্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, সৃষ্টিমাত্রেরই যে একটা আনন্দ আছে, কবি কবিতা রচনা করিতে সে আনন্দ অনুভব করেন। শিশু যখন বর্ণমালা শিখিয়া প্রথম দিন, সেটে “বাবা” “মা” “কাকা” “দাদা” প্রভৃতি পরিচিত কথাগুলি লিখে, সে দিন তার অপূর্ব আনন্দ হয়। ইহাতে তার নিজের কৃতিত্বের প্রমাণ পাইয়া সে আনন্দিত হয়। অক্ষরগুলোর ছাঁদের ভাল-মন্দের সঙ্গে এ আনন্দানুভূতির কোনও-ই সম্পর্ক নাই। কবিও কবিতা রচনা করিয়া আপনার একটা কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হন। কবিতার ভাল-মন্দের উপরে এ আনন্দ তখন নির্ভর করে না। সে বিচার অপরে করিবে। সে কথা পরে উঠিবে। তখন লোকে মন্দ বলিলে তাঁর আনন্দের হানি হইবে, কারণ সে মন্দ বলাতে তাঁর কৃতিত্বের



অভিমাণে আঘাত লাগিবে। লোকে সে কবিতা পড়িয়া ভাল বলিলে, তাঁর আনন্দ বাড়িয়া উঠিবে, কারণ সে ভাল-বলাতে লোক-মধ্যে তাঁর কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইতেছে—এ বোধ তাঁর জন্মিবে। তারপর স্রষ্টিমাত্রতেই সৃষ্টির আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধি হয়। ইংরাজিতে এই আত্মপ্রকাশকে self-expression এবং আত্মোপলব্ধিকে self-realisation বলে। এই আত্মপ্রকাশের এবং আত্মোপলব্ধিরও একটা গভীর আনন্দ আছে। কবি কাব্য-রচনায় এই আনন্দও অনুভব করেন। এই দুই প্রকারের আনন্দ সকল কবিরই হয়। ভাল কবিরও হয়, মন্দ কবিরও হয়। ইহার দ্বারা কোনও কবিতার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হয় না ও হইতেই পারে না, ইহা দেখিয়াছি। তারপর পাঠকের কথা। কবিতা-পাঠে আমরা যে আনন্দ পাই, তাহাও নানা কারণে জন্মো। যে কবিতায় আমাদের কোনও পূর্ব-পরিচিত বস্তুভূতিকে জাগাইয়া দেয়, তাহাতে আমরা আনন্দ পাই। আর আমাদের স্মৃতি নানা কারণে জাগিয়া উঠে। কিন্তু যে কারণেই জাগরুক হউক না কেন, প্রত্যেকের আশ্রয় ব্যতীত স্মৃতি জন্মো না। আগে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তার অনুরূপ কোনও-কিছু দেখিলে, কিংবা দেখিতেছি ভাবিলেই, সেই প্রত্যক্ষের স্মৃতি জাগরুক হইয়া উঠে। এ ক্ষেত্রে আমি বর্তমানে যাহা শুনিতেছি বা দেখিতেছি, তার পরিপূর্ণ মর্মে না বুঝিয়াও, সেই পূর্ব-স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া গভীর আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। কিন্তু এই আনন্দ সত্য নহে, অধ্যাস-জনিত। ইহা-দ্বারা যে বিশেষ কবিতার আশ্রয়ে ইহা জন্মিয়াছে, তার উৎকর্ষ প্রমাণিত হইবে না। বৈষ্ণব মহাজনগণের ললিত পদাবলি শুনিয়া এক লম্পট ব্যক্তি অজ্ঞান অশ্রুপাত করিতেছিল। কীর্ত্তন ভাঙ্গিলে তাকে প্রশ্ন করা হইল, “তুমি এমন-ভাবে আকুল হইয়া কাঁদিতেছিলে কেন, বল দেখি?” সে সরল ভাবে বলিল, “আর কিছু নয়, কীর্ত্তনীয়া যখন ‘বঁধু! বঁধু!’ বলিয়া ডাকিতেছিল, তখন আমার এক ব্যক্তির কথা মনে পড়িয়া গেল, যে আমাকে ঐ ভাবেই ডাকিত।” এখানে এ ব্যক্তি বৈষ্ণব-কবিতার যে রস গ্রহণ করিয়া কাঁদিল, তার দ্বারা সে-সকল পদাবলির উৎকর্ষ-পকর্ষের বিচার হইবে কি?

ফলতঃ, এই ভাল-লাগা ব্যাপারটার, এই আনন্দানুভূতিটার অন্তরালে ভাল-মন্দ, সত্য-কল্পিত, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট অনেক কারণ বিদ্যমান থাকে। সে-সকল কারণের অনুসন্ধান না করিয়া কেবল ভাল লাগে বলিয়াই কোনও কবিতাকে শ্রেষ্ঠ, আর ভাল লাগে না বলিয়াই কোনও কবিতাকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। ইংলণ্ডের অনেক লোকের কিপ্লিং-এর কবিতা ভাল লাগে; তাঁদের টেনিসন একেবারেই ভাল লাগে না। অনেকের টেনিসন খুবই ভাল লাগে, কিন্তু ব্লাউনিং তারা পড়িতেই পারে না। এ ক্ষেত্রে কেন কার কি ভাল লাগে, ইহা না জানিয়া, এই সকল কবির কাব্য-স্রষ্টির শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট-বিচার করা যায় না। কিপ্লিংকে অনেক লোকে ভালবাসে, কারণ কিপ্লিং-এর হালকা ভাবগুলি তাঁদের মনোমত, এগুলিকে তারা সহজে ধরিতে ও বুঝিতে পারে। টেনিসনের আভিজাত্যের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠতা নাই; তাঁর







তাহাই বাস্তবিক; যাহার বস্তু নাই, তাহাই অবাস্তব। সুতরাং তোমার নিজের কথাতেই, কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় না,—এই মিষ্টত্বের অন্তরালে বস্তু থাকি চাই। এই বস্তুত্বের দ্বারাও কবিতার বিচার হইবে, কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা নহে। কেবল বস্তুত্বে কবিতা হয় না, কেবল মিষ্টত্বও হয় না। বস্তুত্বের সঙ্গে মিষ্টত্বের, মিষ্টত্বের সঙ্গে বস্তুত্বের মিলন যেখানে, সেইখানেই সত্য কবিতা জন্ম; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতামাত্রই রসাত্মক এবং বস্তুতন্ত্র।

সুতরাং কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা কখনও কাব্যের ভাল-মন্দ-বিচার করা চলে না। মিষ্টত্ব একটা অনুভূতি। অনুভূতি বলিলেই, যে অনুভব করে এমন কোনও ব্যক্তি, আর যাহা তার এই অনুভবের বিষয় এমন কোন বস্তু,—এ দুইটিই বুঝায়। আর এই অনুভবের বিষয় দুই জাতীয় হইতে পারে। এক—যাহা বর্তমানে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত, দ্বিতীয়—যাহা অতীতে কোনও সময়ে উপস্থিত ছিল, এখন অনুপস্থিত হইয়াও তাবযোগে কিংবা association of ideas-এর সহায়ে মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অথবা স্মৃতি, এই দুই সূত্র ব্যতীত কোনও-কিছু আমাদের সত্য অনুভবের বিষয় হইতেই পারে না। সত্য অনুভব যখন বলিলাম, তখন মিথ্যা অনুভব সম্ভব, ইহাও মানিয়া লইলাম। সে মিথ্যা অনুভব কি? তার উৎপত্তি কিম্বা ও স্থিতি কোথায়? ইহাও জানা প্রয়োজন; নতুবা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ করিব কিরূপে? সত্য অনুভব হয় বর্তমান প্রত্যক্ষ, না হয় পূর্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতিকে ধরিয়া। সুতরাং যে অনুভবের মূলে বর্তমান প্রত্যক্ষও নাই, আর পূর্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতিও নাই, সেই অনুভবকেই মিথ্যা বলিব। এই মিথ্যা অনুভবও আবার কোনও কোনও স্থলে একান্ত মিথ্যা, আর কোনও স্থলে বা সত্যভাগ হইতে পারে। শিশু প্রেমের বাহুপাশ-বন্ধন অথবা ভালবাসার জড়াজড়ি দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। শিশুর এ অনুভব সত্য নহে, কিন্তু সত্যভাগ। ভালবাসার জড়াজড়ি যে কি, সে এখনও জানে না; জানিবে, সংখ্যার আশ্বাসন যে দিন পাইবে, সে দিন। এখন সে জানে মারামারিতেই কেবল জড়াজড়ি হয়। সুতরাং এখানে তাহাই সে সহজে কল্পনা করিল; অর্থাৎ এখানে বাস্তবিক যে ভাবটা নাই, সে আপনার মন হইতে তাহাই তার উপরে চাপাইল। এ গেল এক প্রকারের মিথ্যা অনুভব। এ অনুভব একান্ত মিথ্যা নয়, আধখানা সত্য মাত্র। শিশুর নিজের অন্তরের অনুভূতিটা সত্য, বাহিরে তার আরোপটা করিল।

কিন্তু আর এক প্রকারের অনুভব আছে, যাহা আধখানা সত্য বা সত্যভাগও নয়—যাহা সর্বস্ব মিথ্যা, আদ্যোপান্ত স্বকপোলকল্পিত। যে ব্যক্তি জন্মে কোনও দিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, বরফ-পড়া কাঁকে বলে, তাহা বা তার অনুরূপ কোনও-কিছু সে দেখে নাই; কেবল শুনিয়াছে যে, দূরন্ত শীতের দেশেই কেবল বরফ পড়ে; কেতাবে পড়িয়াছে যে, এই বরফ যখন পড়িতে আরম্ভ করে, তখন আশ্মান-জনীন যেন টুকরা-টুকরা ফেন-পুঞ্জ তরিয়া যায়। এই শোনা-কথার উপরে সে তার মনে-মনে



বরফ-পাতের একটা মন-গড়া ছবি আঁকিয়াছে। এই দৃশ্যের অনুভূতিটা নিতান্ত মিথ্যা; ইহাতে পুতাক্ষের লেশমাত্র নাই। ইহা অনুমান-প্রতিষ্ঠিতও নহে; কারণ অনুমানমাত্রই পুতাক্ষের উপরে গড়িয়া উঠে। ইহা উপমানও নহে; কারণ একান্ত অপুতাক্ষের উপমানও সম্ভবে না। ইহা উপমানের অনুমানের উপরে গঠিত। বস্তুর ছায়ার ছায়া, তস্য ছায়ামাত্র। ইহাতে বস্তুর চিহ্ন, সত্যের আভাসমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর রসমাত্রই যখন কোনও-না-কোনও বর্তমান পুতাক্ষ বা পূর্ব পুতাক্ষের স্মৃতির আশ্রয়ে জন্মে, তখন যে রস এ ভাবে জন্মে না, তাহা কখনই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

এই কটিপাথর দিয়াই সকল কবিতার বিচার করিতে হয়। আমার নিকটে মধুসূদনের বুজাঙ্গনা-গীতি বেশী মিষ্ট লাগে। তোমার নিকটে গিরিশ ঘোষের “যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী” বেশী মিষ্ট লাগে। এখানেও তোমার অনুভূতিই শ্রেষ্ঠ, না আমার অনুভূতি শ্রেষ্ঠ,—ইহার বিচারও ঐ ‘বস্তু’র কটিপাথর দিয়াই করিতে হইবে। নায়কের সঙ্কেতে তাঁর নিকটে যাইবার জন্য নায়িকার উদ্বেগই এই দুইটি কবিতার বিষয়। এই উদ্বেগই এখানে ‘বস্তু’। এই উদ্বেগের অবস্থায় নায়ক-নায়িকার যে সত্য অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি এবং এই অনুভূতি যে আকারে তাঁদের আচার-আচরণে, মুখের ভাবে, অঙ্গ-পুতাক্ষের অবস্থানাদিতে প্রকাশিত হয়, তাহাই সে বস্তুর লক্ষণ। বস্তু-লক্ষণ দিয়াই মধুসূদনের ও গিরিশ ঘোষের এই দুইটি গানের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হইবে,—আমার বা তোমার কোন্টা কতটুকু ভাল-লাগে, বা না-লাগে, তার দ্বারা এ বিচার হইবে না। এই বস্তু-লক্ষণ দিয়া বিচার করিতে গেলেই দেখি, মধুসূদনের গানে এই সত্য, প্রকৃত অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি একেবারেই নাই; আর গিরিশ ঘোষের গানে তাহা পুরানাতায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মধুসূদন বৈষ্ণব কবিদের অভিসারের কথা পড়িয়া তার একটা স্বকপোলকল্পিত মানস-ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, ললিত শব্দ যোজনা করিয়া সেই ছবিটাই এখানে প্রকট করিতে গিয়াছেন। আর গিরিশ ঘোষের এ-সকল কেবল পড়া-কথা নয়,—পুতাক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। স্মৃতরাং তাঁর গানে যে শক্তি, যে সত্য, যে সৌন্দর্য্য, যে রস ফুটিয়াছে, মধুসূদনের গীতিতে তাহা ফোটে নাই।

“নাচিছে কদম্বনূলে      বাজায় মুরলী রে।  
রাধিকারমণ।”

ইহাতে মধুসূদনের যে এ বস্তুর পুতাক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, ইহা প্রমাণ করে। রাধান-বালকেরা গ্রামের মাঠের প্রান্তে গাছতলায় বাঁশী বাজাইয়া নাচে, মধুসূদন ইহাই দেখিয়া-ছিলেন। তারা যে বাঁশী বাজাইয়া পুনরুজ্জীবনকে আহ্বান করে না, এ কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা-বিরহে অধীর হইয়া রাধিকাকে ডাকিয়া ডাকিয়া বাঁশী বাজাইতেন; আর রাধিকা আগিতেছেন কি না, তাই ভাবিতেন, কাণ পাতিয়া তাঁর নুপুরধ্বনি শোনা যায় কি না, অনুকূল বায়ু সে অঙ্গ-গন্ধ বহন করে কি



না,—বাঁশী বাজাইতেন আর তাই নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বাধা-  
নামে গাধা বাঁশী বাজাইতেন, আর গব্বেব্রিয়াকে কেন্দ্রীভূত করিয়া শ্রীরাধিকা আগিতেছেন  
কি না, তাই দেখিতেন। এ বাঁশী বাজে ধ্যানে, যোগে, সমাধিতে। এ অবস্থার  
কোনও নায়ক বাঁশী বাজাইয়া তার তালে তালে নাচে না।

“নাচিছে কদম্বনুলে, বাজায়ের নুরলী রে!”—

শুনিলেই রাধিকারমণকে মনে পড়ে না,—মনে পড়ে এক সাঁওতাল যুবককে, যে  
এককালে আমাদের উঠানে আসিয়া বাঁশী বাজাইয়া নাচিত। এক ‘নাচিছে’ কথায়,  
মধুসূদন সব নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পাখীর কুঞ্জ-দ্বারে নাচিয়া নাচিয়া আপনার  
পুণরীকে ডাকে। কপোতী সন্ধ্যাকালে আপনার খোপের দরজায় নাচিয়া নাচিয়া  
আপনার সঙ্গীকে ডাকিয়া আনে। এ সকল সত্য। কিন্তু মানুষ ডাকে, নাচে না।  
সে ডাকে আর ধোয়ায়, ধোয়ায় আর ডাকে। ধ্যান নৃত্যের বিরোধী। কিন্তু আমি  
যখন ব্রজাঙ্গনা পড়ি, তখন এ সকল ভাবি না। আমি দেখি তার সুর। আমি দেখি  
তার শব্দ-সম্পদ। আমি দেখি তার ছন্দ। আমি মজিয়া যাই তার অপূর্ব স্বাক্ষারে।  
এই স্বাক্ষারটি বড় মিষ্ট। তারই জন্য ব্রজাঙ্গনাকে এমন মিষ্ট বলি। তুমি খোঁজ শব্দ  
নয়, অর্থ। তুমি চাও ছন্দ নয়, রস। এই জন্যই আমার যাহা মিষ্ট লাগে, তোমার  
তাহা তেমন মিষ্ট লাগে না।

তবে এ নীমাংসার একটা পথ হয়, যদি কবিতার ভাল-মন্দের বিচারটা তোমার  
রসের রাজ্যে যাইয়া হইবে, না আমার স্বাক্ষরের রাজ্যে আসিয়া হইবে,—এই কথাটা  
একবার দৃষ্টিতে মিলিয়া ঠিক করিয়া লইতে পারি।

[ নারায়ণ, ১৩২২ ]

## বাঙ্গলার গীতিকবিতা

চিত্তরঞ্জন দাশ

বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই  
সত্য, যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত  
সহস্র পরিবর্তন, আবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে।  
সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, বর্ণে, কর্ণে, অজ্ঞানে, অধর্মে, স্বাধীনতায়,  
পরাদীনতায়, সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে  
যে বাঙ্গলার প্রাণ,—বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গলার



চেউখেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধু-গন্ধ-বহ মুকুলিত আমুকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ-ধূনা-জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটার-প্রাঙ্গণ, বাঙ্গলার নদ-নদী, ধান-বিল, বাঙ্গলার মাঠ, বাঙ্গলার ঘাট, তালগাছ-ঘেরা বাঙ্গলার পুকুরিণী, পূজার ফুলে ভরী গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার তুলসীপত্র, বাঙ্গলার গন্ধাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগরতরঙ্গে চরণ-বিধোত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গলার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী-সঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গলার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ! এই সবই যে সেই প্রাণ-ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে।

সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল এক অপূর্ব অসংখ্যদল পদ্যের মত বাঙ্গলার গীতিকাব্য! কিন্তু ফুল ত একদিনে ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যিক। তাহার পুতোক দলের মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা, অনেক কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের অনেক স্মৃতি, অনেক মধু জড়াইয়া থাকে। তাহার উঁটায় যে জন্ম-জন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে। ফুল যে অনন্তকাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে।

বাঙ্গলার গীতিকাব্য যে কখন কোন্ আদিম উদ্যায় ফুটিতে আরম্ভ করিল, আমি জানি না। শুনিয়াছি, সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত পুরাতন বৌদ্ধ দৌহার্য তাহার উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডিদাসের সময়ে সেই গীতিকাব্যের বিকশিত অবস্থা। কিন্তু তার আগে অনেক গীতিকাব্য না লেখা হইয়া থাকিলে একরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। আজকাল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস-সন্ধানে অনেক অনুসন্ধান, অনেক আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। আশা করি, একদিন আমরা আমাদের গীতিকাব্যের এই হারান ধারাকে ধুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব।

চণ্ডিদাসের লিখিত যে গীতিকাব্য, ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্য। এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। বাঙ্গলা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, রূপে রূপে এ বিচিত্র ভুবন ভরিয়া আছে। কত কাল, কত যুগ, কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার বাঙ্গলা জাগিয়া দেখিল, উজ্জ্বল অনন্ত নীল, নীলের পর নীল, অঞ্চল-ধারে কল-কল্লোলে গঙ্গা বহিয়া যায়, চরণতলে কলহাস্যময় মহাসমুদ্র অনন্ত সুরে গাইয়া উঠিয়াছে,—তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে; শিরে হিমালয় কাহার ধ্যানে নিমগ্ন। বাঙ্গলা দেখিল, তাহার আশে পাশে এত রূপ, এত সুর, এত গান,—মন-প্রাণ বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠিল। ভরা মনে, ভরা প্রাণে ব্যাকুল হইয়া গুনিল, প্রাণের ভিতর কাহার সাড়া, কাহার আকুল আহ্বান! তখন বাঙ্গালীর কবি গাইয়া উঠিল,—

“ কাণের ভিতর দিয়া মরনে পশিল গো  
আকুল করিল মোর প্রাণ ”



বাঙ্গলা তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়া দেখিল, কত মণি, কত মাণিক্য তাহার সেই আঁধার প্রাণের পরতে-পরতে আলোক বিকিরণ করিতেছে। ভাবিল, আমার প্রাণে কে আছে, কি আছে? কে আমাকে বাহির হইতে রূপে, রসে, গানে, গন্ধে জড়াইয়া-জড়াইয়া আকুল করে, আবার অন্তরের অন্তরে আসিয়া এমন করিয়া স্পর্শ করে? কাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই? কে বিনা চেষ্টায় আপনা-আপনি এমন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠে? বাঙ্গলা প্রাণে-প্রাণে বুঝিল, এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব মিলন। এই মিলন উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, অনন্ত সাগর দূরে যেখানে দিক্‌চক্রবালের পরিধি-পারে মিলিয়াছে, সেখানে শুধু এক রেখার মত সরল, শান্ত, নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই, মিশিয়াও মিশে নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ। আবার ফিরিয়া দেখিল, ধরণী মহাকাশকে চুম্বন করিতেছে, চলিয়া পড়িয়া বলিতেছে, “হে আকাশ, আমাকে লও, আমি যে তোমারই।” আকাশও ধরণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছে, বলিতেছে, “এস, এস, আমি ত তোমারই।” দেখিল, সে এক মহামিলন। বুঝিল, জন্মো-জন্মো, সকলই সার্থক। জন্ম সার্থক! মৃত্যু সার্থক! দেহ সার্থক! পুণ্য সার্থক! আত্মা সার্থক। এই মহামিলন সার্থক! বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইচ্ছিয়া দিয়া যাহা পুথন ধরা যায়, তাহা শুধু বহিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যকের, প্রত্যেক ভাবেরই একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া-মিশিয়া এক। তাহারই নাম বস্তু। জীবন এই মহামিলন-মন্দির। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা, কত না রসের মেলা;—আমরা যে তিলে-তিলে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙ্গলার কবি তখন চামর চুলাইতে চুলাইতে গাইলেন,—

“নব রে নব নিতুই নব,  
যখনি হেরি তখনি নব।”

আদিম যুগ হইতে বাঙ্গলার বুকে অনেক আশা, অনেক ভাব আপনা-আপনি জমাট বাঁধিতেছিল। সে যে হৃদয়ের মাঝে, জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, কাহার খোঁজ করিতেছিল, মিলন-পরশের জন্য আকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মনের ভিতর ডুবিয়া ডুবিয়া যেই দেখিতে পাইল, আর সে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন কবি গাইয়া উঠিলেন,—

“হৃদয়ে আছিল বেকত হইল  
দেখিতে পাইনু সে”

হৃদয়ের মাঝে যে ভাব আপনা-আপনি ফুটিতেছিল, সে যেন মুক্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সে রূপ কেমন? যেন,—

“চরণ-কমলে ভ্রমরা দোলয়ে  
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক”



তাহাকে দেখিয়া কবি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, শুধু অন্তরের ভিতর মরনের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া দেখিতেছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিতে পাইলেন—তাহার সেই মানস-পুতিমা, জীবন-পুতিমা—

“চম্পক-বরণী, হরিণ-নয়নী \* \* \*  
চলে নীল সাড়ী নিদ্রাড়ি নিদ্রাড়ি  
পর্যাপ্ত সহিত মোর।”

ইহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার পুণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্মেের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কর্ণের সঙ্গে, ধর্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে, বাহিরের ও ভিতরের এমনই পুণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক, আর নাই জানুক, বুঝুক, আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গলার পুণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে।, সেই মহামিলন-মন্দিরে পূজা যে নিয়ত চলিতেছে; বাঙ্গলার গান, তাহার আরাত্রিক—বাঙ্গলার ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গলার কবি চণ্ডিদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।

বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের অঙ্গনে এই গীতিকাব্য লইয়া আজকাল এক পুকার মল্লযুদ্ধ বাধিয়াছে। নানাপুকার তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি, ঘেম, ঈর্ষ্যা জাগিয়াছে। আজ দেখিতেছি, যে প্রাণের অনুভূতি লইয়া চণ্ডিদাস পুতুতি কবির গান গাইয়াছিলেন, সে ধারা, সে প্রাণের মতন, মনের মতন, সে “বিবামুতে একত্র করিয়া” পুণরুদ্ধে সে বংশী আর যেন ফুকারিয়া উঠে না। কাব্য লইয়া, কবিতা লইয়া, সাহিত্য লইয়া, রস-সৃষ্টি লইয়া, নানা বিশ্লেষণ, কঠোর অনুশাসন, ধর্ম ও নীতির দোহাই, আদর্শের বড়াই, স্বজাতীয়তা ও বিজাতীয়তা, নিকৃতির ওজনে তোল করিয়া, কষ্টিপাথরে খাদ কত পড়ে, এই যাচাই, বাছাই, ঝাড়াই করিতেই দিন গত হয়, কিন্তু—

“দিন গত নহে শ্যাম, তব চরণে এ দিন গত”

সে সুরের, সে সৃষ্টির, সে জাগরণের, সে মিলনের কথা নাই, সে কথা বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে বংশীর ধ্বনি আর শুনিতে পাই না—

“সিঁদু নিকটে যদি কষ্ট শুখায়ব  
কে দূর করব পিয়াসা”

আমাদের ঠিক সেই অবস্থা।

আজ এই সাহিত্যের পুণে দাঁড়াইয়া সেই তর্ক, মীমাংসা, যুক্তি, এই ভাব-নৈন্যের কারণ বুঝাইতে হইলে, আমি যে খুব ভাল করিয়া তাহার ঠিক মীমাংসা, ভাষা ও টীকা-টিপ্পনীর সহিত দেখাইতে পারিব, এমন হয় ত না-ও হইতে পারে; তবে বাঙ্গলা কবিতার পুণ ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ যে কি, তাহা বোধ হয়, বলিবার সময় আসিয়াছে। তাই আজ এই সমবেত সাহিত্যের দরবারে আমি সেই সকল কথাই বলিতে চাই, কোন্ পথে যাইলে হৃদয়-উৎসের বেধা মিলিবে, তাহারই খোঁজ করিব।

এখন কথা হইতেছে—কাব্য কি? গীতিকবিতা কি? সাহিত্য কি?



সাহিত্যের আদর্শই বা কি? ফুল যেমন তাহার ভরা-রূপের ডালি লইয়া একদিনে ফুটিয়া উঠে না, তেমনি আদর্শ ও একদিনে, এক মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আসে না। অনন্ত কালের যে অনাহত সঙ্গীতের আশ্রয় চলিয়াছে, সেই আশ্রয়ের টানে ফুল আপনার সেই বিরাগ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতির অক্ষুণ্ণ ধারার ভিতর দিয়া গৌরবে-সৌরভে আপনার আত্মবিকাশ করে। বিকাশই যে জীবনের ধর্ম:—রূপে-রূপে বিকাশ, শতক যুগের ফুল শত জন্ম ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব-সাগরের প্রতি ঢেউ উঠিয়া, দুনিয়া, আপনার ইচ্ছায় খেলিয়া, আবার সাগরে মিলাইয়া যায়। জীবনের ধর্ম ও বিকাশের ধর্মই তাই। অনন্তকাল হইতে তাহা আছে, অনন্তকালই থাকিবে, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

“ নারীর জন্ম                      না ছিল যখন,  
তখন করেছি চাম।  
দিবস-রজনী                      না ছিল যখন,  
তখন গণেছি মাস।”

সিতাসিত কালপক্ষ, দিবস রজনী, সবই ছিল, সবই আছে, সবই তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

পুথম কথা, গীতিকবিতার জন্ম কোথায়, কবিতা কি? সাধারণতঃ সোজা কথায় হয় ত বলিতে পারা যায় যে, ছন্দোবদ্ধ সুর-তালে বাঁধা কথাই কবিতা। সমাজ-বিজ্ঞানবিদ তাহার এক সামাজিক তত্ত্ব বাহির করিতে চান, মনস্তত্ত্ববিদ তাহার মানসিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু কব-কলার শ্রুতি যে কবি, সে তাহার হৃদয়-মাঝারে যে স্বচ্ছ দর্পণখানি আছে, সেইখানে নগন ডুবাওয়া দেখে, সে উৎস কোথায়! পুথম যুগে আদিম মানব যখন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাস করিত, গাছের ডাল ভাঙিয়া তৃণ দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া ধরিয়া, কুটীর রচনা করিয়া, আপনাদের থাকিবার মত আশ্রয় করিয়া লইত; তখন হইতেই তাহাদের ভিতরে একটা সামাজিক ভাব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। তখন তাহাদের শিক্ষা, অনুশীলন, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহারের ধারা, সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বভাবের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিত। সেই স্বভাব-জাত সংস্কার, জ্ঞানে পরিণত হইবার পথে, স্বাভাবিক স্বপ্ন, দুঃখ, ভাব, অভাব যেমন জাগিত, তেমনি মিলিয়া-মিশিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিত। পুণিমা-রজনীতে যখন জ্যোৎস্নার অনাবিল ধারায় ধরিত্রীকে স্নাত দেখিত, বিহগ-বিহগীর মধুর স্বরলহরী শুনিত, নির্ঝরনের জল-ধারায় আলোড়িত উপলব্ধের ভাষা শুনিত, তাহারা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিত, গান করিত, আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ কত ভাবের ও সুরের প্রকাশ করিত। পাখীর সমবেত কলরবোবিত গানের মত তাহাদেরও ভাষা ফুটিত, সেই পুথম গান, সেই পুথম প্রাণের আবেগ, সেই মানবের পুথম রসানুভূতি, ইহাই সমাজ-বিজ্ঞান-বিদের বিশদ কথা।



দিন গেল, স্বভাব অভ্যাসে দাঁড়াইল, পরস্পর পরস্পরের অনুভূতির দ্বারা নানারূপে ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দশ জনে মিলিয়া যে নৃত্য-গীত চলিত, তাহা ক্রমে অন্যান্যরূপ আকার লইয়া অন্য আবেগের দ্বারায় নূতন রকমের স্রষ্টি হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষের সহজাত সংস্কার-বশে যুগলে মিলিতে লাগিল। তখন সেই দুইয়ের ভিতরে আদান-প্রদান, ভাব-অভাব, মিলন ও বিরহের পাওয়া ও না-পাওয়ার রস উপচিৎ হইল। গানের দ্বারাও নূতন হইল, এমনি করিয়া কবিতার জন্ম। তুমি আমি, আমি তুমি, হাসি-কান্নার বিলাস।

মনস্তত্ত্ববিদ বলেন যে, সেই সময়ে যত রকমের মানুষের মনে, যত রকমের সহজাত সংস্কারের খেলা হইতে লাগিল, তত রকমেই তাহার ভাব ও আকারে পরস্পর আপেক্ষিক পরিবর্তন হইতে লাগিল। প্রত্যেক পরিবর্তনই এক এক পৃথক্ ভাবের প্রকাশ, প্রত্যেক সেই প্রকাশের সঙ্গে সুরের ও ভাষার স্ফুর্তি হইতে লাগিল। যেখানে যেমন ভাবটি ভিতরে ছিল, তেমনটিই বাহিরের আকার লইয়া প্রকাশ পায়। না-পাওয়ার জন্য যে ক্রন্দন, সেই ক্রন্দনে এক অপূর্ব সুর উঠে, সেই সুর গানে পরিণত হয়। জীবন ও মৃত্যু, শোক ও আনন্দই সেই সংস্কার-যুগের বিশেষ লক্ষণ।

তারপর, দিন গেল, নানারূপে তাহা পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে লাগিল। শীত কাটিয়া গেলে যেমন বসন্ত আসে, আদিম যুগের সে ছড়তা কাটিয়া গেলে, তেমন জীবনের সরসতা আসিল। বিচিত্র রসানুভূতিতে মানব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কাদিত, দেহের স্বাভাবিক অভাবে; ক্রমে তাহার ভিতরে মনের ভাবভাব জাগিল, রূপ-তৃষ্ণা আসিল, ভালবাসিতে শিখিল, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে লাগিল।

কিন্তু কল্পকলার যে গুণ্টা,—যে কবি,—সে তাহার অনুভূতির ভিতর দিয়া বলিবে, এ যে লীলা! আনন্দধন-রসাধার মায়াবীশ এমনি করিয়া রসভোগ-লীলা যুগে যুগে করেন। পাখীর বুকের ভিতরেও তিনি গান, সমীর-হিল্লোলেও তিনিই তান, জলের বৃকে যে আলোকের নৃত্য, সেও যে সেই নিত্য সত্য রংরাজের রংএর খেলা। তাহার ত আদি অন্ত নাই। কেবল ফুটাইয়া ফুটাইয়া রূপে রূপে বিলাস করিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া জীবনের চিদানন্দধন-রস পান করিতেছেন; বিশ্বপ্রকৃতিও সেই রস পান করিতেছে। স্রষ্টির আদি অন্ত কে খুঁজিয়া দিবে? আগে পরে কে বলিবে? ছোট বড় বিচার, করিবে কে?

এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। প্রত্যেক পা-ফেলা ও প্রত্যেক পা-ফেলার দাগটি। মনস্তত্ত্ববিদ বলেন, এই রূপ-তৃষ্ণা-স্বভাব, স্রষ্টি-রক্ষার জন্য মিলিবার পন্থা। কল্পকলার গুণ্টা বলে, এ তৃষা নয়, এ স্ফুর্তি, রূপের ভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে ফুটাইবার, খেলা করিবার, লীলার মাধুর্য। মাটি ফাটিয়া তৃণ তাহার শ্যামসুন্দর কোমলতা বিছাইয়া দেয়, ফুল ফোটে, পাখী গায়, আকাশে মেঘ-রৌদ্রের রঙের পর রং ঝলকিয়া যায়, এ সবই আপনিই হয়; সে 'আপনি' সেই



আমি যে মিলনের কথা বলিয়াছি, যিনি যথার্থ কবি, সত্যদ্রষ্টা, তিনি সেই মিলনের উদ্দেশ্যেই বিভোর হইয়া আছেন।



যেমন বিশুপুষ্টির সকল স্রষ্টি, কল্পকলা-স্রষ্টিও ঠিক সেইরূপ। কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া সৃষ্ট। এই মহাকল্পের বিলাস করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সেই একই বিলাস-লীলা সাধন করিতেছি। এই যে সাম্য, এই যে সমদর্শন, ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। এই সাধনার ধারায় মানুষ জীবনমুক্ত। কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপপুণ্যের বিচার তাঁহার নাই, পাপও সত্য, পুণ্যও সত্য, তাগের বিরাট ভাবও তাঁহার কাছে যেমন স্মর, সংসারের স্বাথ পরতার খেলাও তাঁহার কাছে তেননি মধুর। সবই তাঁহার কেন্দ্র, সব কেন্দ্র হইতেই সকলকে এ সমদর্শনের চক্ষু দিয়া দেখিবার ও অনুভব করিবার সাধন তাঁহার প্রাণে বস্ত্রিয়া আছে। তিনি সেই সাধনা, সেই সমদর্শনের প্রেম-রাগিণীতে সকলকে মোহিত করেন, নিজেও সেই সুখ পান করেন, সেই লীলার সহচর হইয়া রহেন, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

“রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে  
যুচিবে মনের ধাম।  
কহে চণ্ডিদাস পুরিবেক আশ  
তবে ত খাইবে সুখ।”

এই বিশু-স্রষ্টির রস-মাদুর্য উপভোগ জীবনের চরম। নিজে আনন্দ হইয়া এই বিশু-আনন্দের সহিত একান্ত যোগই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। এই মানব-প্রাণের অন্তর-ভূমির সহিত বিশু-প্রাণের যে মিলন-ভূমির অপকল্প দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় মহা-মিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম, বিশেষণে কোন নূতন সম্পদ গড়িয়া উঠে না। বিশেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না, বিশেষণ ভাঙিতে পারে, স্রষ্টি করিতে পারে না। বিশেষণ আমাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া, সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একান্তবোধে অসহায় করিয়া তোলে,—একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র, সেই সর্বস্বধন। সেই প্রেমের দেবতা, পরিপূর্ণ, সর্বল, সহজ, সরল সোহাগ ও আবেগে সকলকেই বুকের ভিতর টানিয়া লন, তিনি এই সারা বিশুর, এ বিশু তাঁহার! কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌঁছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির ‘মণি-কোটা’র মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতিকবিতা সেই প্রাণের সে অতলস্পর্শ রূপ-সাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে।

এইবার কবিতার ভাষা ও রীতির কথা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, “হেঁদো কথায় ভুল না”—তাঁহার মানে ত সকলেই বুঝেন। কবিতার ছন্দ, তাল, সুর থাকিলেই যে তাহার মধ্যে সেই চিন্তামণির গান্ধার্যকার মিলিবে, এমন ত নহেই, বরং অনেক সময়ে সেই মিলনের অন্তরায়। এইজন্যই যেখানে ভাবের দৈন্য, সেখানেই উপমার প্রাচুর্য। পরিকার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় না হইয়া



সাহায্য করে, কথাও ঠিক তেমনি ভাবে জমাইয়া তুলে। কাচ যদি অপরিষ্কার হয়, চোখে ঝাপসা ঠেকে। ভাষাও তেমনি। কোন সুন্দরভাবই সুন্দর আকার না লইয়া ব্যক্ত হয় নাই। ফুলের দেহ হইতে যেমন তাহার রং ও তাহার আকার, যে যে স্থানে তাহার সেই সুন্দর সুবাস ভরিয়া রাখে, তাহাকে বিচিহ্ন করা যায় না, সেই ফুলকে নষ্ট না করিলে তাহার সুগন্ধটুকু আলাদা করা যায় না, তেমনি ভাবও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাষাও ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুভৌল, নিখুঁত, সুন্দর, সহজ। তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না। অলঙ্কার সৌন্দর্য্যকে বাড়াইবার জন্য; অলঙ্কার দিয়া সৌন্দর্য্যকে বাড়াইলে তাহাকে খর্ব্ব করা হয়, তাহার রূপের অনন্ত সত্যকে অস্বীকার করা হয়। ভাষা-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ছন্দ-সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বটে। কবিতা ও গানে কিছু পুভেদ আছে। গানে যখন আমরা নিজেদের ব্যক্ত করি, তখন স্বরই আমাদের প্রধান সহায়, কথা ভাবানুযায়ী উপলক্ষ্য মাত্র। পর্ব্বতের গায়ে ঘাত-প্ৰতিঘাতে ঝরনা যেমন বিচিত্র ধ্বনিতে গিরি-গহন মুখরিত করিয়া আপনার পথ আপনি কাটিয়া অবাধে বহিয়া যায়, গানও তেমনি আপনার পথ আপনি কাটিয়া স্বরের ভিতর দিয়া পরম চরমে মিলাইয়া যায়। এ জীবন অনু হইতে অনীরাণ্, মহৎ হইতেও মহীরাণ্; জীবন ও মৃত্যু একই স্বরের খেলা। আন্তরিকতা সেই জীবন ও মৃত্যুর বন্ধনী, আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্ৰাণ—প্ৰাণের অন্তরতম অনন্ত পাবক-শিখা। মানব-জীবন সেই শিখার অনন্ত জাগৃত মুক্তি, ভাব ও ভাষা তাহার রং ও রঙের মিলন-মাধুর্য্য।

তাহার পর আর একটি কথা, তাহাকে বলে রূপান্তর। এই যে স্বাভাবিক মনের বিকাশ, তাহাকে ভাগবত-সত্যে তুলিয়া ধরা। সেই রূপান্তরই বস্ত ও ভাবের সমন্বয়। বস্তুর অন্তরের যে রূপ, তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়া তাহাকে সেই রূপচিন্তামণির অচিন্ত্য-বৈতাত্মিকতার মধ্যে টানিয়া তোলাই কলকলার শেষ রঙের খেলা। এই যে দেহ মন, এই যে ইন্দ্রিয়, তাহার অন্তরঙ্গ ভাবের সহিত সাক্ষাৎ ও সহজ করিয়া দেওয়ার নামই রূপান্তর। এই রূপান্তর দেখাইতে পারিলেই ভোগের মধ্যে ত্যাগ আপনি ফুটিয়া উঠে। ত্যাগের মধ্যে আনন্দ আপনিই উছলিয়া উঠে। সকল জিনিষকেই এই অনন্তের দিক্ হইতে দেখিলেই এই রূপান্তরে পৌছান সহজ হয়। শিল্পের সাধনা করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মুহূর্ত আসে, সেই অনন্ত মুহূর্তে এই রূপ-রাগভরা শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী-পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ঝলসিয়া উঠে, যাঁহাকে চাই, তাঁহারই সাক্ষাৎকার। সেই শুভ-মুহূর্তের জন্যই সকল কলকলাবিদের সাধন। সেই শুভ-মুহূর্তেই সকল স্রষ্টি সুন্দর, মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়া উঠে।

সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশেষ আত্মা জাগৃত 'মুখরিত' বিকশিত, সৌন্দর্য্য-লীলায় লীলায়িত। প্রকৃতি ও মানব উভয়ের ভিতরই বিশুদ্ধতার সমান খেলা। সকল



জীব, বৃক্ষ, লতা, পাতা, অণু, পরমাণু, সকলই প্রকৃতির মধ্যো। সাধনার পথে সাধক  
বিশ্বের দর্পণে তাহার নিজের মুখের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্য রূপ প্রকটিত  
হয়। সে দেখে, তাহার সম্মুখে এক নূতন জগৎ,—সেই জগতের ও তাহার এক  
নাড়ী,—তাহার এক বিরাট হৃদয়। সেই বিরাট হৃৎপিণ্ড এই বিরাট প্রাণ-সমষ্টিকে  
বক্ষে করিয়া কালের তিতর দিয়া অকালে ধাইতেছে। তখন তাহার মন সেই বিরাটের  
রূপের সঙ্গে মজিয়া এক অভিনব রূপান্তর সৃষ্টি করে। সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে  
সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহামিলনের অনাহত সঙ্গীত শ্রবণিয়া উঠে। বাঙ্গলার  
গীতিকবিতায় আমি তাহারি সন্ধান পাইয়াছি।

[১৩২৩]

## আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে “মা”

জিতেন্দ্রনাথ বসু

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যে ভাবতরঙ্গ বঙ্কের আদি কবি চণ্ডিদাস অবতারণা  
করিয়াছিলেন, তাহা যদি অবাধে বহিয়া যাইত তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্য এতদিনে কান্ত-  
ভাবেই ডুবিয়া যাইত। বাঙ্গালী না হইলেও বিদ্যাপতির পুতাবও বঙ্গসাহিত্যের উপর  
সামান্য নহে। এই দুইজন কবির পুতাবে বৈষ্ণব-কাব্য-সাহিত্যের উৎপত্তি।  
তাই বৈষ্ণব-সাহিত্যে মধুর রসেরই প্রাবল্য। কিন্তু বৈষ্ণবী সাধনায় মধুর রসের  
স্থান যতই উচ্চ হউক, উহা পাইতে হইলে স্তরে স্তরে উঠিয়া যাইতে হয়, ক্রমাতিব্যক্তি  
এ সাধনারও মূল ভিত্তি—এই তত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য নদীয়ার শ্রীগৌরানন্দ অবতীর্ণ  
হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে বাৎসল্যরসের সাধনা কত উপাদেয়।  
এই জন্য চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের কাছে আমরা বাৎসল্য রসের ছবি পাইয়াছি।  
তাহারা পুনর্বার চিত্রে মা যশোদার মূর্তি চিত্রিত করিয়াছেন—শচী-মার অমর চিত্র  
আঁকিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর বঙ্গসাহিত্যে যে কয়খানি পুণ্ডিক  
কাব্য-গ্রন্থ দেখিতে পাই, সেগুলির মধ্যেও মাতৃমুক্তি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। শৈব  
কাব্যগুলিতে গিরিরানী ও গিরিনন্দিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া যে মাতৃস্নেহের বাৎসল্য-  
রসের প্রসঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা চিরকাল বাঙ্গালীর হৃদয় স্পর্শ করিবে। মুকুন্দরামের  
চণ্ডীকাব্যেও এই চিত্র বেশ মনোরমভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তারপর বাঙ্গালী চরিত্রে  
যেমন যেমন পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, তেননি মাতৃচিত্রগুলিও পরিবর্তিত, বিকৃত  
হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের যেখানে শেষ বলিয়া ধরা যাইতে পারে,



সেখান পর্য্যন্ত মাতৃচিত্র সুপরিষ্কৃত। কারণ, আমাদের চরিত্রে যতই অবনতি ঘটনা থাকুক, আমরা মায়ের আসন টলাইতে তখনও শিথি নাই। আমাদের গার্হস্থ্যের মূলে মা, আমাদের সমাজের মূলে মা। বহুদিন পূর্বে—জানি না, কোন্ যুগে—ভগবান্ রামচন্দ্র শ্রীমুখে বলিয়া গিয়াছেন, “জননী জন্মভূমিঞ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।”—আমরা সেই দেববাণী শুধু কথায় কথায় পর্য্যবসিত করিয়া রাখি নাই, জননীর সম্বন্ধে তাহা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিয়াই আসিয়াছিলাম। ভারতীয় সাহিত্যে তাই মার আদর চিরকাল অকুণ্ঠই ছিল। আদি-কবি বাণ্যীকি, কবি-গুরু বেদব্যাস, এত উজ্জ্বল-ভাবে মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন যে, সে চিত্রের অপলাপ এখনও আমরা করিতে পারি নাই।

বঙ্গের প্রাচীন কবিকুল তাঁহাদের-কাব্যে দেবচরিত্র-ব্যপদেশেও গৃহচিত্র, সমাজচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব গৃহে ও সমাজে মার যে স্থান ছিল, তাহা আমরা তাঁহাদের কাব্য হইতে জানিতে ও বুঝিতে পারি। আরও বুঝিতে পারি যে বাঙ্গালীর অবস্থান্তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী যে রসপানে পরিপুষ্ট, তাহারও কেনন অবস্থান্তর হইয়া পড়িতেছিল। বাঙ্গালীর জীবন তাহার জননী-জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য, অপরিহার্য্যভাবে জড়িত ছিল। ভারতে, এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, মার যে পরিমাণে ও যে ভাবে আদর ছিল, ততটা অন্য কোনও দেশে থাকিতে পারে নাই, তাহার কারণ আমাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী “মা”। অন্যান্য পরিবারবর্গ সকলেই মার আজ্ঞাধীন অনুগ্রহজীবী বলিলেও অতুলি হয় না। এখনও বাঙ্গালী যখন বিবাহ করিতে যায়, তখন মাকে বলিয়া যায় যে তাঁহার দাসী আনিতে যাইতেছে। একানুবর্তী পরিবারে মার পুত্রের ভারতবাসী যতটা বুঝিতে পারে, ততটা অন্য দেশের লোকের বুঝিবার উপায় নাই। ভারতের সাহিত্যে মার কল্পনা মাতৃমুষ্টি—এই কল্পনার বলেই ভারতবাসী ভগবানে মাতৃত্বের আরোপ করিয়া নিজেকে ও জগৎকে বন্য করিতে পারিয়াছে। এ কল্পনা জগতে আর কোথাও দেখা যায় না। বিশুমাতাকে লইয়া ভারতের ধর্ম্মে যে নূতন নূতন ভাবুকতার স্রষ্টি হইয়াছে, তাহা স্বরা ভারতের পুরাণ ও সাহিত্য চিরকালের জন্য সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ভগবানের মাতৃত্বের বড়ই আদর, ভক্তের মাতৃনাম-গানে বঙ্গসাহিত্য তাহার এক অংশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি মাতৃভক্ত সন্তানেরা তাঁহাদের পারমার্থিক সঙ্গীতে যে তান তুলিয়াছেন, তাহাতে কেবল ধর্ম্মসাহিত্যই যে পুষ্ট হইয়াছে তাহা নহে; ঐ সকলে যে স্নেহ, যে আবদার ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে ঐ গুলিতে বঙ্গসমাজে মা ও ছেলের মধ্যে কি নিবিড় সম্পর্কই ছিল। না যে কি বস্তু তাহা আমরা তখন বুঝিতাম; কাজেই তখনকার গানে, ভাবে, কাব্যে মার যথেষ্ট পুত্র।

কিন্তু যখন ইউরোপীয় সাহিত্যের পুত্রের বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল, তখন পূর্ব্বে তাহা অল্পে অল্পে সরিয়া দাঁড়াইল; সমাজে একটা বিপ্লব সূচিত হইল।



ইংরাজী-শিক্ষিত নব্যসমাজ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারকে ধর্ম বলিয়া বরণ করিলেন; তখন তাঁহাদের মানসিক অবস্থা যে কি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার “একাল ও সেকাল” গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। এই দলের প্রায় সকলেই কালাপাহাড়ের মত দেশের সকল বস্তুর মূর্তি ভাঙিয়া ধূলিসাৎ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। দেশের যা কিছু বরণ্য বা আদরণীয় ছিল তাহা উপেক্ষিত হইতে লাগিল—ধর্ম গেল, ভাব গেল, সাহিত্য গেল, আদর্শ গেল, স্বয়ং ভগবান্ উড়িয়া গেলেন। ইতিহাসে দেখা যায়, যখন একটা দেশে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তখন সেই দেশে কতকগুলি শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়, তাঁহারা এই বিপ্লবের কর্ণধার-স্বরূপ হইয়া যোগ্যতমের উত্তর-সূত্রে ঐ জীবন-সংগ্রাম প্রবর্তিত করেন। ভারতের মধ্যে ঐ সংগ্রাম আরম্ভ হয় বঙ্গদেশে—তাই বঙ্গদেশে সে সময়ে কতকগুলি শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে এই শক্তিশালী পুরুষগণের অগ্রণী মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইনিই প্রথমে ইউরোপীয় আদর্শে বঙ্গসাহিত্য-রচনার সূত্রপাত করেন, কালিদাসকে ছাড়াইয়া হোমরকে অনুকরণ করেন, দেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে “Barren rascals” নামে অভিহিত করিয়া, Dr. বিশুনাথকে বর্জন করিয়া, বিলাতী আদর্শে নাটক প্রণয়ন করেন, গ্রীকপুরাণ হইতে বিষয় সংগ্রহ করেন, এবং মিল্টনের অনুকরণ করিতে গিয়া পাপী ও অসংযতচরিত্র রাবণকে কাব্যের নায়ক করিয়া দেশের মহান স্বার্থত্যাগের আদর্শ ভগবান্ রামচন্দ্রকে খর্ব করিয়া ফেলেন। তাঁহার শক্তি চলিয়াছিল বিদ্রোহের পথে—আর সে শক্তি বড় সহজ শক্তি নয়। প্রাকৃতিক নিয়মই এই যে, ঝড়াবায়ু বহিলে আকাশে দূষিত বায়ু পরিকৃত হয়—মাইকেলের দ্বারাও বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশ তাহার দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করিয়া সংশোধিত হইয়াছিল, সে কথা সকলেই জানেন। যে ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না বলিয়া রাজা রামমোহন রায় কবিতা লিখিতে বিরত হইয়াছিলেন, সেই ভারতচন্দ্রের পুত্র এই শক্তির মুখে তৃণবৎ উড়িয়া গিয়াছিল এবং বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন তেজের সৃষ্টি করিয়াছিল।

কিন্তু যেমন একদিকে আকাশ পরিকৃত হইল, তেমনি আর একদিকে মেঘ দেখা দিল। সাহিত্যে এক অনাচারের স্থানে অপর অনাচার প্রবেশ লাভ করিল। আমাদের সমাজ যতই অবনত হউক, তখনও সেখানে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার পরিবর্তে স্ব-স্ব-প্ৰধানত্বের আদর্শ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এই আদর্শ বঙ্গের একানুবর্তী পরিবারের মন্দির চূর্ণ না করিলেও, যেখানে তাহার মহত্ত্বটুকু দেবতার সম্মানে পূজিত হইত, সেই মন্দির-বেদীতে দারুণ আঘাত করিল। সমাজে যে পরিবর্তন সূচিত হইল, তাহার মূলমন্ত্র আত্মসম্প্রসারণ। আগে আত্মীয়-স্বজন পরিবারের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত, এখন হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; পূর্বের মা ছিলেন দেবী, এখন ধুব জোর গৃহিণী; তাহার অধিক সম্মান আর তাঁহার রহিল না। এ সম্মানটুকুও যেন অনুগ্রহদত্ত। যে দাবীর জোরে তিনি সে সম্মান আদায় করিয়া লইতেন এখন আর সেই জোরটুকু যেন রহিল না। ইউরোপে লোকে তো মা লইয়া সংসার শোভিত



করে না, তাহারা পত্নী লইয়া গৃহরূপ উদ্যান ভূষিত করে; তাহাদের কাছে পিতার পরিবারের চেয়ে নিজের পরিবারের আদর অনেক বেশী; অতএব সেই নব্য আদর্শের কাছে দেশীয় ভ্রাতৃগণের আদর্শটা—মাতৃদেবীর আদর্শটা—মূল হইয়া গেল।

এ রোগের রক্ষণ শুধু যে গৃহেই প্রকাশিত হইয়া ক্ষান্ত হইল, তাহা নহে; সাহিত্যেও ইহার প্রভাব দেখা দিতে আরম্ভ করিল। সাহিত্যে মাতৃচিত্র বিরল হইতে লাগিল। যেখানে বা সে চিত্র রহিল, সেখানেও তাহা অপূর্ণ চরিত্র হিসাবে। ‘মেঘনাদ বধে’ মন্দোদরীর স্থান পুমান্নার অনেক নীচে। এই হইল অনর্থের সূত্রপাত। তখন একটা নূতন সাহিত্য-গঠনের যুগ—সে যুগ অনুপ্রাণিত হইল পাশ্চাত্য ভাবে। ঈশুর গুপ্তের মিঠেকড়া চাবুক বড় কিছু করিতে পারিয়াছিল, এমন মনে হয় না। ফলে বাঙ্গালীর নূতন সাহিত্যে মার আদর কমিতেই লাগিল। এ সাহিত্য মাতৃ-স্নেহের সিক্ত হইয়া পবিত্র হইল না, ইহা পত্নীপ্রেম বা ভাবী পত্নীর আকাঙ্ক্ষা লইয়া রক্তভূমে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু পত্নীপ্রেমের আদর্শ ও টলিয়াছিল, তাই এ প্রেমেও বিলাতী ছাপ পড়িল। তাই স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা লইয়া আসরে নামিলেন—“এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর” এমনি বিলাতী কায়দা লইয়া। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ বাঙ্গালায় একটা নবযুগ আনয়ন করিল সত্য, কিন্তু ইহাতে মাতৃস্নেহের চিহ্নমাত্র নাই। আরেমা ও তিলোত্তমা দুইটি চরিত্রই বিলাতী ছাঁচে ঢালা। বঙ্কিমের এক একটি পুস্তক সৌন্দর্য্যের ধনি, কলার আধার, সাহিত্য-শিল্পের সুনিপুণ অভিব্যক্তি—সে কথা একশতবার বলিব, কিন্তু সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে ইহাও বলিতে হইবে যে প্রথম প্রথম তাঁহার প্রতিভা পাশ্চাত্য আদর্শেই বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তিনি সেক্ষপীয়রেরই মত সুক্ষদৃষ্টির সহিত ভালবাসা ও রূপ-লালসার চিত্র আঁকিয়াছেন, কালিদাসের মত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যান্য অনেক মহান ভাবের লীলাও দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট এই অপূর্ণ সাহিত্য মাতৃ-চিত্র-হীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ‘দুর্গেশনন্দিনী,’ ‘কপালকুণ্ডলা,’ ‘মৃণালিনী,’ ‘চন্দ্রশেখর,’—অমর কাব্য হইলেও এ অংশে বিকলাঙ্গ। ‘কৃষ্ণকান্ত’ বা ‘বিধবৃক্ষে’ যে মাতৃ-চিত্র আছে, তাহা যেন ফুটিতে সাহস করে নাই—এত সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে যে আমরা ইহার রস উপভোগ করিতে পারি না, উপভোগ করিবার সময়ই পাই না। এই চিত্রগুলি মাতৃস্নেহের পূর্ণানুভূতিতে আনন্দের হৃদয় ভরিয়া দিতে পারে না। ‘দেবীচৌধুরাণী’তে ও পরিবর্তিত ‘ইন্দিরা’য় কবি মাতৃহৃদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রথমটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং দ্বিতীয়টি স্বেচ্ছাধীন চরিত্রের পাশে যেন নিপুত। তবু এ সময়ে বঙ্কিম বিদেশীয় প্রভাবের হাত হইতে প্রায় সম্পূর্ণ মাত্রায় নিকৃতি পাইয়াছিলেন।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র কি মাতৃহৃদয় বুঝিতেন না? মনুষ্য-হৃদয় যাহার প্রতিভার কাছে উন্মুক্ত ছিল, বিশেষতঃ যিনি স্ত্রী-হৃদয়কেই বিশেষ ভাবে বুঝিতেন, তিনি কি মা চিনিতেন না? যে কয়েকটি স্থলে তিনি মাতৃহৃদয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, সেইখানেই আমরা বুঝিয়াছি যে কবি মাতৃস্নেহের মহিমা জানিতেন। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থেই



মাতৃচিত্র একেবারে নাই, এমন কি শেষ বয়সে তিনি যে কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন ও পরিবর্তন করেন, তাহাতে দেশীয় ভাবের প্রাবল্য থাকিলেও মাতৃচিত্র নাই বা ফুটে নাই। যে কয়খানি গ্রন্থে মার কথা আছে তাহাও গৌণভাবে। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ এ গোবিন্দলালের মাতা আছেন যেন কাশী যাইবার জন্যই—অর্থাৎ গোবিন্দলাল কর্তৃক ভ্রমর-ত্যাগের উপলক্ষমাত্র হইয়া। সংসারে মা রহিয়াছেন, অথচ গোবিন্দলাল সব বিষয়ে পরামর্শ করে ভ্রমরের সঙ্গে, মার কথা ভাবেও না। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ নায়িকা-পুধান কাব্য, মাতৃ-পুধান নহে। তারপর ‘রজনী’। ‘রজনী’তে গ্রন্থ-নায়কের একটি মা আছেন কবি একথা বলিয়াছেন, কিন্তু সেই মা-টিকে কবি একেবারে লুকাইয়া ফেলিয়াছেন; তিনি রহিলেন লোকলোচনান্তরালে, রোগশয্যায়—তাহার স্থান দখল করিলেন “লবঙ্গলতা,” যুবতী বিনাতা। ‘রজনী’কে যদি একমুহূর্তের জন্যও সামাজিক উপন্যাস বলিয়া ভাবিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতাম যে ইহা একটা অনাসৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ‘রজনী’তে কবি অপূর্ব কৌশলের ও সৌন্দর্যের সাহায্যে কতকগুলি মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র; তাই সেকথা বলিতে পারিলাম না। তাহা না বলিতে পারিলেও, একথা বলিবার বাধা নাই যে ‘রজনী’তে মাতৃচিত্র খর্ব হইয়াছে। ‘বিঘ্নবৃক্ষে’ কমলমণি ধোঁকাকে লইয়া মাতৃস্নেহ একটুখানি করিয়াছে, কিন্তু সে নিতান্তই বিন্দুমাত্র। ‘দেবীচৌধুরাণী’তে প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মাতাকে লইয়া পুস্তক আরম্ভ এবং আরম্ভেই মাতা শেষ হইয়া গেলেন। বলিয়াছি যে ‘ইন্দিরার’ কবি মার গৃহিণীপনার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সে চিত্রও যেন অবাস্তব ভাবে চিত্রিত। এমন কেন হইল? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে ও যে অবস্থায় বঙ্কিম নবসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই আমাদের ম্মরণ করিতে হইবে।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মহিত দেশের জনসাধারণের বিশেষ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তখনকার সাহিত্যিকগণ জনসাধারণকে লক্ষ্যান্তর্গত করিয়া সাহিত্য রচনা করিতেন না; করিবার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন নাই। বিলাতী সমাজে মায়ের প্রতিপত্তি নাই, কাজেই বিলাতী উপন্যাসে, কাব্যে, নাটকে কোথাও মার তেমন আদর নাই। সেখানে দম্পতীকে অথবা প্রেমিক-প্রেমিকাকে অবলম্বন করিয়া সাংসারিক লীলা—তাই বিলাতী সাহিত্য নায়ক-নায়িকা-পুধান। বঙ্কিম নবযুগের নবসাহিত্য যে এই ভাববজিত হইবে তাহা আশা করা অনায়াস, কারণ কোনও কালের কোনও সাহিত্যই কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও নব্যসাহিত্যিকদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি উহা যে তাহার হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার প্রমাণের কিছুমাত্র অভাব নাই—সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, আমরা এতাবৎ যাহা বলিতেছি, তাহার কাব্যে মাতৃগৌরবের হানি। সে সময়ের সাহিত্যে এ দোষ রহিয়া গিয়াছে।





এ তো গেল বঙ্কিম যুগের কথা। এখনকার কাব্য-সাহিত্যের কথা বলিতে গেলেও এ বিষয়ে আমরা এক পুকার হতাশই হই। এখনকার যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার কাব্যসমুদ্রেও মাতৃস্নেহের চিত্র-রূপ রত্ন বড় বিরল; নাই এ কথা বলিতে পারি না। মহাত্মার তের অমৃতরাশি হইতে তিনি যখন সুধা আহরণ করিয়া দুই-এক বিন্দু আমাদের দান করিতেছিলেন, তখন আমাদের মনে আশা হইয়াছিল যে তাঁহার কাছ হইতে আমরা মাতৃমহিমা আরও বিস্তৃতভাবে শুনিতে পাইব, কিন্তু আমাদের আশা মনেই রহিয়া গেল, পূর্ণ হইল না।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান সেই সময়ই বঙ্গদেশে ভাবের অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এবং তাহা ঘটাইয়াছিল বহুল পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রেরই পুতিভা। দেশীয় ভাবের অভাবে দেশের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা বঙ্কিম বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি তাঁহার উপন্যাসে, কমলাকান্তে, লোকরহস্যে—নানা উপায়ে দেশীয় ভাব জাগ্রত করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন। আজকাল দেশে যে মাতৃস্নেহের ভাব জাগিয়াছে; তাহা তাঁহারই সেই প্রয়াসের ফল। দেশের নিত্য আদর্শ “ত্যাগ,” দেশের লোককে তিনিই শিক্ষাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনিই শিক্ষাইয়াছেন যে সুখ সংঘমে ও ত্যাগে। সে শিক্ষা পূর্ণ মাত্রায় ফলবতী হইবার সময় এখনও আসে নাই এবং তাহার আশাও সুদূরপর্যন্ত; কিন্তু তাহার কিছু ফল যে না ফলিয়াছিল তাহা বলা যায় না। ইহার প্রথম ফল উপন্যাসের আদর্শের পরিবর্তন; এ পরিবর্তনের পথ তিনিই দেখাইয়া গিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় ফল, মাতৃমুক্তির পুতি সাহিত্যিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ। এ সম্বন্ধে হাস্যরসিক ‘বাঙ্গালী চরিত’-পুণেতাও যে কতক সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। যোগ্যতমের উদ্বর্তন সকল প্রাকৃতিক ঘটনারই মূলে যেমন কার্য্য করে, তাবজগতেও সেইরূপ করে। সাহিত্য ভিন্ন অন্য যে সকল ঘটনা এই উদ্বর্তন-ব্যাপারের হেতুস্বরূপ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আদর্শ দর্শন ও মহাত্মগণের শিক্ষাই প্রধান। সমাজে সে সময়ে মাতৃভক্তির একটি বিরাট আদর্শ বর্তমান ছিলেন—তাঁহাকে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই জানিতেন ও মানিতেন—তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দেশের শিক্ষিত সমাজকে বিদেশীয় পুতাব হইতে রক্ষা করিয়া, দেশের ত্যাগের আদর্শ পুতিষ্ঠিত করিবার জন্য সেই সময়ে আর এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়—সেই মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁহার শিক্ষায় ও আকর্ষণে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই নিজ নিজ জীবনের গতি ফিরাইয়া ঠিক পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই সকল নানাবিধ কারণে সমাজেও অগাধ চৈতন্য আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল।

এই লুপ্ত চৈতন্যের পুনঃপ্ৰাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেন সাহিত্যিকগণের হৃদয়ে সাহিত্যে মাতৃচরিত্রের অভাববোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের দুইজন মহাকবি, দুই দলের পুতিনিধি-স্বরূপ হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। প্রথম নবীনচন্দ্র সেন—তিনি হইলেন নব্যতন্ত্রের মুখপাত্র; তিনি মহাত্মারতকে উল্টাইয়া তাঁহার মত-পোষক তিনখানি



কাব্য রচনা করিলেন। ‘মেঘনাদ বধ’এ দোষ থাকায় তাহা নিন্দনীয় হইয়াছে, ইঁহারও কাব্যে সেই দোষ আরও একটু অতিরিক্তমাত্রায়। এ তিনখানি কাব্যও বঙ্গের জাতীয় কাব্য হইতে পারে নাই, কিন্তু এখানে সে কথার বিচার নিষ্প্রয়োজন। সে যাহাই হউক, নবীনবাবুর আত্মজীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহাবলীতে মাতৃচিত্র ভালরূপে চিত্রিত না হওয়ার অভাব তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি এই কাব্য-ত্রিতয়ে অধ্যায় “রৈবতক, পুতাস ও কুরুক্ষেত্রে” স্মৃতদ্রা-চিত্র অঙ্কিত করিলেন, কতকটা ঐ অভাব পূর্ণ করিবার জন্য, কতকটা মাতৃব্দের একটা আদর্শ সৃষ্টি করিবার জন্যও বটে। কিন্তু সে চিত্র, বিদেশী আদর্শে গঠিত হওয়ায় এবং মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক চিত্র না হওয়ায় পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। এ কথা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং আবার বলিতেও কুণ্ঠিত নহি। একটা বড় রকমের আদর্শ সৃষ্টি করিব বলিয়া গৃহ লিখিতে বসিলে যেমন কৃত্রিমতা দোষ আপনি আগিয়া পড়ে, এ কাব্যগুলিতেও সেই দোষ স্পষ্ট। তা যাহাই হউক, সাহিত্যে মাতৃগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার পুশংসা তাঁহার নিশ্চয়ই প্রাপ্য। কবি নবীনচন্দ্র যদি বেদব্যাসকে অতিক্রম না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ-মত চলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভালই হইত। তাহা না করায় তাঁহার ক্ষমতা ও উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে। তৎসঙ্গেও সর্বান্তঃকরণে বাঙ্গালীকে তাঁহার পুদত্ত ধ্বজ স্বীকার করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার জীবন ও কর্ম বুঝিবার সময় এখনও আগিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার নাট্যাবলীতে মাতৃমুক্তি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত, মাতৃমহিমা বিশেষ ভাবে ঘোষিত। গিরিশচন্দ্রের মাতৃভক্তি তাঁহার গৃহাবলীতে ফুটিয়াছে; মার স্নেহ যে কি অপূর্ব পদার্থ তাহা তিনি জীবনে যেমন দেখিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার পুসিক্ত নাটকগুলিতে দেখাইয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। যাহারা কোনও একটা অন্ধসংস্কারের বশবর্তী না হইয়া গিরিশচন্দ্রের নাটক চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সাক্ষ্য দিবেন যে গিরিশচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যকে যে অমূল্য উপহার দিয়াছেন—যে মহতী শিক্ষায় বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—যদি বাঙ্গালী তাহা হৃদয়ের সহিত ধারণা করিবার যত্ন করে, তাহা হইলে বঙ্গবাসীর চরিত্র উন্নত হইবে। সে কথার পরিচয় ভবিষ্যতে কোনও দিন দিবার আশা রহিল; এখন এইটুকু মাত্র বলিবার বিষয় যে গিরিশচন্দ্র কি গার্হস্থ্য, কি পৌরাণিক, কি ঐতিহাসিক, তাঁহার সর্ববিধ নাটকেই নিপুণ হস্তে মার মূর্তি গঠিত করিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের নবযুগে চারি বিভাগে চারিজন মহাকবির উদয় হইয়াছে—যাহারা সাহিত্যের এই চারি বিভাগ সুসম্পন্ন করিয়া সাহিত্যকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন—কাব্য-বিভাগে মধুসূদন, উপন্যাস-বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্র, নাটক-বিভাগে গিরিশচন্দ্র, ঋণ কাব্য বা গীতিকাব্য-বিভাগে রবীন্দ্রনাথ। ইঁহাদের মধ্যে মাতৃচিত্র অঙ্কনে গিরিশচন্দ্রেরই প্রাধান্য, সে বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী পাঠকদিগের তিতর মতবৈধ হইবার সম্ভাবনা



নাই। গিরিশচন্দ্রের মনুষ্য-হৃদয়জ্ঞতা তাঁহার প্রায় সকল চিত্রেই স্বব্যক্ত, তাঁহার মাতৃচিত্রগুলিও তাই অস্বাভাবিকতার দোষে দুষ্ট হয় নাই, ইহাই তাঁহার মাতৃচিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার একটা সমগ্র নাটক এই মাতৃগৌরবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নাট্যকাব্য তাঁহার পৌরাণিক নাটক 'জনা'।

'জনা' নাটকখানির সমালোচনা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে, অন্য কোনও সময়ে তাহা করিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু এ কথাটুকু বলা অপূরণীয় নহে যে, এই নাটকে কবিরের যে শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা তাঁহার অন্যান্য শক্তি ব্যক্ত নাটকগুলির মধ্যেও দৃষ্টাপ্য। যে কার্য্য নবীনবাবুর আদর্শ রমণী ও মাতা সুভদ্রা সাধিত করিতে পারেন নাই, জনা তাহা সাধিত করিয়াছে। বন্ধের রক্তালয়সমূহে "জনা"র গৌরব এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও বোধ হয় চিরদিন থাকিবে। ইহার ফলে কত সহস্র লোকের মনে লুপ্তপ্রায় মাতৃমহিমার ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে ও জাগাইয়া তুলিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কারণ নাটকখানি প্রধানতঃ মাতৃগৌরবের উপর প্রতিষ্ঠিত; কবি উজ্জ্বল অক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন যে, জগতে মাতৃ-আশীর্ব্বাদই সন্তানের অক্ষয় কবচ; মাতৃসেবাই প্রধান ধর্ম্ম ও পুণ্য; মার মনে কষ্ট দেওয়াই সকল বিপদের মূল। তিনি যে পথে চলিয়া এই শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই হিন্দুদের চিরদিনের পথ, তাই তাঁহার শিক্ষায় যে কাজ হইয়াছে তাহা স্থায়ী-ফলপ্রসূ বলিয়া মনে হয়। অথচ এই মাতৃ তিনি কোথাও কোমলতার আবরণে দুর্ব্বল করিয়া ফেলেন নাই। পাঠক ও দর্শক বীররমণীর অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া রোমান্থিত হইয়াছে, পুত্রবাৎসল্যের পুখরতা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছে, আবার মাতৃস্নেহের অন্তত্পর্শে স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইয়াছে। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা এস্থলে নিষ্ফল হয় নাই—বঙ্গসাহিত্যিকগণের হৃদয়ে আবার মাতৃমহিমা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই 'জনার কথা' একটু বিস্তৃতভাবেই বলিলাম।

বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের পরেই কবির দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্থান। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি অন্যান্য নাট্যকারগণও গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত। কবির ডি. এল. রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ও 'পরপারে' নামক সামাজিক নাটকে মাতৃহৃদয়ের মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'উলুপী' নাটকেও মাতৃমহিমা কীর্ণিত হইয়াছে—পুত্র-বলিদানে। ফলতঃ এখন সাহিত্যের আবহাওয়া বদলাইয়াছে—বুঝি আমরাও একটু বদলাইয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদের সমাজ-মন্দিরে মাতৃদেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হইয়াছে এমন মনে হয় না,—আমাদের স্ব-প্রধান এখনও পুত্র, তাই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা করিলাম। রমণীর পূর্ণতা মাতৃদে—মাতৃদেবীর পূর্ণাভিমুখে আমাদের মঙ্গল। তাই বঙ্গসাহিত্যে মার আদর যত বাড়িবে ততই উহা পবিত্র হইবে এবং আমাদেরও পবিত্র করিবে।

[ মানসী ও মর্ঘ্যবাণী, ১৩২৩ ]



## সাহিত্যে “রূপান্তর”

বিপিনচন্দ্র পাল

সকল সাহিত্যেই মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথাই হয়, যাহাতে জন-সাধারণের চিন্তাতে একটা যুগান্তর আনিয়া দেয়।

‘সাহিত্যের রূপান্তর’ কথাটি, আমার মনে হয়, এই জাতীয়।

পুথিতে যখন এই কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, সাধারণ লোকে ইহার মর্ম বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; তবে ইহাতে যে বুঝিবার বস্তু আছে, এ ধারণা অনেকেরই জন্মিয়াছিল। কথাটি এখনও সকলে ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। ধরিতে পারিলে সাহিত্য-সমালোচনায় একটা নূতন বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইবে।

সাহিত্য বলিতে এক্ষেত্রে রস-সাহিত্যমাত্র বুঝিতে হইবে। ব্যাপক অর্থে আজিকালি সাহিত্য শব্দে গণিত, দর্শন, ইতিহাস, জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় লিপিবদ্ধ জ্ঞানকেই বুঝায়। ইংরাজিতে এ সকলই লিটারেচারের (literature) অন্তর্গত। কিন্তু যে সাহিত্যের রূপান্তরের কথা বলা হয়, তাহার সঙ্গে সাংস্কৃতিক-সম্বন্ধে গণিত, দর্শন, ইতিহাস, জড় বা জীববিজ্ঞানাদির কোনও সম্বন্ধ নাই। গণিতের বা দর্শনের, ইতিহাসের বা ভূ-তত্ত্বের বা রসায়নের বা জড়বিজ্ঞানের বা physics-এর কথা যখন সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়, অর্থাৎ কোনও গণিতবিদ বা দার্শনিক বা ঐতিহাসিক বা ভূতত্ত্ববিদ বা রাসায়নিক বা জড়বিজ্ঞানবিদ যখন আপনাপন গবেষণাদিকে লিপিবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ করিয়া কোনও সাহিত্যের অঙ্গ-পুষ্টি সম্পাদন করেন, তখন তাহাদের এ সকল রচনাতে গণিতের বা দর্শনের, ইতিহাসের বা ভূগোল্যের, জড়বিজ্ঞানের বা জীববিজ্ঞানের সত্য ও তথ্যসকল কোনও পুকারের রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না। ইহারা যে বস্তু বা ব্যাপারকে যে ভাবে দেখেন, ঠিক সেই ভাবেই তার বর্ণনা করিয়া থাকেন। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যেখানে যে ভাবে ও যে রূপেতে, যে সকল সম্বন্ধেতে আবদ্ধ হইয়া দূরবীক্ষণের প্রত্যক্ষীভূত হয়, জ্যোতির্বিদ্যায় তাহাদের সেই সংস্থান ও সেই সম্বন্ধই বর্ণিত হইয়া থাকে। দ্রষ্টার অন্তরের রসানুভূতির দ্বারা তাহাতে কোনও পুকারের রং ফলিয়া উঠে না।

এই রং ফলানটা দর্শনের বা জ্ঞানের কর্ম নহে। আমাদের অন্তরের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা বস্তু-সংস্পর্শকারে সুখ বা দুঃখ, কিংবা হাস্য, অশ্রুত, ক্রোধ, ক্রন্দ, বীর, বীভৎস, ভয়ানক প্রভৃতি রস আনন্দন করিয়া থাকি, সেই বৃত্তিই এ সকল বস্তুতে এ সকল রসের রং ফলাইয়া থাকে। এইজন্য এই বৃত্তিকে রঞ্জিনী বৃত্তি কহে। এই রঞ্জিনী বৃত্তির দ্বারাই যাবতীয় রসানুভব ও এই রসানুভূতির ফলে সমুদায় রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে।



আলোক-বিজ্ঞান বর্ণের ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, বিশেষ অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্যের নিদানাদির নিয়ম করিয়া থাকে। যে বর্ণটি যেভাবে যেখানে প্রকাশিত হয়, কিরূপে ভিনু ভিনু বর্ণ-সমাবেশে আকাশের মেঘমণ্ডলে নানা প্রকারের রং-লীলা প্রকটিত হয়, অথবা কি সূত্রে বনস্থলীতে পত্র-পল্লব-পুষ্পাদিতে বিচিত্র বর্ণসকল ফুটিয়া উঠে, আলোক-বিজ্ঞান কেবল তাহাই ব্যক্ত করে। কিন্তু শারদীয় উষার উদ্ভিনু আলোকে হিমালী-মণ্ডিত অত্যুজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গের বর্ণ-বিলাস দেখিয়া কবির বা ভাবুকের প্রাণের মর্মে মর্মে যে আনন্দলহরী জাগিয়া উঠে, আলোক-বিজ্ঞান তার খবর রাখে না।

সেইরূপ বিশেষ বিচিত্র ধ্বনিসকলের অনুভূতিকে ধরিয়া, কিরূপে কোন্ সূত্রে কোন্ বাহন অবলম্বন করিয়া, এ সকল শব্দ দিগ্ভ্রাণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে; শব্দের সহিত আমাদের শ্রুতিযুগলের কি সম্বন্ধ; আমরা যে সকল শব্দ বা ধ্বনি উচ্চারণ করি, তার সঙ্গে আমাদের কণ্ঠনালীর কি সম্বন্ধ; সংগীতের মূর্চ্ছনা অন্তরা প্রভৃতির মূল উৎপত্তি ও লক্ষণ কি,—ধ্বনি-বিজ্ঞান বা acoustics তাহারই সত্য ও তথ্য নির্ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল ধ্বনি-সংযোগে মানুষ সংগীতের স্রষ্টি করিয়া কিরূপে যে আপনার অন্তরের বিবিধ রসানুভবকে ব্যক্ত ও সম্ভোগ করে, সে কথা শব্দ-বিজ্ঞান জানে না। কেন যে প্রত্যুমে ভৈরবীর আলাপ শুনিয়া, আমাদের মর্মের স্তরে স্তরে জীবনের তরঙ্গ নাচিয়া উঠে; আবার কেনই বা মধ্য-রাত্রে বেহাগের আলাপ শুনিয়া, আমাদের চিত্তের উপরে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আসিয়া ছাইয়া পড়ে; কিংবা গায়ালের প্রাকালে, সূর্য যখন পশ্চিম গগনে ডুবিতে থাকে, আসন্ন অন্ধকারের ভয়-ভাবনায় পাখীরা যখন আপন আপন কুলায়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়, পথ-শাস্ত্র পথিক যখন প্রান্তর-মধ্যে পথ চলিতে চলিতে গ্রামান্তে যাইয়া আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন পূরবীর আলাপ শুনিয়া আমাদের প্রাণ, ঘরে বসিয়াই, কেন উদাস হইয়া উঠে,—এ সকল ধ্বনি-বিজ্ঞান বা acoustics কিছুই রাখে না।

সেইরূপ দেহ-বিজ্ঞান বা physiology, অস্থি-বিজ্ঞান বা anatomy জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, পেশি ও অস্থিসমূহের অঙ্গিসন্ধির সম্বন্ধ করিয়া, কোথায় কি-ভাবে কোন্ পেশী বা কোন্ অস্থি সমাবিষ্ট, তাহাই কেবল বলিয়া দেয়। কিন্তু এই রক্ত-মাংসের, এই অস্থিপেশিময় দেহযষ্টি দেখিয়া, আমাদের অন্তরে যে সকল অনুরাগ বা বিরাগের সঞ্চার হয়, তার কথা দেহ-বিজ্ঞান বা অস্থি-বিজ্ঞান কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। এই অনুরাগে বা এই বিরাগে আমাদের চক্ষে একই দেহ-যষ্টির যে সকল রূপান্তর ঘটে, তার কথা বিজ্ঞান বা দর্শন জানে না, বুঝে না, বলিতে পারে না। এ রূপান্তর ঘটায় আমাদের অন্তরের রঞ্জিনী বৃত্তি। এই রূপান্তরের সংবাদ বহন করিয়া থাকে রস-সাহিত্য বা কল্প-সাহিত্য।

বর্ণ-বিজ্ঞান জগতের রংমহলে যাহা দেখে না, চিত্রকর তাহা দেখেন। শব্দ-বিজ্ঞান আকাশের শব্দ-ভাণ্ডারে যাহা শুনিতে পায় না, গায়ক এবং সংগীতজ্ঞ তাহা



শোনে। দেহ-বিজ্ঞান বা অস্থি-বিজ্ঞান জীবদেহের মধ্যে যে বস্তু কোনও সন্ধান পায় না, চিত্রকর ও ভাস্কর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাতেই মজিয়া যান। জ্যোতিষবিদ গৃহনক্ষত্র-খচিত, শত-রঞ্জিত গগন-পটে যে ছবি দেখেন না, কবি তাহা দেখিয়া বিস্তার ও বিস্তার হইয়া যান। এইরূপ ভাবে, এ সকল ক্ষেত্রে, চিত্রকর, গায়ক, ভাস্কর, ও কবির অন্তরের পুঙ্খট রঞ্জিনী বৃত্তি, বর্ণের, স্বরের, জীবদেহের কিংবা বিশু-পুষ্টিতর মধ্যে যাহা কেবল বাহ্য ও বাহিরের পক্ষেদ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাকে আপনার রসের রং-এ রঞ্জিত করিয়া, তার অন্তরুত রূপান্তর ঘটাইয়া থাকেন। এই বস্তুকেই সাহিত্যের রূপান্তর বলিতে পারা যায়।

আমাদের দেশের প্রাচীনেরা পঞ্চকোষের কথা কহিয়াছেন। প্রথম অনুময় কোষ। আমরা আজিকালি যাহাকে জড়বিজ্ঞান বলি, ইংরাজিতে যাহাকে physico-chemical group of the sciences বলিতে পারা যায়, এই অনুময়কোষই তার অধিকার। এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের পক্ষ জ্ঞানেদ্রিয়তে। তার উপরে বা তিতরে প্রাণময় কোষ। এই প্রাণময় কোষেই আধুনিক জীববিজ্ঞান—ইংরাজীতে যাহাকে biological group of the sciences বলে,—তার অধিকার। এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের প্রাণানুভূতিতে। তারপর মনোময় কোষ, এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের মনোবৃত্তিতে; মনস্তত্ত্ব বা psychological group of the sciences-এর অধিকার এই কোষেতে। তার উপরে বা অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ। আমাদের অন্তরের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহুদ্বের মধ্যে একদ্বের, অদ্বের মধ্যে অঙ্গীর, অংশের মধ্যে অংশীর, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি, যে বৃত্তির দ্বারা, এক কথায়, আমরা যাবতীয় বিজ্ঞানাদি গড়িয়া তুলি, সেই বৃত্তিতে এই বিজ্ঞানময় কোষের প্রতিষ্ঠা। দর্শনের বা তত্ত্বজ্ঞানের (metaphysics বা philosophyর) অধিকার এই কোষে।

এই কোষ-চতুষ্টয়ের মধ্যে অনুময় কোষ একান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদি এই কোষের উপাদান। পক্ষেদ্রিয়, পক্ষতন্মাত্র ও পক্ষমহাত্মতের উপরে এই কোষ প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে ধরিয়া এই অনুময়কোষের জ্ঞান-লাভ সম্ভব। এই জন্য কোষ-পঞ্চকের মধ্যে এই অনুময় কোষ সর্বাপেক্ষা স্থূল। ইহা জীবের বাহ্যতম আবরণ।

তার পর প্রাণময় কোষ। প্রাণ-বস্তুর প্রমাণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সত্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাম এই প্রাণ যে আছে, কেবল তাহাই বলিতে পারে; এই প্রাণের স্বরূপ কি, তাহা বলিতে পারে না। এই প্রাণ-বস্তু ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তী প্রথম লোপান-রূপ হইয়া আছে। এই প্রাণের এক দিকে ইন্দ্রিয়গ্রাম ও অন্য দিকে মন। প্রাণের এক প্রান্তে senses আর অন্য প্রান্তে psyche; এক দিকে বিষয়পেক্ষী দর্শনাদি ইন্দ্রিয়, অন্য দিকে এ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মন। ইন্দ্রিয়কে



ধরিয়া যেমন প্রাণের জগতে যাইয়া পড়ি, এই প্রাণকে ধরিয়া সেইরূপ মনোময় জগতে যাইয়া উপস্থিত হই। এই জন্যই অনুময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে এই প্রাণময় কোষ সেতুস্বরূপ হইয়া আছে।

তার পর মনোময় কোষ। এই মনোময় কোষেই আমরা সর্বপুথমে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের সাড়া পাই। ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা এক দিকে অনুভূতি, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র, ও পঞ্চমহাভূতে; আর অন্য দিকে প্রাণে। ইন্দ্রিয়ের আশ্রিত অনুময় জগৎ, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় প্রাণ। ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা প্রাণে, প্রাণের প্রামাণ্য ইন্দ্রিয়ে। ইন্দ্রিয় যেমন বিষয় ছাড়া নহে, প্রাণ সেইরূপ ইন্দ্রিয় ছাড়া নহে। কিন্তু মনের মধ্যে বিষয়ের অবর্ত্তমানেও ইন্দ্রিয়রসের প্রত্যক্ষ ও অনুভব হয়। মন অনুপস্থিতকে উপস্থিত, অবর্ত্তমানকে বর্ত্তমান, অপ্ৰত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ বলিয়া ধারণ করিতে পারে। এই জন্য মন ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্মৃতি বা আভাসমাত্র গ্রহণ করিয়া, আপনার মধ্যে বিবিধ বিষয়ের সৃষ্টি করিতে পারে। এই জন্যই, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ হইলেও, মনের এমন শক্তি আছে, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের অপ্ৰত্যক্ষ বিষয়কে সে আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং পূর্ব-প্রত্যক্ষ বিবিধ ইন্দ্রিয়ানুভবকে মিলাইয়া মিলাইয়া, অভূতপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। নৃ-শৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম এই সকলই এই জাতীয় মানস-সৃষ্টি। ইংরাজিতে এ সকলকে fancy creation বলা যায়।

এই জাতীয় মানস-সৃষ্টিতেও এক প্রকারের রূপান্তর হয় বটে, কিন্তু এখানে যে রূপান্তরের কথা হইতেছে, যে রূপান্তর রস-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ, ইহা সে জাতীয় রূপান্তর নহে। ফলতঃ ইহাকে রূপান্তর না বলিয়া রূপ-মিশ্রণ বলা যাইতে পারে। কেহ কখনও মানুষের শিং দেখে নাই, তবে অন্য জন্তুর শিং দেখিয়াছে। সে সকল জন্তুতে যে শিং দেখা গিয়াছিল, সেই শিংকে মানুষের মাথায় আনিয়া বসাইয়া নৃ-শৃঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ এবং শৃঙ্গ দুই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বস্তু। নৃ-শৃঙ্গে এই দুই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বস্তুর নিজের বিশিষ্ট রূপের কোনও বিপর্যয় বা পরিবর্ত্তন ঘটে না। মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়, আর শৃঙ্গও শৃঙ্গই থাকিয়া যায়, মানুষও বদলায় না, শৃঙ্গও বদলায় না। কেবল যাহা ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন সম্বন্ধে ছিল, তাহাকে এক করিয়া এই নৃ-শৃঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ-কুসুম সম্বন্ধেও তাহাই ঘটে। আকাশও প্রত্যক্ষ বস্তু, কুসুমও প্রত্যক্ষ বস্তু। কিন্তু আকাশে কুসুম ফোটে না, গাছে বা লতাতেই ফোটে। আকাশ-কুসুমে আকাশে ও কুসুমের মধ্যে যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। এই সম্বন্ধ দুইটি পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুর মিলনে রচিত। এই সম্বন্ধ বাস্তব নহে, কল্পিত। এই সম্বন্ধে আকাশের আকাশত্ব বা কুসুমের কুসুমত্ব, দু'য়ের কোনটাই বদলাইয়া যায় না, অথচ একটা নূতন কল্পিত বস্তুর সৃষ্টি হয়। এই কারণে এখানে রূপান্তর শব্দের প্রয়োগ সত্য হইবে না।

যেমন মনোময় কোষে সত্য রূপান্তর ঘটে না, সেইরূপ বিজ্ঞানময় কোষেও ঘটে না। মন ইন্দ্রিয়ানুভূতি লইয়াই কারবার করে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয় লইয়াই



মন আপনার যাবতীয় মানস-সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করে। বিজ্ঞান সেইরূপ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে বিহার করে। বহুদেহের মধ্যে একদেহ দর্শন করিতে গেলে, এই বহুদেহের প্রত্যক্ষ রূপ-রসাদির বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করিয়া, এ সকলের মধ্যে ও অন্তরালে অপ্ৰত্যক্ষ তত্ত্ব-বস্তুর ধ্যান করিতে হয়। মনোময় কোমের আশ্রয়—রূপ; বিজ্ঞানময় কোমের আশ্রয়—স্বরূপ। রূপ বৈচিত্র্যের প্রকাশ করে। জগতের বহুদেহ রূপ লইয়া। অরূপই কেবল এই বৈচিত্র্য ও এই বহুদেহকে নিরস্ত করিয়া, নিরাকার ও শূন্য বিশিষ্টতা ও এই বিচিত্রতা-পূর্ণ এই বিশেষ একদেহ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। বিজ্ঞান যে একদেহ প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার উপলব্ধি করিতে হইলে, সকল রূপকে নিরস্ত করিতে হয়। অথচ রূপকে রাখিয়াই কেবল রূপান্তর ঘটাইতে পারা যায়, রূপকে বিনাশ করিয়া নহে। কিন্তু একদেহ, নিরাকারে, নিব্বিশেষে, কোনও রূপের প্রতিষ্ঠা হয় না, হইতেই পারে না। একদেহ যখন রূপের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই সে এক বহু হয়। নিরাকারে যখন রূপের প্রকাশ হয়, তখনই তাহা সাকার হইয়া যায়। নিব্বিশেষে যখন বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তাহা আর নিব্বিশেষ থাকে না। অতএব রূপের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া, বিজ্ঞানময়-জগতে—যেখানে কেবল সত্তা বা Being মাত্র আছে, কিন্তু প্রকাশ বা Doing নাই, সেখানে—রূপান্তর হয় না, হইতে পারে না।

কিন্তু এখানেও কবি-কল্পনা নানা প্রকারের রূপের সৃষ্টি করিতে গিয়াছে। বেদের পুরুষ-সূক্তে তার প্রমাণ পাই :—

“পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। • তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন।

“যাহা হইয়াছে, অথবা যাহা হইবেক, সকলি সেই পুরুষ। তিনি অনরত্ন-লাভে অধিকারী হয়েন, কেন না, তিনি অনু-দ্বারা অতিরোহণ করেন”।

“তাহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশু-জীবসমূহ তাহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাহার তিন পাদ।

“পুরুষ আপনার তিন পাদ লইয়া উপরে উঠিলেন। তাহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজন-রহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন।

“তাহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন, এবং বিরাট্ হইতে সেই পুরুষ। তিনি জন্ম-গ্রহণপূর্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।”—ইত্যাদি।

এখানে কবি এক অদ্ভুত পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন। নিরাকার, সত্তামাত্র জ্ঞেয়, পরম-তত্ত্ব কি বস্তু, ইহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ না হইলেও সমাধি-প্রত্যক্ষ বটে। এই বিচিত্রতাময় জগতের মূলে যে একটা একদেহ আছে, ইহা আমরা বুঝি। এই একদেহের উপলব্ধি লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে মন হইতে, চিন্তা হইতে, ধ্যান ও জ্ঞান হইতে, জগতের যাবতীয় রূপ-রসাদির বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, ও বহুদেহকে দূর করিয়া দিতে হয়। রূপের অনুভবের সঙ্গে এই একের অপরোক্ষ উপলব্ধি সম্ভব নহে।



“নেতি” “নেতি” বলিয়া ব্যতিরেকী পন্থার অনুসরণেই এই একত্বের উপলব্ধি করিতে হয়। আর যখন অনুযী-পন্থাতে ইহার অনুভব লাভ করিতে হয়, তখন—  
 “এই সকল রূপের মধ্যে সেই অরূপ আছেন,” “এই সকল বিচিত্রতার অন্তরালে সেই মহান্ এক রহিয়াছেন”—এই ভাবে; অথবা “তঁহারই দ্বারা এই সকল রূপের প্রকাশ হইতেছে,” “তঁহারই শক্তিতে ও জ্ঞানে বিশেষ অশেষ বৈচিত্র্য স্থিতি করিতেছে,”—এই রূপে তাঁহার চিন্তা বা ধ্যান করিতে হয়।

এইরূপ ধ্যানেও বস্তুর রূপান্তর হয় বটে। কিন্তু হয়,—বিজ্ঞানময় কোষে নহে, কিন্তু আনন্দময় কোষে। এই ধ্যান করিতে করিতে চিন্তে যে সকল ভাব উৎসারিত হয়, সেই ভাবের রং পড়িয়া তখন বিশেষ রূপ বদলাইয়া যায়। তখন, সেই ভাবের অঙ্কনে রঞ্জিত-চক্ষু সাধক—

“স্বাধর জন্ম দেখে,  
 দেখে না তারা মূর্তি,  
 যাহা নেত্রে পড়ে,  
 হয় ইষ্টসেব ক্ষুদ্রি।”

নিরাকারের সাধকের অধিকার মুখ্যতঃ বিজ্ঞানময় কোষে। কিন্তু যদিও কোষ-পঞ্চকে আনন্দময় কোষ বলিয়া একটি পৃথক্ কোষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আনন্দ-বস্তু সকল কোষকে ছাইয়া, সকল কোষকে ছাপিয়া আছে। অনু, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান—সকলই আনন্দময়। জড়, জীবে, মননে, চিন্তনে, ধ্যানে, আনন্দ সর্বত্র উৎসারিত, সর্বত্র উচ্ছৃগিত। এইজন্য নিরাকারের ধ্যানে যখন এই আনন্দ-রস উথলিয়া উঠে, তখন নিরাকারেরও “আকার” বদলাইয়া যায়; “অরূপে” রূপ ফুটিয়া উঠে। তখন—

“সর্বজীবে হয়,  
 ব্রহ্মভাবোদয়,  
 চিদানন্দ জেগে উঠে।”

কিন্তু এইটি হয়, আনন্দ-রস-প্ৰভাবে। সকল ক্ষেত্রেই এই আনন্দ-বস্তু বা রস-বস্তু আপনার রসান মাখাইয়া বস্তুর রূপান্তর ঘটায়। এই রূপান্তরকেই সাহিত্যের রূপান্তর বলা যায়।

[ নারায়ণ, ১৩২৪ ]



কবি-প্রসঙ্গ



## রামপ্রসাদ

পূর্ণচন্দ্র বসু

পৃথিবীর সাহিত্য-সংসারে পারমাণবিক কবিতায় রামপ্রসাদের পদাবলী এক অপূর্ব পদার্থ। কোন জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে সেরূপ রত্নরাজি বিরাজিত নাই। প্রসাদী পদাবলীর প্রকৃতি ও বিশেষ ধর্ম আর কোন প্রকার ধর্ম-সঙ্গীতে বিদ্যমান দেখা যায় না। রামপ্রসাদ সেন এক স্বতন্ত্র ধরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিমাতেই আপন আপন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া লয়েন। তাঁহা-দিগের হৃদয়-ভাব ও চিন্তা এক নূতন পথে প্রবাহিত হয়। সুতরাং সে সমস্ত ভাব ও চিন্তা এক নূতন ভাবে বিকশিত হইয়া পড়ে।

রামপ্রসাদ সেনের করনা অতি তেজস্বিনী ছিল। তাঁহার করনা সম্মুখে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার করনা পাখির সুন্দর পদার্থের অনুঘর্ষে ব্যস্ত হয় নাই; দেখে নাই,—কোথায় কুসুমিত কুসুম, স্বচ্ছ সরোবর, ভীষণ জলপ্রপাত, প্রকাণ্ড পর্বতমালা ও মনোহর শস্যক্ষেত্র। সে করনা সম্মুখে যাহাই দেখিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া একটি একটি মনোহর সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যখন যেখানে উপস্থিত, সেই স্থানের বিষয় তাঁহার করনাকে অমনি আকৃষ্ট করিয়াছে। রামপ্রসাদের করনা যেন নিয়তই জাগরিত রহিয়াছে। জাগরিত থাকিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছে, অমনি তাহাকে সাদৃশ্যভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছে; পৃথিবীর সামান্য ধূলিরাশিকেও স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যে দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাতে যে কেবল আপন-হৃদয়ের সাদৃশ্যের আরাপিত করিয়াছেন, এমত নহে; তাহাকে প্রধানতঃ করিবে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। প্রকৃতি কবির চক্ষে কিরূপ দেখায়, তাহাই যদি বিকশিত করা কবিরের ধর্ম হয়, রামপ্রসাদের সঙ্গীতে তবে কবিরের কিছুই অভাব নাই। রামপ্রসাদের হৃদয় ধর্মপরায়ণ ছিল, তাঁহার মন করনায় পরিপূর্ণ ছিল। রামপ্রসাদ যাহা দেখিতেন, প্রথমে তাঁহার হৃদয় তাহাতে আকৃষ্ট হইত; হৃদয়ের আকর্ষণে তাহাতে ধর্ম-ভাব প্রতিকলিত হইত; তৎপরে করনার উজ্জ্বল অলঙ্কারে তাহা বিভূষিত হইত। যে ক্ষুদ্র জগতে রামপ্রসাদ বাস করিতেন, তাহার চারিদিক্‌ যাবতীয় পদার্থকে তিনি সাদৃশ্যবাদের করনা-দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত জগতের উপর আর একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রজতময়ী পাখির প্রকৃতিকে তিনি কনকভূষণে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। কঠিন মৃত্তিকাময় জগৎকে তিনি ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতির





কর্ণকুহরে এক নূতন সঙ্গীত-ধ্বনির অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিও তাঁহার নূতন গীতে বিমুগ্ধ হইয়াছিল; বিমুগ্ধ হইয়া সেই গান চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। তিনি যাবতীয় সামান্য পদার্থকে ধ্বন-গান সঙ্গীত করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আজিও আমরা সেই সমস্ত যৎসামান্য পদার্থের সমীপে উপনীত হইয়া রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেন উদ্বোধিত হইয়া গাহিয়া উঠি,—

“মা আমার বুঝাবে কত—

কলুর চোক-চাকা বলদের মত ?

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।

তুমি কি দোষে করিলে আমার, ছ’টা কলুর অনুগত ?

মা শব্দ মনতায়ুত, কীদূলে কোলে করে স্নত।

দেখি বুজাওরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ?

দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব’লে ত’রে গেল পাপী কত।

একবার খুলে দে মা চ’বের ঠুলি, দেখি তোমার অভয় পদ।

কুপুজ অনেকেই হয় মা, কুনাতা নয় কখন ত।

রামপ্রসাদের এই আশা মা, অস্তে থাকি পদানত ॥”

রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী তাঁহার সাধকদের ও কবিদের অমোঘ নিদর্শন। রসাত্মক বাক্যই যদি কাব্যের লক্ষণ হয়, তবে রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী একখানি চমৎকার কাব্য। বাঙ্গালা ভাষায় তাহা এক অদ্বিতীয় কাব্য। সে কাব্য শাস্ত্রসের প্রসুৰণ এবং সে প্রসুৰণ করনা-লতিকায় সুশোভিত। রামপ্রসাদ হৃদয়কে মাতাইয়া তোলেন তাঁহার ভক্তিরসে। তাঁহার সঙ্গীতাবলী যে ভক্তিরসের আধার, তাহা বিষয়ীর রাজসিক ভক্তি নহে,—যে রাজসিক ভক্তি কেবল বাহ্য জ্ঞানকে প্রকাশিত হইতে চায়; কিন্তু তাহা প্রকৃত সাধকের সাত্ত্বিক ভক্তি। সেই সাত্ত্বিক ভক্তির সহিত বিষয়িগণের রাজসিক ভক্তির কিরূপ প্রভেদ, তাহা এই সঙ্গীতে প্রতীত হইতেছে,—

“মন, তোর এত ভাবনা কেন ?

জয় কালী ব’লে বসু না ধ্যানে।

জ্ঞানকে ক’রলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে,

আমি লুকিয়ে মায়ে ক’রব পূজা, জানবে নাকো জগজ্জনে।

ধাতু পাখান মাটির বৃত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে ?

আমি মনোময় প্রতিমা গ’ড়ে, বসাব হৃদ-পদ্মাসনে।

আলোচন আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে ?

আমি ভক্তি-সুখা মাকে দিয়ে, তুণ্ড হ’ব মনে মনে।

মেঘ নহিছ ছাগ-আদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে ?

জয় কালী ব’লে দাও রে বলি, এ দেহের ঘড়-রিপুগণে।

কাজ কি রে তোর বিলুপলে, কাজ কি রে তোর গঙ্গাজলে ?

এ দেহে আছে সহস্র দল, দাও রে মায়ে শ্রীচরণে।



ঝাড় লঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর রোশনায়ে ?  
 এ দেহে আছে জ্ঞান-দীপ, অ'লতে থা'কবে নিশি দিনে ।  
 রামপুসাদ বলে, চাক্রে চোলে, কাজ কি তোর সে বাজনে ?  
 জয় কালী ব'লে দাও করতালি, মন রেখে মায়ের শ্রীচরণে ॥”

রামপুসাদের এই সাংখ্যিক ভক্তি অনেক স্থলেই বড় সুন্দর লাগে । তাহার শাস্ত্ররসে মন আর্দ্র হইয়া যায় । তাই, রামপুসাদের গীতাবলী গাহিবামাত্র মনকে অগ্নিকের জন্যও প্রমত্ত করে ।

রামপুসাদের এই ভক্তি-পুগাত্তা বেদান্ত ও আগমের গাভীর্য্যো পরিপূর্ণ । এক এক স্থানে তন্মধ্যে বেদান্ত ও আগমের নিগূঢ় তত্ত্বসকল প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীতকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে । যাহারা সে গভীরতায় ডুবিতে পারেন, তাহারা সেই সঙ্গীতের রসাস্বাদনে দ্বিগুণ মোহিত হইবেন । দেখেন, কত ভাব কত অল্প কথায় কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশিত । সেই ভাবের সৌন্দর্য্য নানা অলঙ্কার-ভূষণে চতুর্ভুজ বন্ধিত । রূপক-শোভা নহিলে কি তত দূর গভীর ভাবের সুন্দর বিকাশ হয় ? রূপক-শোভা ধারণ করাতেই তাহাদের গাভীর্য্য বন্ধিত হইয়াছে । গভীরকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে । উপমার সৌন্দর্য্যো ভাব-কুসুমাবলি কাস্তি ধারণ করিয়াছে । সেই কাস্তি-মধ্যে তাহাদের গাভীর্য্য প্রকাশিত । প্রকাশিত কি লুক্কায়িত, তত বুঝা যায় না । অর্দ্ধ প্রকাশিত, অর্দ্ধ লুক্কায়িত । কি সুন্দর শোভা ! সঙ্গীতে এত সুন্দর শোভা কোথাও নাই ; সেই সুন্দর শোভায় ভাব-কুসুমাবলি প্রস্ফুটিত । ভক্তি-রসগোরভে দিক্ আমোদিত । ধর্ম্মভাবে মন পুলকিত । শাস্ত্ররসে চিত্ত বিগলিত । যে গীতে চিত্ত এত বিগলিত হয়, সে গীতের শক্তি অতি অসাধারণ বলিতে হইবে । শক্তির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ । ভক্তির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ । মুক্তির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ । তাই তাহার এত অসাধারণ শক্তি ।

রামপুসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন ; সেই শক্তি শ্যামা, সেই শক্তি শ্যাম । শ্যাম ও শ্যামা একই শক্তি ; একই শক্তি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্তা । এই শক্তির প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ী লোকের হওয়া বড়ই কঠিন । মায়া-মোহ না কাটাইতে পারিলে এবং বিষয়-বৈরাগ্যের উদয় না হইলে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান হয় না । হিন্দুশাস্ত্রে ভক্তি-সাধন-পথের অনেক স্তর আছে । যে আধ্যাত্মিক স্তরে আসিয়া জীব মায়া-মোহের হাত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারেন, সেই মুক্তির স্তরে আসিয়া তাঁহার ভগবৎ-প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা । এই ভগবৎ-প্রত্যক্ষ-পক্ষে ভক্ত যত নিকটবর্ত্তী হইবেন, তদনুসারে তাঁহার সালোক্য এবং সামীপ্য-মুক্তি সম্ভাবিত হয় । মনুষ্য হইতে মুক্ত হইয়া যে লোকে জীব দেবত্বে উপনীত হইবেন, সংসার-মায়া হইতে বিমুক্ত হইয়া দেব-লোকে আসেন, সেই লোকে তাঁহার সালোক্য-মুক্তি হয় । দেবগণের সহিত এক লোকে থাকার নাম সালোক্য । এই দেবত্ব-লাভের পর সুস্বাদু-প্রভাবে ভক্ত যত ভগবদর্শনের সমীপবর্ত্তী হইয়া একেবারে ঈশ্বরের সম্যক্ ঐশ্বর্য্য-মুক্তি দেখিতে পান,





ততই তাঁহার সামীপ্য-মুক্তি সম্ভাবিত হয়। এই ঐশ্বর্য্য-মুক্তি তেমনই পুত্য়ক হয়, যেমন অৰ্জুনের দিব্যচক্ষে পুত্য়ক হইয়াছিল। সামীপ্য-মুক্তি লাভ হইলে যোগীর সাক্ষ্য বা সাক্ষি মুক্তি হয়। এই আধ্যাত্মিক স্তরে আসিয়া যোগী ঐশ্বরের স্বরূপ হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যভোগী হন। ঐশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যশালী হওয়ার নামই সাক্ষি বা সাক্ষ্য মুক্তি। যোগ-সাধন-দ্বারা এইরূপ যোগেশ্বর্য্য-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। এ সমস্ত মুক্তি লাভ করিয়া যোগী যে স্তরে আসিয়া দাঁড়ান, তৎপরে কেহ কেহ সেই ঐশ্বর্য্য-লাভেই অভিভূত হইয়া পড়েন, কেহ কেহ বা তৎপরে সায়ুজ্য বা ঐশ্বরে লয়-মুক্তির প্রয়াসী হন। সায়ুজ্য-মুক্তিলাভেও জীবের গুণভাব থাকে। কারণ, তখন সগুণ ভগবানের সহিত একীভূত ভাব ঘটে মাত্র। গুণভাব যত দিন থাকে, ততদিন জীবের সংসার-গতি নিবারিত হয় না। এই গুণভাবের একেবারে বিনাশ-সাধন না করিতে পারিলে নিঃস্রেগুণ্য হয় না; নিঃস্রেগুণ্য না হইলে ব্রহ্ম-পদ-লাভ হয় না। এই ব্রহ্ম-পদ-লাভের নামই মোক্ষ। নির্গুণ্য হেতু জীবাত্মা নির্গুণ-ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান। গুণাতীত হইলে তবে জীবের সংসারগতি ঘুচে। সংসার-গতি না ঘুচিলে জীব পরমানন্দ অমৃতধাম লাভ করিতে পারে না। ভক্তি ও শক্তি-সাধন-পথে এতই আধ্যাত্মিক স্তর। এক এক আধ্যাত্মিক স্তর হইতে তদুর্দ্ধ স্তরে বাইতে পারিলে, নিম্ন স্তরের মুক্তি-সাধন হয়।

লোকে অগ্রে সায়ুজ্য-মুক্তির প্রয়াসী হইতে পারে না। কারণ, সে ভাব অনেক দূরের কথা। সে-মুক্তির প্রয়াসী হইতে হইলে জীবকে সাক্ষ্য মুক্তি লাভ করিয়া অনেক দূর আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইতে হয়। রামপ্রসাদ যে আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন, সে স্তরে তিনি শুধু সালোক্যেরই প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবদ্দশন জন্য তিনি একান্ত লোলুপ হইয়াছিলেন। অভয়-পদ-লাভের জন্য তাঁহার একান্ত লালসা হইয়াছিল। ভক্তের পুথম লালসাই এই। যে শক্তি লাভ করিতে পারিলে এই লালসা পূর্ণ হয়, অভয়-পদের দর্শন লাভ হয়, সেই শক্তি-সাধনার জন্য রামপ্রসাদ সংসার-বিরাগী হইয়াছিলেন। এই একান্ত লালসা তাঁহার অনেক সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদুর্দ্ধ আধ্যাত্মিক স্তরের আশ্বাদ-গ্রহণ করিবার শক্তি তাঁহার জন্মো নাই। তথাপি রামপ্রসাদ যে, সে সকল মুক্তির কথায় একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এমতও বোধ হয় না। লয়-মুক্তি পর্য্যন্তও যে তাঁহার এ যাত্রার আশা ছিল, তাহা তিনি,—

“না, আমি তোমারে খাব।

তুমি খাও কি আমি খাই মা, এবার (এ যাত্রায়)

দুটার একটা ক'রে যাব ॥” ইত্যাদি

এই গীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই গীতে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হইবার আশা বিলম্বণ জানাইয়াছিলেন। আর এক গীতেও তাঁহার এই লয়-মুক্তি-জ্ঞান প্রতীত হইয়াছে। যখন তিনি পরলোক-তত্ত্বের নীমাংসায় গাহিয়া উঠিলেন,—

“বল দেখি ভাই, কি হয় ম'লে?”



তখন তিনি সেই পরলোক-তত্ত্বের মীমাংসায় জীবের সালোক্যাদি নানা গতি বর্ণন করিয়া, শেষে তাহার পরা গতির কথা বলিয়া গীত শেষ করিলেন। বলিলেন, যেক্রপ “জলবিশ্ব মিশায় জলে”—সেইক্রপ জীবাত্মা পরমাত্মার মিশিলে তখন তাহার পরলোক-গতি শেষ হয়। নহিলে রামপুসাদ বলিয়াছিলেন যে, যিনি যাহা বলেন, সে সকলই সত্য; কোন মুক্তিই অসত্য নহে, কিন্তু সে সকল মুক্তি-লাভেও আত্মার পরলোক-গতি নিবারণিত হয় না। মৃত্যুর পর আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার সংসার, আবার জন্ম। মৃত্যুর পর জীবের পরলোক এইরূপ চিরদিনই চলে। কিছুতেই তাহার সংসার-গতি নিবারণিত হয় না। যতদিন আসক্তি ও কামনা থাকে, ততদিন সুক্ষ্মদেহ থাকে; যতদিন সুক্ষ্মদেহ থাকে, ততদিন সংসার থাকে। অনাসক্ত হইলে যখন আত্মা নিক্কান হেতু বিদেহ হয়, তখন তিনি দেহাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে একেবারে মিশিয়া যান, তখন তাঁহার স্থূলদেহ পরিবর্তন বা মৃত্যুর পর আর লোকান্তর থাকে না। “যেমন জলবিশ্ব মিশায় জলে” তেমনি জীবের শেষ হয়। যে ব্রহ্মসত্ত্ব হইতে আত্মার জীবন্ম যটিয়াছিল, সেই মহান্ ও অনন্ত ব্রহ্মসত্ত্বে তিনি আবার বিলীন হন। তখন তাঁহার আর জীবন্ম থাকে না। তাঁহার বিশেষ ভাব শেষ হইলে তিনি অবিশেষ ভাবে উপনীত হন। এই বিশেষ ভাবই জীবন্ম। জীবন্ম যতদিন আছে, ততদিন পরলোক আছে। পরলোকে যদি এই জীবন্মের নাশ না হয়, তবে আবার বিশেষ ভাব ঘটে। বিশেষ ভাব ঘটিলেই আবার মৃত্যু। অবিশেষ ভাবে উপনীত হইতে পারিলেই আত্মা অমৃত পদ লাভ করিতে পারেন। তখন এই আত্মার মৃত্যু-ভয়-নাশন পুকৃত অভয় পদ লব্ধ হয়। তখন তিনি অবিশেষ পরমাত্মায় কিরূপ মিশিয়া যান?—

“যেমন জলবিশ্ব মিশায় জলে।”

রামপুসাদ এই শক্তি-সাধন-পথে কেমন ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গীতাবলীতে প্রকাশিত আছে। ভগবদ্ভক্তির যতই প্রগাঢ়তা জন্মিয়াছে, ততই তিনি এক এক ভাবে উপনীত হইয়া এক এক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তি-সাধনার প্রতিপদের চিহ্ন এই সঙ্গীত-মালা। সেই চিহ্ন-অনুসারে তাঁর সঙ্গীত-মালা গাঁথিতে পারিলে, ভক্তি-শাস্ত্রের এক রমণীয় রত্নমালা লাভ হয়। এই রত্নহারে তিনি শ্যামাসুন্দরীকে শোভিতা করিয়াছিলেন। ভক্ত ভিনু কি অন্য কেহ এ হার গাঁথিতে পারে? ভক্তি-রত্নমালায় মহাশক্তি ভগবতী সুশোভিতা।

সংসারে ঈশুর ভুলিয়া আত্ম-পূজা, সন্যাসে সংসার ভুলিয়া ঈশুর-পূজা। যিনি এ দুয়ের সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে পারেন, তিনিই মনু এবং গীতোক্ত গৃহস্থ-সন্যাসী। যিনি সংসারে থাকিয়া তাহার পাপে পরিলিপ্ত না হন, যিনি উদাসীন হইয়াও সংসারী, তিনিই পুকৃত ভক্তি-পথের পথিক। রামপুসাদের জীবনে এই দৃষ্টান্ত। তাঁহার সঙ্গীত-মধ্যেও এই ধর্মের উপদেশ। তাঁহার গানে বিষয়ীর সমুদয় ভাব; কিন্তু বিষয়ীর ভাব-মধ্যেও বৈরাগ্য। ঘোর বিষয়ীর হৃদয়ে যদি বৈরাগ্য ও ধর্ম্যানুরাগ সঞ্চারিত হয়, তিনি যে ভাবে গান গাহিবেন, রামপুসাদ সেই ভাবে গান গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি



সমুদয় বিষয়-সামগ্রীকে ঐশ্বর-ভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। সমুদয় শিশু তাঁহার নিকট কালী-নাম লেখা। ভক্তিময়ী রাধিকার চক্ষে যেমন সমুদয় বৃন্দাবন কৃষ্ণময়, তাঁহার শ্রবণে বংশীধ্বনিও যেমন রাধাময়, তেমনি রামপুসাদের ভক্তিতে সর্বসংসার তারাময়। সর্বসংসার তাঁহাকে ভক্তি-পথে আহ্বান করিতেছে। সর্বসংসার তাঁহার নিকট ভক্তি-গীত গাহিতেছে। এই জন্য তাঁহার গীতাবলী কি বিরাগী, কি বিষয়ী, সকলরেই মনোজ্ঞ। বিষয়ী যখন বৈরাগ্যে ও ভক্তিভাবে পূর্ণ হয়েন, তখন তিনি রামপুসাদের গীত গাহিয়া বসেন; আবার বিরাগী যখন বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি পুসাদী পদাবলী গাহিয়া উঠেন। এই জন্য রামপুসাদ সর্বজনমনোরঞ্জন। ভিখারী তাঁহার বৈরাগ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তদীয় সঙ্গীত-সুধা পান করেন, বৃদ্ধজনগণ ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া তদীয় সঙ্গীতামৃতের রসাস্বাদ করিতে চাহেন; এ দিকে তরুণবয়স্কেরা তাঁহার কবিত্বে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গীত-রসে নিমগ্ন হয়েন। এইজন্য যেমন রামপুসাদের গীতাবলী বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত,—এমত আর কাহারও নহে।

রামপুসাদের সঙ্গীতে যেমন, এমন আর কোন জাতীয় ধর্ম-সঙ্গীতে, সাধুজনের মৃত্যুর প্রতি নির্ভয়তা—সুন্দর, সরল অথচ সংসাহসপূর্ণ ভাষায় পরিব্যক্ত হয় নাই। রামপুসাদের গীতে কেমন এক সাহসিকতা ও নির্ভীকতা আছে, যাহা কোন কবির ভাষায় দেখা যায় না। অথচ সঙ্গীতের পদগুলি নিতান্ত সরল। সেই সরল পদ-মধ্য হইতে যেন রামপুসাদের অন্তর্বল প্রকাশিত হইতেছে—রামপুসাদের তেজ, ধর্মের এবং সাধু-জীবনের বল-দর্প ও সাহস প্রকাশিত হইতেছে। পদগুলি পড়িলে বোধ হয়, যেন রামপুসাদ ত্রিসংসার পরাজিত করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত সাহস, এত বল, এমত সামান্য ভাষায় কেমন প্রকাশিত হইয়াছে! বাস্তবিক, রামপুসাদের বাগ্‌ভঙ্গী অতি চমৎকার; আর কোন কবির ভাষায় সেরূপ বাগ্‌ভঙ্গী দেখা যায় না। মৃত্যুকে তুচ্ছ-জ্ঞান কেন, দেবতাকেও তিনি সাধন-বলে, এবং সাধু-জীবনের সংসাহসে পূর্ণ হইয়া, সম্মান যেমন জনক-জননীকে নিতান্ত আপনার ভাবিয়া বলদপিত বাক্যে উক্তি করে, তেমনি বল-দর্পে সম্বোধন করিয়াছেন। যে গীতগুলি এই প্রকার ধর্ম-সাহসে পরিপূর্ণ, সেই গীতগুলি গাহিবার সময়ে আমরাও যেন তরুণ সাহসে পূর্ণ হই, দেবগণকে একবার আপনার জ্ঞান করি, মৃত্যুকে হেয়-জ্ঞান হয়, এবং দেব-ভাব অন্তরে উদ্ভিজ্জ হইয়া পশু-ভাবকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। তখন মনে হয়, আমরা দেবতার সম্মান, স্বর্গধাম আমাদিগের স্বদেশ, মৃত্যু তাহার সোপান। তবে মৃত্যুকে ভয় কি? দেব-অগ্নি করে ধারণ করিয়া, মাতৃসদৃশ সমগ্র পাপবৈরী ছেদন করিতে পারিলে শিবও আপন বক্ষ পাতিয়া আমাদিগকে স্থান দান করিবেন। তখন মনে-মনে আর একবার আমরা শ্যামাপূজা করি, শক্তির উপাসক হই। রামপুসাদের হৃদয়-ভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদিত হয়। তাঁহার হৃদয় আগিয়া অমনি আমাদের হৃদয়ে মিলিয়া যায়। তখন আমরা শিবশক্তীকে দেব-ভাবে পর্যবেক্ষণ করি। তাহাতে ঐশ্বরিক শক্তি দেখি। তাহাতে মানবীয় দেব-ভাব দেখি। তাহাতে ধর্মের জয় দেখি, তাহাতে



ঐজ্ঞাতির ভক্তি-ভাবের প্রাবল্য দেখি। শাস্ত্রশীল শিবের হৃদয় হইতে কালীরূপী শক্তি উদ্ভূত দেখি। দেবশক্তি কেমন প্রবলা, তাহা ধর্মের অগ্নি ও পাপবৈরগণের মুণ্ডমালায় প্রতীত করি। তখন হৃদয় কালীময় হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। ভবের ঐশ্বর্য, ধর্মের শাস্তিতাব, শক্তিরই পদতলে। যাঁহার ধর্মশক্তি আছে, সম্পদ, শান্তি ও সুখ তাঁহার পদতলে।

[অধ্যাদর্শন, ১২৮২]

## দীনবন্ধু মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত-পুণীত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' 'রহস্যসন্দর্ভে' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তাহার পর-বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়।

সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরানো দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অন্তিমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাहा ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য-শিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দুঃখিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর।

কিন্তু কবিত্ব-সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে একজাতীয় ব্যঙ্গ-পুণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-পুণালী এক জাতীয় ছিল, এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমরাগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত, এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সঙ্গেসঙ্গে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত।



এখনকার রসিকেরা, ডাক্তারের মত সরু ল্যান্সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষত-মুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুর্বলতা। সাহিত্য-সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে; দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে-ধরা; বাহতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর; শিক্ষা নাই, কোথায় মানিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশুর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জনধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জনধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কবির পুধান গুণ—সৃষ্টি-কৌশল। ঈশুর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর-পরিমাণে ছিল। তাহার পুণীত জনধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে যাহা সুক্কা, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাহার লীলাবতী, তাহার মানতী, কামিনী, সৈরিন্দ্ৰী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয় নহে। তাহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যাস্ত, তাহা তাহার ইচ্ছিতনাট্যেরও অধীন; ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র গারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

কি উপায় লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়—বাক্সালা সমাজ-সদ্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাক্সালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাক্সালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাক্সালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাহাদের লেখা সার্থক হয়, তাহা জানা নাই। তাহারা অনেকেই দেশ-বৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ-বা অতিরিক্ত দুই-চারিখানা পল্লীগাম, বা দুই-একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথ-ঘাট, বাগান-বাগিচা, হাট-বাজার। লোকের সঙ্গে মিলেন নাই। দেশ-সম্বন্ধীয় তাহাদের যে জ্ঞান, তাহা সচরাচর সংবাদপত্র হইতে প্রাপ্ত। সংবাদপত্র-লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) ঐ শ্রেণীর লেখক—ইংরেজেরা ত বটে নই। কাজেই তাহাদের কাছেও দেশ-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা, দার্শনিকদিগের ভাষায়, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন বলিতেছি না যে, কোন বাক্সালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ



ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি? না মিশিলে, যাহা জানিয়াছেন, তাহার মূল্য কি?

বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। দীনবন্ধুকে রাজকাৰ্য্যানুরোধে, মণিপুর হইতে গাঙ্গান পর্য্যন্ত, দার্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ-ভ্রমণ বা নগর-দর্শন নহে। ভ্রমণের দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আত্মদর্শনকে সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতন মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগর-বিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্য-শোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত 'উন্পাঁজুরে বরাখুরে' হাপ্-পাড়াগেঁয়ে হাপ্-সহরে বগাটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডিপুটি, নীলকণ্ঠের দেওয়ান, আমীন, তাগাদ্গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর-মা কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলনের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে,—ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভ্রমণ বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism; তাহার উপর Idealize করিবারও বিলম্ব কমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের দোষ-গুণ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে ঘোঁটা মাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ মাজাইতে মাজাইতে সে একটা হনুমান বা জাম্ববানে পরিণত হইত। নিমচাঁদ, ঘটিরাম, ভোলাচাঁদ প্রভৃতি বন্য জন্তুর এইরূপে উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করিলে, তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না। সহানুভূতি তিনু সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরিব-দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরিব-দুঃখীর সঙ্গে নহে—ইহা সর্বব্যাপী।



তিনি নিজে পবিত্র-চরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুষ্টচরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশৃঙ্খল সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোমেই হউক, তিনি সর্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাঙ্গ পাশাঙ্গ সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাশাঙ্গ-কুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি-শক্তির গুণে তিনি পাশাঙ্গের দুঃখ পাশাঙ্গের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমটাদ দত্তের ন্যায় বিশুদ্ধ-জীবন-সুখ, বিকলীকৃত-শিক্ষা, নৈরাশ্য-পীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন; বিবাহ-বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন; গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আত্মানুবৃত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম। তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্वास, একরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি-না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।

কিন্তু এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে। সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বेष সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটপৈছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাচাঁদ যে শুভ কারণবশতঃ শৃঙ্খর-বাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই, তা নহিলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদিগের সঙ্গে ও দীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। সহানুভূতি প্রধানতঃ করনা-শক্তির ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে করনার দ্বারা বসাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি জন্মিত। যদি তাহাই হয়, তবে এমন হইতে পারে যে, অতি নির্দয় নির্ধুর ব্যক্তিও, করনা-শক্তির বল থাকিলে, কাব্য-পুণ্যন-কালে দুঃখীর সঙ্গে আপনার সহানুভূতি জন্মাইয়া লইয়া কাব্যের উদ্দেশ্য-সাধন করেন। কিন্তু আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন যে, দয়া পুভূতি কোমল বৃত্তি-সকল তাঁহাদের স্বভাবে এত প্রবল যে, সহানুভূতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ—করনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন, এখানেও করনা-শক্তি লুকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্য এমন অভ্যস্ত, বা শীঘ্র সম্পাদিত যে, আমরা বুঝিতে পারি না। এখানেও করনা বিরাজমান। তাহাই না হয় হইল, তথাপি একটা প্রভেদ হইল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে—তাঁহারা সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে আসিতে পারে না; সহানুভূতি তাঁহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাঁহারা তাহাকে চান-বা-না-চান, সে আসিয়া যাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের করনা-শক্তি বড় প্রবল; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রীতি, দয়াদি বৃত্তি-সকল প্রবল।



দীনবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে ; তিনি নিজেই সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তিনি তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গৃহে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, এখন তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। তিনি নিজে স্বশিক্ষিত এবং নির্মলচরিত্র ; তথাপি তাঁহার গৃহে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার পুত্রলা দুর্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার অনুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদ-সাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না ; কেন-না, তিনি সহানুভূতির অধীন—সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র-পুণ্যনে নিযুক্ত হইতেন। সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর আদর্শের এমনই বল যে, সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তোরাপের সৃষ্টি-কালে, তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আদুরীর সৃষ্টি-কালে, আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অন্য কবি হইলে, সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত,—বলিত, “তুমি আমাকে তোরাপের বা আদুরীর বা নিমচাঁদের স্বভাব-চরিত্র বুঝাইয়া দাও, কিন্তু ভাষা আমার পছন্দ-মত হইবে,—ভাষা তোমার কাছে লইব না।” কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না, সহানুভূতির সঙ্গে কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, “আমার হুকুম—সবটুকু লইতে হইবে—মায় ভাষা। দেখিতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না ; আদুরীর ভাষা ছাড়িলে, আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না ; নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে, নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না ; সবটুকু দিতে হইবে।” দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে বলেন, “না, তা হবে না।” তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ-রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।

আমি এমন বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। গৃহে রুচির দোষ না ঘটে, ইহাই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি ? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম, তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই—তাঁহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মায়, ইহা সকলেই জানে।—কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝিতে পরিতেছি। গৃহ ভাল হোক আর মন্দ হোক, মানুষটা বড় ভালবাসিবার মানুষ। তাঁহার জীবনেও তাহাই দেখিয়াছি। দীনবন্ধুকে যত লোক ভালবাসিয়াছে,



এমন আমি কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্বব্যাপিনী তীব্র সহানুভূতিই তাহার কারণ।

দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি—তাঁহার কাব্যের গুণ-দোষের কারণ, এই তদ্বৃটি বুঝানো এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক-নায়িকা, তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র; কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা বলিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী ও তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ ভাষা পর্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল; কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা বলিতমের বেলা—চরিত্র ও ভাষা উভয়ই বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহজ।—এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধরুন।

লীলাবতী বা কামিনী শ্রেণীর নায়িকা-সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না—কেন-না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালী-সমাজে ছিল না। হিন্দুর ঘরে বেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী-সমাজে ছিল না—কেবল আজ-কাল নাকি দুই-একটা হইতেছে, শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে; ইংরেজ-কন্যার জীবনই তাই। আমরাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনই আছে। দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক-নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা-কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক-নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাহাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন আমি ইহাও বুঝিয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র-পুণরুৎপাদন-প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত নৃৎপুত্তলগুলি দেখিয়া সে চরিত্রের গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই; কেন-না, সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবন-হীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই, স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।

যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টশিপের পাত্রী নহে—যথা সৈরিক্তী—সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পারা নাই।



দীনবন্ধুর নায়কগুলির সম্বন্ধে ঐরূপ কথাই বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবা—কাজকর্ম নাই, কাজকর্মের মধ্যে কাহারও philanthropy, কাহারও কোর্টশিপ। ঐরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গালা-সমাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই। এখানেও তাই দীনবন্ধুর কবিত্ব নিফল।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু জলধর বা জগদম্বা বা নিমচাঁদের চরিত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, যদি এখানে সেই প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে এখানেও তাঁহার কবিত্ব সফল হইত। তাঁহার সে শক্তি যে বিলক্ষণ ছিল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বোধ হয়, তাঁহার চিত্তের উপর ইংরেজি সাহিত্যের আধিপত্য বেশী হইয়াছিল বলিয়াই এ স্থলে সে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। পক্ষান্তরে, তিনি প্রকৃতির কবি, অর্থাৎ বাঁহাদের সহানুভূতি করণার অধীনা—স্বাভাবিকী নহে, তাঁহারা এমন স্থলে করণার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া, সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া একটা নবীনমাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিতেন। সেক্সপিয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Caliban বা Ariel-এর সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে সহানুভূতি করণার আজ্ঞাকারিণী।

দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক-প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন,—নীলকরের তাৎকালিক প্রজা-পীড়ন সবিস্তারে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজা-পীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনী-মুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin. 'টম্ কাকার কুটীর' আমেরিকার কাকিদিগের দাসত্ব বুচাইয়াছে; নীলদর্পণ নীল-দাসদিগের দাসত্ব-মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁহার আর কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক-নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্য্যাংশে নিকৃষ্ট; তাহার কারণ—কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টি; তাহা ছাড়িয়া, সমাজ-সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং বিধ হইলেও কাব্য্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট; তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্যময় করিয়া তুলিয়াছে।



উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, দীনবন্ধুর কবিত্বের দোষ-গুণের যে উৎপত্তি-স্থল নির্দিষ্ট করিলাম, ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই যে পাইয়াছি, এমন নহে; বহি পড়িয়া একটা আন্দাজি theory খাড়া করিয়াছি, এমন নহে। গ্রন্থকারের হৃদয় আমি বিশেষ জানিতাম, তাই এ কথা বলিয়াছি ও বলিতে পারিয়াছি। যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়া এ কথা বলিলাম। গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাঁহার গ্রন্থ একরূপে বুঝিতে পারিতাম কি-না, বলিতে পারি না। অন্যে, যে গ্রন্থকারের হৃদয়ের এমন নিকটে স্থান পায় নাই, সে বলিতে পারিত কি-না, জানি না। কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে; কেবল, সেই অসাধারণ মনুষ্য কিংসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝানো আমার উদ্দেশ্য।

[ ১২৮৩ ]

## ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বান্দালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই—বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বান্দালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন; বলিতে গেলে বরং বলিতে হয় যে, বান্দালা সাহিত্য কাব্যরাশি-ভারে কিছু পীড়িত। তবে আমার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরীব বান্দালীর ছেলে সাহেব হইয়া মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহু কষ্টে পিসিয়া তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ “কেলাকা ফুল”। রাগে সর্ব্বদ্রব্য জলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলাকা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলাকা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম। প্রদোষকালে—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচি-বিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ-চঞ্চল-চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাগুয় বসিয়া ছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী



বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদী-বক্ষে নৌকার আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তিসাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস-ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গা-বক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

“মাধো আছে না মনে—  
দুর্গা ব'লে প্রাণ তাজিব,  
জাহ্নবী-জীবনে!”

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের স্বর মিলিল—বান্দলা ভাষায় বান্দালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ তাজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেইরূপ আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্মত্তির পথে সমাক্রান্ত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বান্দলা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বান্দলা কথায়, খাঁটি বান্দালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষিত বান্দালীর কবি;—ঈশ্বর গুপ্ত বান্দলার কবি। এখন আর খাঁটি বান্দালী কবি জন্মে না—জন্মিবার জো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বান্দলার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বান্দালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা “বৃত্তসংহার” পরিত্যাগ করিয়া “পৌষপার্বণ” চাই না। কিন্তু তবু বান্দালীর মনে পৌষপার্বণে যে একটা সুখ আছে, বৃত্তসংহারে তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিশ্বাধর-প্রতিবিম্বিত স্বধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে ছাড়িলে চলিবে না; দেশভুক্ত জোনস্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বান্দালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষগুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বান্দলাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী খাদ্য বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? ভারতবর্ষে পূর্বে জানিমাাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তারাও সকলেই “কবি”। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষ-শাস্ত্রকারও কবি। তারপর কবিশব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্তন ঘটিয়াছে। “কাব্যমু মাঘঃ কবি-কালিদাসঃ”—এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তারপর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে “কবির লড়াই” হইত। দুই দল গায়ক



জুটিয়া ছন্দোবদ্ধে পরম্পরের কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম “কবি”।

আবার আজকাল কবি অর্থে Poet; তাহাকে পারা যায়, কিন্তু “কবিত্ব” সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি-না, আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাঙ্গনে বসাইতে সমালোচক সন্মত হইবেন না। মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অক্ষুট ভাবগুলি বরিয়া, তাহাদিগকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য-স্রষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার স্রষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরা-মালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। কাশীরামের মত সুভদ্রা-হরণ কি শ্রীবৎস-চিন্তা, কৃতিবাসের মত তরণীগেন-বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণার ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম—এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাহাও কিছু এত ভাল নহে যে, তাহার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ-স্থল আমাদের হৃদয়ে অক্ষুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্ন শ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছুই রহিল না?

রহিল বৈকি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা মহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য দেশের কবি। এই সমাজ, এই মহর, এই দেশ—বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে



বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্বণে পিঠাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্টে পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাৎ তাহার সার আদান করিয়া নিজের উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুভিক্ষের দিন,—তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিম্বদুশ্রেনী সাজাইয়া মুজাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও, তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান,—

“মনের চলে মন ভেঙ্গেচে  
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাকো।”

তোমরা স্তম্ভরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর; তিনি তাহাদের রান্নাঘরে উনুনগোড়ায় বসাইয়া, শাওড়ী-ননদের গল্পনায় ফেলিয়া সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটি কাব্যরস বাহির করেন,—

“বধুর মধুর বনি, মুখ শতদল।  
গলিলে ভাগিয়া যায়, চক্ষু ছলছল ॥”

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধূঁয়ায়, নাটুরে মাঝির স্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থি-স্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপস্বে মাছে মৎস্য-ভাব ছাড়া তপস্বি-ভাব দেখেন, পাঁটার বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, “তোমাদের এ দেশ, এ সমাজ বড় রঙ্গ-ভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় স্তম্ভরী, বড় মনোমোহিনী, প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্মের ভাণ্ডার,—তা হইলে হইতে পারে; কিন্তু আমি দেখি, উহারা বড় রঙ্গের জিনিষ। মানুষে যেমন রূপী বান্দর পোষে, আমি বলি, পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে,—উভয়কেই মুখভেদ্যানতেই সুখ।” স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার-আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, “উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা।” তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময়ে, যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য যুবতীগণের পিছে-পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই নীহার-শীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কষিতকাস্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে; তিনি বলিলেন, “দেখ দেখি, কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময়ে পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর!” তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ণে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া বলিবে, “ধন্য স্বামি-পুত্র-সেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য!”



ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন—রন্ধনের চাল চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামি-ভোজন করাইবার সময়ে শাওড়ী-ননদের মুণ্ড-ভোজন হইল, এবং কুটুম্ব-ভোজনের সময়ে লজ্জার মুণ্ড-ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর ওগু Realist এবং ঈশ্বর ওগু Satirist; ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্রোহ-প্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ এবং পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ; পড়িয়া বোধ হয়, ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুইয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। ‘হতোম পের্চার নক্সা’ বিদ্রোহপরিপূর্ণ। ঈশ্বর ওগুর ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্রোহ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রক্ত, সবটা আনন্দ; কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—শ্রামণকে কুতামায় পরাজয় করিতে হইবে, এই জিদ। ‘কবির লড়াই’—ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর ওগু কবির লড়াইয়ে শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল।

অন্যত্র তাও না—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন; কারণ—আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড়-চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর-জেনারেল, লেপ্টেন্যান্ট-গবর্ণর, কোন্সিলের মেম্বর হইতে মুটে, মাঝি, উড়িয়া, বেহারী কেহ ছাড়া নাই। এক-একটি চড়-চাপড় এক-একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই; কিন্তু যে খায়, তাহার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাহাতে আবার পাত্ৰাপাত্ৰ বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন—

“বিড়ালক্ষী বিধুসখী, মুখে গন্ধ ছুটে,”

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের চেরা ‘সই’ রহিল—

“সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উকি।

নগী জশী ক্ষেমী বানী রানী শ্যানী গুলকী ॥”

মহারানীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের কাণ ধরিয়া টানাটানি—

“তুমি মা কয়তরু,

আমরা সব পোমা গোত্র,

শিখিনি শিং বাকানো,

কেবল খাব খোল বিচালি দাস।



যেন রাঙ্গা আমলা                      তুলে মানলা  
গামলা ভাঙ্গে না,  
আমরা ভুগি পেলেনই খুগি হব,  
খুগি খেলে বাঁচব না ॥”

সাহেব-বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণ্ডমালা খাইয়াছেন। একটা নমনা—

“ যখন আসবে শমন করবে দমন  
কি বোলে তার বুঝাইবে।  
বুঝি হুট বোলে, বুট পায়ে দিয়ে  
চুকট কুক্রে স্বর্গে যাবে ?”

এক কথায় সাহেবদের নৃত্য-গীত—

“ ওড়ু ওড়ু ওম ওম লাকৈ লাকৈ তাল।  
তারা রারা রারা রারা লাল লাল লাল ॥ ”

সখের বাবু, বিনা সম্বলে—

“ তেড়া হ'য়ে তুড়ি মারে, টপ্পাগীত গেয়ে।  
গোচে-গোচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে ॥  
কোনরূপে পিঙ্গি-বন্ধা—এটোকাটা খেয়ে।  
ওদ্ধ হন বেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে ॥ ”

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস,  
কেবল আনন্দ। তপসে মাছ লইয়া আনন্দ—

“ কমিত কনক কাণ্ডি, কমনীয় কায়।  
গালভরা গোঁপদাড়ি, তপস্বীর প্রায় ॥  
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।  
মোহন-মণির পুভা, মণীর শরীরে ॥ ”

অথবা আনারসে—

“ লুণ মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।  
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি ॥ ”

অথবা পঁচি—

“ সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।  
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে ॥  
হাড়কাঠে ফেলে দিই, ধ'রে দুটি ঠাঙ্গি।  
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যাং ॥  
এমন পঁচির নাম যে রেখেছে বোকা।  
নিজে সেই বোকা নয়, খাড়ে-বংশে বোকা ॥ ”

তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন।  
মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি



সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা—“নস্য-লোগা দধি-চোমার” দল—গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনারিদের ধর্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ।

অনেক সময়ে ঈশুর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্প্রসূত। অশ্লীলতা ঈশুর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। তবে ইহাও জানি যে, ঈশুর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গুহ্যকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি-জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা; তাহা পবিত্র, সত্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহাসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সত্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ধর্ম্মিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি,—অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্ম্মাশ্রয়, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সত্য, সুশীল, সজ্জন—এমন সকল লোকও কুকাজ দেখিয়া রাগিলেই “বদ্‌ জোবান” আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ-প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে, সে সময়ে ধর্ম্মাশ্রয় এবং অধর্ম্মাশ্রয় উভয়কেই অশ্লীলতায় স্থপটু দেখিতাম;—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাশ্রয়; যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল, তিনি পাপাশ্রয়। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশুর গুপ্ত ধর্ম্মাশ্রয়, কিন্তু সেকালে বাঙ্গালী। তাই ঈশুর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর ঈশুর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোণা কাড়িয়া লইয়া তাহার পরিবর্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তারপর যৌবনের যে অমূল্যরত্ন—শুধু যৌবনের কেন?—যৌবনের, প্রৌঢ়বয়সের, বার্ষিক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশুরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশুরের রাগটা রহিয়া গেল। তারপর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া ঈশুরচন্দ্র অনু-কণ্ঠে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অটালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর, সর, পায়সানু ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য পুতিভা লইয়া ভূনওলে আসিয়া শাকানুর অর্ভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুকুর বা মর্কট বরাধে (barouche) জুড়ী জুতিয়া তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্‌দেবী-ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের অন্ধকার-গহবরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু পুতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান্।



ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে—সমাজকে—স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ, তাহা মিটিল না। জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিনশ্ৰুণ উত্তম-মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকালে বাদ্দালীর ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিযুক্ত হইত। বোধ হয়, ইহাদিগের মনে হইত, বিগ্ৰহ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজাদি পুত্তি যে বিগ্ৰহ ও পবিত্র, তাহারই পুত্তি ব্যবহার্য্য;—যে দুরাশ্রা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, তাহা ছাড়া অন্য বিষয়ে অশ্লীলতাও তাঁহার কবিতায় আছে। কেবল রঙ্গাদির জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক-আবটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশকাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সেকালে অশ্লীলতা ভিনু কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর-কবি “চোর-পঞ্চাশৎ” দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা-পার্বণ অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীয় রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী, হাফ-আবড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্তের সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বদ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটুখানি মার্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্য সমাজেই ধূমিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিনু ভিনু, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিনু ভিনু প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে, প্যান্টালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পঞ্চাস্তরে, স্ত্রী-পুরুষে মুখ-চুষনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার; কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য্য—মাতৃপিতৃ-সমন্বয়ে উহা নিব্বাহ হইয়া থাকে। এখন আমাদের সোভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই ছেদ বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিনাতি জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী স্ক্রুটি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী স্ক্রুটি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাদ্দালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পর-স্ত্রীর মুখ-চুষনে আপত্তি নাই, কিন্তু পর-স্ত্রীর অনাবৃত চরণ, আলতা-পরা, মল-পরা পা-দর্শনে বিশেষ আপত্তি।



ইহাতে আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি, এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই।

মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্বত-শৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচিবিরুদ্ধ; স্তন বিলাতি রুচি-অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্য বাবু হয়ত ইহা গুনিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া পর-স্ত্রী-মুখচুষন ও করস্পর্শের মহিমা-কীর্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিনু বকন বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আনাদিগের জননী; তাই তাঁহাকে ভজিভাবে, স্নেহ করিয়া 'মাতা বসুমতী' বলি; আমরা তাঁহার সম্ভান; সম্ভানের চক্ষে, মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—খাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিন্তে পাপ-চিন্তা ভিনু কোন বিগুহ্য ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহেন,—এখানে পাঠকের হৃদয়-নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিগুহ্য নহে,—দেশী রুচিই বিগুহ্য।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা-অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মস্তুর জেলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিগুহ্য, আর বাঁহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা-শকুন্তলার স্রষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প শেখ; আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্যের ন্যায় ঈশুর গুণ্ড ও হান আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিকৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্যা, যথার্থ অশ্লীল এবং বিরজিকর। তাহার মার্জনা নাই।

ঈশুর গুণ্ডের কবিত্ব কি পুকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাঁহার দোষ-গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নহে। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশুর গুণ্ড নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ-মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে; দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি পুকারে, এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই



জীবনী- ও সমালোচনা-দত্ত প্রধান শিক্ষা এবং জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হই যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তি? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভা-গুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিগত কলির অভাবে। এখন ইহা একপ্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রতিভা ও স্রষ্টি পরস্পর সখী; প্রতিভার অনুগামিনী স্রষ্টি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের কলি বুঝাইলাম, কালের কলি বুঝাইলাম এবং পাত্রের কলি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে, পাত্রের কলির অভাবের কারণ (১) পুস্তক-দত্ত সুশিক্ষার অরতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্মিণী, অর্থাৎ যাহার সঙ্গে একত্র ধর্ম শিক্ষা করি, তাহার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচারে এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল, এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশীল তখন কলির বশীভূত হইয়াই অশীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপুবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সভাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশীলতা-দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম।

মানুষটা কে, আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক—কবিতা না হয় এখন থাক। আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না; অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক-পাটক কিছুই নাই। অশীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি-ভরা পঁটার স্তোত্র লেখেন, তপসে মাছের নজা বুঝেন, লেবু-দিয়া-আনারসের পরমভক্ত সুরাপান-সম্বন্ধে \* মুক্তকণ্ঠ—আবার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক।

পরমার্থ-বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্য-পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। অনেকের পক্ষে ঐগুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে দেখিবেন সেগুলি ফরমায়েসি কবিতা নহে—কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। এই সকল গদ্য ও পদ্য পুণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মে একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি বিলাসী হউন, কোন হবিষ্যাতী নামাবলীধারীতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না।

\* সুরাপানের মার্জনা নাই। মার্জনায় আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটি স্মরণ করিতে বলি,—

“একো হি দোষো গুণসমুপাতে নিমজ্জতীলোঃ কিরণেধিবাক্তঃ।”



সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বর-ভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন; যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর পাইবার জন্য কোলে বসিতে বাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন—উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুজবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, মূর্ত্তিমান ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নির্গুণ চৈতন্যমাত্র, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত :—

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।  
আমার জনক তুমি, সবার পুতান ॥  
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।  
এক বার তাহে তুমি নাহি দাও কাণ ॥  
সর্বদিকে সর্বলোকে কত কথা কয়।  
শ্রবণে সে সব রব পুবেশ না হয় ॥  
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি আলা।  
জগতের পিতা হ'য়ে তুমি হ'লে কাল ॥  
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।  
অধীর হ'লেন ভেবে বধির জানিয়া ॥

এ ভক্তের স্বতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র। তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ, সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সনালোচক হইবার যোগ্য নহি।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমানাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দ-যশোদা পুত্রভাবে এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার-সকল আমাদের হইতে এত দূর-সংস্থিত যে, তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান, উদ্ধব, যশোদা বা শারাদাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাদ্রাণায় দুই জন সাধক আমাদের বড় নিকট। দুই জনই বৈদ্য, দুই জনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে পুত্র, সখা, পুত্র বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।



তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার ।  
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত—কুমার তোমার ॥  
পিতৃনামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি ।  
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি ॥  
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয় ।  
তবে কেন গুপ্তভাবে ভাব গুপ্ত রয় ?]

পনশ্চ—আরও নিকটে,—

তোমার বদনে যদি না গরে বচন ।  
কেননে হইবে তবে কথোপকথন ॥  
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপায় ।  
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে গায় দিও তায় ॥]

যাহার এই ঈশ্বর-ভক্তি—যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গ-তৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দক্ক—সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমরা একরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্যাসী, হবিষ্যাশী বা অতোজ্ঞা ছিলেন না। পঁটা, তপ্‌সে মাছ বা আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে—উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বণ না করিয়াছেন :—

লক্ষীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে ।  
কিছু মাত্র সুখ নাই হেন লক্ষী নিয়ে ॥  
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে ।  
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য-অনুসারে ॥  
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে ॥  
পঁাচা ল'য়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে ॥

শাকানু মাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসি-মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতার ভগবদুক্তি এই :—

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্য-সুখপুঁতিবিরুদ্ধনাঃ ।  
দ্বিত্বা রম্যাঃ দ্বিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্ৰিয়াঃ ॥

স্থূলকথা এই—যাহা আগে বলিয়াছি—ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্মের শত্রু। লোভী, পরদেষ্টা অথচ হবিষ্যাশী ভণ্ডের ধর্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্মকে ধর্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন, ধর্ম ঈশ্বরানুরাগে—আহার-ত্যাগে নহে। যে ধর্ম ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহার-ত্যাগকে ধর্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত, তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্মের পুঁতি বিদ্বৈশবশতঃ পঁটার স্তোত্রে, আনারসের গুণ-গানে এবং তপ্‌সের মহিমা-





বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম; নিজে ধান্নিক, বর্ণে খাঁটি, মেকির উপর খড়াহস্ত। ধান্নিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহাও বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা এখন বুঝিলাম।

ঈশুর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথা, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথা, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথা আসিয়া পড়িয়াছিল। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাভিধ্বনিপূর্ণতা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচছটায়, অনুপাস-যমকের ঘটায় তাহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপাস-যমকের অনরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই-ভস্মা থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া, অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়,—পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপাসে অনুরাগ—দেশ, কাল, পাত্র! সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশুর গুপ্তের পূর্বেই কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপাস-যমকে বড় পটু—তাই তাঁহার পাঁচালি লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমত নহে। কিন্তু অনুপাস-যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালিওয়ালার ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার-প্রয়োগের পটুতায় ঈশুর গুপ্তের স্থান তাঁহার পরেই—এত অনুপাস-যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে নাই। এখানেও মাজিত রুচির অভাব-জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপাস-যমক যে সর্বত্রই দুষ্ট, এমত কথা আমি বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুই বাহ্যিক ভাল নহে—অনুপাস-যমকের বাহ্যিক বড় কষ্টকর। রাখিয়া-ঢাকিয়া, পরিমিতভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া-সুঝিয়া, রাখিয়া-ঢাকিয়া ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন দুই-এক বঁদ অনুপাস ছাড়িয়া দেন, রস উছলিয়া উঠে।

ঈশুর গুপ্তের এক-একটি অনুপাস বড় মিঠে,—

বিবিজ্ঞান চলে যান লবেজান ক'রে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশুর গুপ্তের সময়-অসময় নাই, বিষয়-অবিষয় নাই, সীমা-সরহদ্দ নাই—একবার অনুপাস-যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না, আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে তিনি



অস্থিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি। এই দোষ-গুণের উদাহরণ-  
স্বরূপ দুইটি গীত 'বোধেন্দুবিকাশ' হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

রাগিনী বেহাগ—তাল একতাল

কে রে বামা, বারিদবরণী,  
তরুণী, ভালে ধ'রেছে তরুণী,  
কাহার' ধরণী, আগিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ-জয়।  
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,  
মদন-নিধন-করণ-কারণ, চরণ-শরণ নয় ॥  
বামা হাসিছে, ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,  
হহকার-রবে সকল শাসিছে, নিকটে আগিছে,  
বিপক্ষ নাশিছে, গুণিছে বারণ-হয়।  
বামা টলিছে চলিছে, লাবণ্য গলিছে,  
সম্মানে বলিছে, গগনে চলিছে,  
কোপেতে অলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময় ॥  
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,  
করিয়ে ঘোষণা, পুকাশে বাসনা,  
হ'য়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আগবে মগনা নয় ॥

রাগিনী বেহাগ—তাল একতাল

কে রে বামা, মোড়শী রূপসী,  
স্ববেশী, এ যে নহে মানুসী,  
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অগি,  
রূপমগী, চাক্র ভাগ।  
দেখ, বাজিছে রম্প, দিতেছে রম্প,  
মারিছে লক্ষ, হ'তেছে কম্প,  
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীত্তি, চরণে কৃষ্টিবাস ॥  
কে রে করাল-কামিনী, মরাল-গামিনী,  
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী,  
রূপেতে পুতাত করেছে যামিনী,  
দামিনীজড়িত-হাস। •  
কে রে যোগিনী-মদে, রুদ্রির-রদে,  
রূপতরঙ্গে নাচে ত্রিভঙ্গে,  
কুটিলাপাদে, তিমির-অদে, করিছে তিমির নাশ।  
আহা, যে দেবি পর্ব, যে ছিল গর্ব,  
হইল স্বর্ব, গেল রে সর্ব,  
চরণসরোজে পড়িয়ে শর্ব, করিছে সর্বনাশ।



দেখি নিকট-মরণ, কর রে মরণ  
মরণ-হরণ, অভয়-চরণ,  
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর পুকাশ ॥

ঈশুর গুপ্ত অপূর্ব শব্দকোশলী বলিয়া তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব শব্দকোশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে। যখন অনুপাস-যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাক্যনা ভাষা, বাক্যনা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাক্যনা, বাক্যনীর এমন প্রাণের ভাষায় আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজ্ঞানিত কোন বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই; পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর পুবেশ করে। এমন বাক্যনীর বাক্যনা ঈশুর গুপ্ত ভিনু আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশুর গুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব পুকাশ করেন। তাঁহার কবিতায় ‘কেলাকা ফুল’ নাই।

ঈশুর গুপ্তের কবিতা-পুচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী, তাহার বিশেষ কারণ, তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাক্যনা আশাদিগের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি, পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না যে, ভিনু ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাক্যনা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না, বা হইবে না; হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাক্যনা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া, ভিনু ভাষার অনুকরণ-মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা-প্রাপ্ত না হয়, তাহাও দেখিতে হয়। বাক্যনা ভাষা বড় দোটার মধ্য পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। এক দিকে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাদ্দে উল্লান বহিতেছে—কত ‘বৃষ্টদ্যুম্ন-প্রাড্বিবাক-মলিনুচ’ গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকাসকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না; আর এক দিকে ইংরেজির ভরাগাদ্দে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছাড়বার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবাকরজান, ইবোলিউশন, ডিভলিউশন, প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের আলায় দেশ উৎপীড়িত,—মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাক্যনা ভাষার স্রোত বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্তে পড়িয়া লেখক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশুর গুপ্তের রচনার পুচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশুর গুপ্তের আর এক গুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার-সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি-নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা অনেক বিনুগ্ন হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশুর গুপ্তের স্বভাব-বর্ণনা ‘নবজীবনে’ বিশেষ প্রকারে পুশংগিত হইয়াছে। আমরা ততটা পুশংসা করি না। ফলে তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল, তাহার সম্ভেদ



নাই। ‘বর্ষাকালের নদী,’ ‘প্ৰভাতের পদ্য’ প্ৰভৃতি কয়েকটি পুস্তকে তাঁহার পরিচয় পাইবেন।

স্থূল কথা, তাঁহার কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার পুস্তক পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাহারা বিশেষ প্ৰতিভাশালী, তাঁহারা প্ৰায় আপন আপন সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বর গুপ্তও আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন। আমরা দুই-একটা উদাহরণ দিই।

প্ৰথম, দেশবাংসল্য। দেশবাংসল্য পরমধর্ম, কিন্তু এ ধর্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না; কখনও ছিল কিনা, বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাংসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাংসল্যের প্ৰথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাংসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাংসল্য তাঁহাদের মত কলপদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্নের কয় ছত্র পদ্য, ভরসা করি, সকল পাঠকই মুগ্ধ করিবেন :—

মাতৃভাব ভাবি’ মনে                      দেখ দেশবাসিগণে,  
পুনর্পূর্ণ নয়ন বেলিয়া;  
কতরূপ স্নেহ করি’                      দেশের কুকুর ধরি’  
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরের পুতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন। মাতৃভাষা-সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। ‘মাতৃ-সম মাতৃভাষা,’ সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে? ‘বাঙ্গালা বুঝিতে পারি,’ এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না-কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাদম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে,—যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা-অনুশীলনে পরাভুত ইংরেজি-নবিশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরব-বৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এই মহাত্মারা সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, ধর্ম। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মোপদেশ সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্মকে হিন্দুধর্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম বলিয়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গ্রহণ



করিতেছেন, ঈশুর গুণ সেই বিজ্ঞ, পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্মের যথার্থ মর্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাধর্য্য-হেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার পুণীত গদ্যো-পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়।

তৃতীয়। ঈশুর গুণের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, স্মরণে নিরস্ত হইলাম।

১২৯২

## জয়দেব

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আধুনিক বঙ্গে গান বা গীতি-কাব্যের প্রভূত আধিপত্য। ইহার সাহিত্য সঙ্গীতময়; ইহার কাব্য সঙ্গীতময়; ইহার আমোদ-আহ্লাদ, বিলাস-কৌতুক সকলেই সঙ্গীত; ধ্যান, ধারণা, কীর্তন, ভজন,—সঙ্গীতে; ক্রন্দন, কলহ—তাহাও সঙ্গীতে। বঙ্গদেশ যেমন গীতি-কবিতাকে আপনার সর্বাবয়বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়াছে, গীতি-কবিতাও সেইরূপ বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বাঙ্গালির গীতি-কাব্য বাঙ্গালি বিচিত্র বিমানে অঙ্কিত করিয়া ‘এই দেখ’ বলিয়া জগতের সমক্ষে ধরিতে পারে। বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের মধুর পদাবলী, মাধব রামপ্রসাদ প্রভৃতির কালী-কীর্তন, হরঠাকুর প্রভৃতির কবিগান, নিধুবাবু প্রভৃতির টপ্পা—আমাদের গৌরবের সামগ্রী, পরিচয়ের স্থল। ইংরেজি সাহিত্যের আগমে বঙ্গসাহিত্য নূতন পরিচক্ষে নিত্য পরিশোভিত হইতেছে, কিন্তু এখনও গীতি-কবিতা তেমনই উজ্জ্বলা; তেমনই মধুর।

সেই ‘জয় জগদীশ হরে!’—হইতে এই ‘বন্দে মাতরম্!’—পর্য্যন্ত;  
সেই “ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীপে,  
মধুকর-নিকর-কল্লবিত-কোকিল-কুঞ্জিত-কুঞ্জকুটীরে।”—হইতে  
এই “স্বপ্ন-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং  
কুমকুমমিত-ক্রন্দন-শোভিনীং,”—পর্য্যন্ত

এক অনন্ত শ্রোত, অনন্ত প্রবাহ অবিরাম গতিতে, অবিচিহ্ন অবয়বে, দু’কূল ভাগাইয়া কুলু কুলু রব করিয়া, বাঙ্গালির প্রেমভক্তি, বাঙ্গালির অনুরক্তি, বাঙ্গালির কোমল হৃদয়ের কোমল ধর্ম, বাঙ্গালির সরল প্রাণের তরল মর্ম,—এই আট শত বৎসর সমানে বহিয়া



আনিয়া অনন্তের চরণ-পুষ্পে নীত করিতেছে। ইহাই বাঙ্গালির জীবন; ইহাই বাঙ্গালির ইতিহাস। আমরা ভাল বা মন্দ, আর পাঁচ জনে বিচার করুন; আমরা যে কি, তাহা অগ্রে আমাদের বুঝা চাই। আমরা স্বভাবের সৌন্দর্যের গোলাম; গোলাম বটে, কিন্তু পিয়ারের গোলাম; মনিবের হাবভাব, লীলা-লাবণ্য, রস-রস —সকলই বুঝি; তিনি তাঁহার লীলাখেলা আমাদের দেখাইতে ভালবাসেন, আমরা দেখিতে ভালবাসি।

দুঃখও মজায়ে মজায়ে ভোগ করিতে শিখিয়াছি। দুঃখের মজা ক্রন্দনে; আমরা দুঃখে মজিতে জানি, কাঁদিতে জানি। কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে জানি। গাহিতে গাহিতে সুখ-দুঃখের সমাধি-দাতাকে ডাকিতে জানি। স্বভাবের সৌন্দর্য্য-বোধের এই উচ্ছ্বাস, আর সেই সৌন্দর্য্য-উপভোগের উল্লাস, দুঃখের হৃদয়দ্রাবী ক্রন্দন, আর ক্রন্দনের পর নিবেদন, আর সুখ-দুঃখ সকল সময়েই ভক্তিভরে ভগবানের তজন— এই পঞ্চোপকরণে বাঙ্গালির গীতি-কাব্য। আর সেই গীতি-কাব্যই বাঙ্গালির নিত্য জীবন এবং ধারাবাহিক ইতিহাস।

এই অনন্তচারিণী, সুখ-দুঃখ-ভক্তি-বাহিনী সুরধুনী-গীতি-কবিতার অমৃত-ধারার হরিদ্বার-ক্ষেত্র—জয়দেব গোস্বামী। জাহ্নবী সর্বত্রই পুতসলিলা; তথাপি হরিদ্বার সেই পুতবারির পুণ্যতীর্থ। গীতগোবিন্দ সেইরূপ বাঙ্গালির গীতি-কাব্যের অপূর্ব পুণ্যতীর্থ। বাঙ্গালায় যেখানে যে পুবর, শাখা, সম্প্রদায় থাকুক, সকলেরই এক গোত্রে উৎপত্তি। বাঙ্গালায় গীতি-কাব্য একমাত্র জয়দেব-গোত্রজ।

জয়দেব প্রভৃতি বঙ্গে যেরূপ ভক্তি-ক্ষেত্র স্থাপনা করেন, সেইরূপ এক অভিনব সাহিত্য এবং সঙ্গীত-ক্ষেত্রও সংস্থাপন করেন। জয়দেবের ভাষা, জয়দেবের ছন্দ, জয়দেবের পদবিন্যাসপদ্ধতি এবং সঙ্গীত-রীতি, আর পাঁচটা জিনিষের সংঘর্ষণ পাইয়া ক্রমে ক্রমে এই ছন্দোবন্ধময়ী, পদলালিতা-সমন্বিত, সঙ্গীত-জীবন বহুভাষার সৃষ্টি করিয়াছে।

জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা। একটু অনুধাবন করিলেই গীতগোবিন্দের শ্রোতার উহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

“দিনমনি-মণ্ডল-মণ্ডন ভবধণন মুনিজন-মানস-হংস।  
কালিয়-বিষধর-গজ্ঞন জনরঞ্জন যদুকুল-নলিন-দিনেশ ॥  
মদু-মুর-মরক-বিনাশন গরুড়াসন সুর-কুল-কেলি-নিধান।  
অমল-কমল-দল-লোচন ভবমোচন ত্রিভুবন-ভবন-নিধান ॥”

বাঙ্গালির মুখে একরূপ নান-সঙ্গীর্ভন ‘বাঙ্গালা বলিব না ত, কি বলিব?’

“চন্দন-চচ্চিত-নীল-কলেবর-পীতবসন-বনমালী”

আর

“ধীর-সবীয়ে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী”

এইরূপ পদ-সকল চিরদিনই আদর্শ বাঙ্গালা বলিয়া গৃহীত হইবে।





“চল গরি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় শীলনিচোলং”

—দুতীর বুধে এইরূপ ভারতী গুণিলে একটু হাসি পায় ; মনে হয়, দুতী বুঝি আপনার উপদেশের গাভীর্য্য-প্ৰদৰ্শন-জন্যই অনর্থক অনুস্মার দিয়া বাঙ্গালাকে সংস্কৃত করিতেছে। বাস্তবিক, জয়দেবের গানগুলির ভাষা এমনই সহজ, এমনই সরল, এমনই বাঙ্গালার মতনই বটে।

বাঙ্গালা পদ্যের ছন্দ প্ৰধানত দুইটি : পয়ার ও ত্রিপদী। এই দুইটির লঘু-গুরু, ভঙ্গ-অভঙ্গ, কুঞ্চিত-বিস্তৃত, মিত্র-অমিত্র করিয়া সমগ্ৰ বাঙ্গালা কাব্য গ্ৰথিত হইয়াছে। তন্মিহ্ন একাবলী-আদি যে সকল ছন্দ আছে, তাহার প্ৰায় সকলগুলিই বাঙ্গালা ছন্দের পরিবার-মধ্যে পরকীয়া পরিচারিকা,—বাঙ্গালার আসরে না নাচিতে পারে, না গাহিতে পারে ; পঁচটার মিশালে একটু আসর জাঁকাইয়া বসিয়া থাকে মাত্র। আসরের যুড়ী—পয়ার ও ত্রিপদী।

জয়দেবের গীতগোবিন্দে এই দুই ছন্দের পূর্বাভাস স্পষ্টে পরিলক্ষিত হয়।

বাঙ্গালার কোন ছন্দই প্ৰথমে অক্ষরবৃত্তি ছিল না, সকল ছন্দই মাত্রাবৃত্তি ছিল। এক এক চরণে দশ হইতে বিশ পর্য্যন্ত অক্ষরসংখ্যা থাকিলেও ছন্দ সাধারণত পয়ার নামে অভিহিত হইত। একাবলী, দ্বাদশাক্ষরী প্ৰভৃতি ছন্দের পৃথক্ নাম ছিল না। পদ্য-মাত্রকেই পয়ার বলা হইত। দুই চরণে এক পয়ার ; দুই চরণের শেষের দুই অক্ষরে মিল থাকিলে, আর পুঁতি চরণে পঁচ হইতে দশ যে-কোন অক্ষরের পর যতি থাকিলেই চলিবে। যখন চৌদ্দ অক্ষরের চরণ লইয়া পয়ার হইয়াছে, তখনও ছয়, সাত, আট—ইহার মধ্যে যে-কোন অক্ষরের পর যতি থাকিত। এমন কি, ভারতচন্দ্রেও এরূপ আছে। জয়দেবের অনেকগুলি গান এইরূপ পয়ার বলিলেই চলে :—

সরসমস্থলমপি মলয়জপঙ্কজং ।  
পশ্যতি বিঘমিব বপুশি শশঙ্কম্ ॥  
দিশি দিশি কিরতি সজল-কনকজালং ।  
নয়ন-নলিনমিব বিদলিত-নালম্ ॥  
নয়ন-বিঘরমপি কিশলয়তরং ।  
গণয়তি বিহিত-হতাশ-বিকল্পম্ ॥  
তাজ্জতি ন পানি-তলেন কপোলং ।  
বালশশিমিব সায়নলোলম্ ॥  
হরিরিতি হরিরিতি জপতি স্কানং ।  
বিরহনিহিত-মরণেব নিকামম্ ॥

—এইটি চতুর্থ সর্গের গীতাংশ। এইরূপ ঘষ্ঠের, সপ্তমের, নবমের এবং একাদশের অনেকগুলি গীতে দৃষ্ট হইবে। সকল স্থলেই দুই চরণ, শেষে মিল, চরণের মধ্যে যতি, এবং তের, চৌদ্দ বা পনের অক্ষর-মাত্র আছে।

ত্রিপদীতে দুই চরণ এবং চরণের শেষে পরস্পর মিল থাকে। পুঁতি চরণে দুইটি করিয়া মধ্য-যতি থাকে ; তাহাতেই পুঁতি চরণ ত্রিপদী হয়। দুইটি যতি-স্থলে



আবার মিল থাকে। জয়দেবে তিনটি ত্রিপদীর গান আছে :—একটির কিয়দংশ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, ‘দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডল ভবধণ্ডন’ ইত্যাদি। এখনকার দিনে ঐটিকে ভঙ্গ-ত্রিপদী বলিতে হয়। আর একটিরও দুই চরণ (বীরগমীনে ইত্যাদি, এবং চল সখি কুঞ্জ ইত্যাদি) উদ্ধৃত হইয়াছে। এইটি ত্রিপদী, তবে কোথাও পাঁচের পর, কোথাও ছয়ের পর মধ্য-যতি আছে। তৃতীয়টির ভণিতা এইরূপ :—

“ইহ রসতপনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপু-পদসেবকে ।  
কলিয়ুগ-চরিতং ন বসতু দুরিতং কবি-মুপ-জয়দেবকে ॥”

—ঐ তিনটি সম্পূর্ণ গান, ত্রিপদী। এক-আধ চরণ ত্রিপদী অন্য গানের মধ্যেও আছে। জয়দেবের পুসিদ্ধ

“স্বরগরলধণ্ডনং নম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদ-পন্নবমুদারন্”

এইরূপ।

জয়দেবের ভাষা ও ছন্দের সম্বন্ধে বোধ হয় যথেষ্ট বলা হইল। এক্ষেপে তাঁহার গান-সম্বন্ধে কিছু বলিব। বাঙ্গালার কীর্তনাদি সঙ্গীত-নাট্যকণ্ঠের নিকট বড় আদরের জিনিষ, অথচ সাধারণের হৃদয়গাহী। একরূপ হৃদয়দ্রাবিনী করুণা-গীতি জগতে আর আছে কি-না জানি না। কীর্তনে সমজ্জদার অসমজ্জদার নাই। যে কোন ভাবের মানুষ হও না, ভঙ্গ-অভঙ্গ, সাধু-ভণ্ড, মূর্খ-জ্ঞানী, দুঃখি-ধনী—কীর্তন সকলকে সমতলে বসাইবে; হৃদয় গলাইবে; দুই গণ্ড দিয়া দর-বিগলিত ধারা বহাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, দুঃখের মজা ক্রন্দনে। এখন বলি, ক্রন্দনের মজা কীর্তনে। বাঙ্গালি কান্নার মজা জানে বলিয়াই কীর্তন পাইয়াছে; আর কীর্তন পাইয়াছে বলিয়াই কান্নার মজা বুঝিয়াছে। যে কান্দে নাই, সে মানুষ নহে; আর যে কীর্তনে কান্দে নাই, সে বাঙ্গালি নহে। এই কীর্তনের পরিচিত আদিগুরু—জয়দেব গোস্বামী।

জয়দেবের পদাবলী আজি আট শত বৎসর ধরিয়া, সমানে একই ভাবে গীত হইতেছে। আর কোন সঙ্গীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে কি-না, জানি না। বেদের সামগীতি বা দায়ূদের সামগীতি (Psalms) সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গীত হইতেছে বটে, কিন্তু সে সকল মানব-জীবনের অত্যন্ত স্ফূর্তি-ব্যঞ্জক বিকাশ, এবং মানব-হৃদয়ের আশ্চর্য উজ্জ্বল হইলেও সঙ্গীত নহে; তালের খেলা, তানের লীলা, যন্ত্রযোগে সুর-সঙ্গতি, ক্রত বিলম্বিত গতি, এ সকল তাহাতে নাই। সামগানাদি সঙ্গীত নহে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কিন্তু রাগে-তালে, সুরে-লয়ে ভরপুর। এই বিগত আট শত বৎসর বাঙ্গালি সঙ্গীত-চর্চায় শিথিল-পুষ্প হয় নাই; বনের মধ্যে বন-বিষ্ণুপুর দিল্লীর পুতিষ্মিতা করিয়াছে; পাহাড়ের উপর ত্রিপুরা নানা রাগের প্রবপদের স্রষ্টি করিয়াছে; আর বঙ্গ-কেন্দ্র নবদ্বীপে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়াতে, সমগ্র বঙ্গের সর্বত্র গোস্বামী বৈষ্ণবগণ কীর্তনের ঐকান্তিক সাধনা করিয়াছেন। এত সাধনাতেও আধুনিক কীর্তন কিন্তু জয়দেবকে এক বিন্দু অতিক্রম



করিতে পারে নাই। কোরানের ভাষার মত জয়দেবের কীর্তন চিরদিনই অননুকরণীয় এবং অনুপ্রাণনীয় রহিয়াছে, অথচ একই ভাবে সমানে গীত হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছিলাম, আর কোন সঙ্গীতকারের যে এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জানি না। জয়দেব আমাদের আদি অথচ চিরকালই জীবন্ত গুরু।

জয়দেব হইতে যে কেবল বঙ্গের কীর্তনাদ্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এমন নহে,—পাঁচালি পুত্ততিও জয়দেবের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

গান-সমনে গায়কের স্থিতি ও গতি-বিভেদ উপলক্ষ্য করিয়া বাদ্যলায় গান-পদ্ধতির বিভেদ হইয়াছে এবং ভিনু নামকরণ হইয়াছে। গায়কেরা পাদচারণ করিয়া বেড়াইলে পাঁচালি, নাচিয়া নাচিয়া গাহিলে নাচাড়ি, বগিয়া গান করিলে বৈঠকী, ও কেবল দণ্ডায়মান থাকিয়া গান করিলে দাঁড়া-গান। যে-কোন পুকারের গান, গায়ক যে-কোন ভঙ্গিতে গাহিবেন, এমন নহে; এক একরূপ কেতার গান এক একরূপ ধরণে গীত হইত; এখনও প্রায় তাহাই হয়। কৃষ্ণবাসের রামায়ণ প্রধানত পাঁচালি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে পাঁচালি ও নাচাড়ি—দুই আছে; নাচাড়ি অতি অল্প। আমরা যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্মের গানে নাচাড়ি খুব বেশী ছিল। তখনকার ধ্রুবপদ ও ভজন, সঙ্গ সঙ্গ এখনকার খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা—এই সকল প্রধানত বৈঠকী গান। কীর্তন পত্তনে প্রধানত বৈঠকী। প্রাচীন সখী-সম্বাদাদি দাঁড়া-কবি বলিয়া পরিচিত।

প্রাচীন পাঁচালি-পদ্ধতির বক্ষ্যমাণ লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়,—পাঁচালিতে গান থাকে, ও ছড়া বা পয়ার থাকে। ইহাতেই সাধারণ ভাষায় বলে, ‘খানিক তার রাগ-রাগিণী আর খানিক তার মুখ-জবানী।’ পাঁচালিতে যে গান বা ‘পদ’ থাকিত, তাহার মুখটুকু ধ্রুব বা স্থির পদ; ইহাকেই ধূয়া বলিত, আর বাকিটুকু অন্তরা। অন্তরায় দুই, চারি বা অনেক কলি থাকিত, প্রত্যেক কলির পর ধূয়াটি গাহিতে হইত। ছড়ার পর গান, আবার ছড়া, আবার গান, এইরূপ ক্রমাগত থাকে। পুত্তি ছড়া ও তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গান প্রায় একই ভাবের হয়; অর্থাৎ যে বিষয়ের গান সেই বিষয়েরই ছড়া হয়। বর্তমান সময়ে পাঁচালি প্রায় একরূপই আছে, তবে গানের মুখভাগ এখন আর প্রায়ই ধূয়ার মত করিয়া গীত হয় না।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাদ্যালার আদি পাঁচালি বলিলেও চলে। ইহাতে ছড়া, গান, ধূয়া, অন্তরা ঠিক পাঁচালির মতনই আছে; তবে বাদ্যলায় যাহাকে ‘ছড়া’ বলে, সংস্কৃতে তাহাকে ‘শ্লোক’ বলিতে হয়, এই মাত্র প্রভেদ। জয়দেব-কৃত পুঙ্গিঙ্গ দশাবতার-বর্ণনে, ‘জয় জগদীশ হরে।’ এইটুকু ধ্রুবপদ বা ধূয়া। আর—

“পুলক-পয়োনি-জলে মৃতবানসি বেদং

বিহিত-বহিত-চরিত্রমবেদম্।

কেশবমৃত-মীন-শরীর—”



ইত্যাদি দশটি পদ দশটি কলি। পুতি কলির শেষে ধূয়া ধরিতে হয়—‘জয় জগদীশ হরে!’ আর শেষের এই শ্লোকটি ছড়া—

“বেদানুস্মরতে জগন্তি বহতে ভুগোলনুদ্বিজে,  
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে কক্করং কূর্বতে।  
পৌলস্ত্যং জয়তে হনং কনয়তে কারুণ্যমাতনুতে,  
শ্বেচ্ছান্ নুচর্ষয়তে দশাকৃতিকূতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥”

জয়দেবে প্রায়ই অগ্রে গান, তাহার পর সেই বিষয়ের শ্লোক বা সংস্কৃত ছড়া আছে। জয়দেবের দশাবতার-বর্ণনের গানটি ছাড়া আর সকল গানেই আটটি করিয়া কলি এবং এক একটি ধূয়া আছে; শেষের কলিটিতে ভণিতা থাকে, তাহাতে ধূয়া লাগে না।

জয়দেবের গানে এবং শ্লোকে বিভেদ না বুঝিয়া কচিং কোন কোন গায়কে দুই-একটি শ্লোকও গান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাল গায়কে প্রায়ই সেরূপ ভুল করেন না।

গীতগোবিন্দ হইতেই যে ধূয়া-লাগানো গান এবং সেই গান ও ছড়ার মিশালে পাঁচালি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা একরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। অতীত, এ কথা বলিতে পারা যায় যে, ঐরূপ ছড়া, গান ও ধূয়া-মিশ্রিত কোনরূপ ধরণ যে জয়দেবের পূর্ব বঙ্গদেশে ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বঙ্গের কীর্তনাদ্দের সহিত যে গীতগোবিন্দের ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ, তাহা আমরা পূর্বই বলিয়াছি। নাচাড়ি-গান পাঁচালির অঙ্গ, কিন্তু কখন স্বতন্ত্র ছিল কি-না সন্দেহ। তখনও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ,—রামায়ণ, চণ্ডীর গান পুত্ৰতির অঙ্গীভূত হইয়া আছে।

উত্তর-পশ্চিম ও বেহার প্রদেশ ধরিয়া বলিতে গেলে ‘রামযাত্রা’ই আদি-যাত্রা। রামায়ণ ও রামযাত্রা—একই কথা। অগ্নি এবং যাত্রা—দুই কথার একই অর্থ। রামযাত্রা নামের অনুসরণে—‘কৃষ্ণযাত্রা’ কথার সৃষ্টি হয়; ক্রমে অভিনয়-যাত্রাই যাত্রা হইয়াছে। রামায়ণের আদি-গায়ক কুশ ও লবের নামে অভিনেতা যাত্রার নাম কুশীলব হইয়াছে। হিন্দুস্থানের ‘রাম’যাত্রায় এখনও দুই জন বালক কুশীলব—প্রধান গায়ক। এই দুই বালক-অভিনেতার, অর্থাৎ কুশীলবের অনুসরণে বাঙ্গালার যাত্রার যুড়ী হইয়াছে। সমগ্র হিন্দুস্থানে আদি-যাত্রা রামযাত্রা হইলেও ইদানীন্তন বঙ্গে সর্বত্রই কৃষ্ণযাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে। কুশীলবের পরিবর্তে শ্রীদাম-স্ববলের যুড়ী করিয়া কৃষ্ণযাত্রার অবতারণা হয়। বোধ হয়, প্রথম যাত্রায় কালীয়-দমনের পালা গীত হইয়া থাকিবে, নহিলে পূর্ব কৃষ্ণযাত্রা-যাত্রাকেই কালীয়-দমন বলিবে কেন? যদিও জয়দেবের বহুকাল পরে বঙ্গে কালীয়-দমনের সৃষ্টি হয়, তথাপি জয়দেবের পদাবলী কালীয়-দমন যাত্রার জান্ ছিল। প্রথমে পরমানন্দ অধিকারী, তাহার পরে বদন ও গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার মধ্যে জয়দেবের পদাবলী আবৃত্তি করিতেন, ব্যাখ্যা করিতেন, গান করিতেন; মধ্যে মধ্যে ঘটকালি



ও কথোপকথন থাকিত মাত্র। জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মহাজন-পদাবলীও আবৃত্ত, গীত ও ব্যাখ্যাত হইত। এখনও নীলকণ্ঠ গীতরস সেই প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষা করিতেছেন।

বাহ্যলার কবির গান প্রধানত চারি ভাগে বিভক্ত—ঠাকুরণবিষয়, সখীসম্বাদ, বিরহ ও খেঁউড়। তাহার মধ্যে ঠাকুরণ-বিষয় কেবল বন্দনা বলিলেই হয়, আর দুর্গোৎসব-সময়ে বিশিষ্ট লোকের ভবনে কবিগান হইত বলিয়া ঠাকুরণ-বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আগমনী, অষ্টমী, বিজয়া পুভূতি গীত হইত। খেঁউড়, কবির পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল; বাহ্যলার রচিত্র গুণে কবিগান যখন পক্ষ বিস্তার করিয়া বাহ্যলা জুড়িয়া বসিতেছিল, তখন ইহার পুচ্ছধারী হইয়াছিল মাত্র। সুতরাং কবির প্রধান অঙ্গ সখীসম্বাদ ও বিরহ।

দেখিতে গেলে, গীতগোবিন্দের বার-আনা ভাগ সখীসম্বাদ। প্রথম সর্গে মূল গুণ্ডারস্ত্র সখীসম্বাদে—“রাধাঃ সরসমিদমুচে সহচরী।” ইহাতে জয়দেবের পুসিদ্ধ সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণন। প্রথম সর্গের দ্বিতীয় কল্পেও সখ্যাজি—“সখীসমকঃ পুনরাহ রাধিকাম্।” ইহাতে শ্রীহরির রাস-বিলাস-বর্ণন। দ্বিতীয় সর্গে, সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি। ইহাকেও সখীসম্বাদ বলা যায়। তৃতীয় সর্গে, শ্রীহরির স্বগত বিলাপ। আবার চতুর্থ সর্গে, শ্রীহরি-সমীপে সখীসম্বাদ। পঞ্চমে, রাধিকার নিকটে সখীসম্বাদ। ষষ্ঠে, আবার শ্রীহরির নিকটে সখীসম্বাদ। এই তিনটিতে নাগক-নাগিকার বিরহ-বর্ণন। সপ্তমে, রাধিকা স্বগত। সপ্তমের দ্বিতীয় কল্পে, সখীর প্রতি রাধিকা। শেষের শ্লোক কয়টি আবার স্বগত। অষ্টমে, রাধা-কৃষ্ণ-সম্বাদ। নবমে, সখীসম্বাদে রাধিকাকে প্রবোধদান। দশমে, শ্রীহরি-কর্তৃক রাধিকার মানভঞ্জন। একাদশের প্রথম কল্পে, সখীসম্বাদে উপদেশ। একাদশের দ্বিতীয় কল্প হইতে দ্বাদশের শেষ পর্য্যন্ত মিলন। তাহাতেই বলিতেছিলাম, জয়দেবের বার-আনা ভাগ সখীসম্বাদ; তবে মাধুর-সখীসম্বাদ জয়দেবের নাই। জয়দেবের সখী-সম্বাদের প্রায় অর্ধেক বসন্ত-ও বিরহ-বর্ণন। সুতরাং এদিকেও দেখা যায়, জয়দেব হইতেই সখীসম্বাদের ভাবভঙ্গি এবং বিরহের উপকরণ অনুকৃত, আকৃষ্ট ও সংগৃহীত হইয়াছে।

এই সমালোচনায় আমরা একরূপ বুঝিতে পারিতেছি যে, বাহ্যলার কি কীর্তন, কি পাঁচালি, কি যাত্রা, কি কবি—অন্ন-বিস্তর, কোনো-না-কোন বিষয়ে, জয়দেব গোপ্বামীর কাছে সকলেই ঋণী। এখনও বঙ্গের গীতি-সাহিত্য সেই মহাজনের দ্বারস্থ, তাহার নিকট পদানত।

জয়দেব, এক দিক্ দিয়া দেখিলে, যেমন বঙ্গের গীতি-গদ্যস্রোতের হরিদ্বার-স্বরূপ—আমাদের মূল প্রসূর, চির মহাজন মহাপুরু এবং আদিকবি; সেইরূপ অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে, সংস্কৃত-রূপ বিশাল ভারতসাগরে জয়দেবের গীতগোবিন্দ আমাদের গঙ্গাসাগর।



হরিদ্বারই বল, আর গঙ্গাসাগরই বল, জয়দেব উভয় ভাবেই আমাদের পুণ্যতীর্থ। গঙ্গাসাগর বিশাল ভারতসাগরের অতি ক্ষুদ্র অংশ হইলেও আমাদের নিজস্ব সাগর; আমাদের কুল-পাবন, কুল-পাবন।

বঙ্গের সাহিত্য-জগতে জয়দেব আদিগুরু; তিনি গীতিকাব্যের কর্তার। বঙ্গের ধর্ম-জগতে জয়দেব কোমল-কর চন্দ্রমা, চৈতন্যদেব পুনীপ্ত সূর্য্য। এই চন্দ্র-সূর্য্যের আলোক-উদ্ভাপে বঙ্গ-বৈষ্ণবের দিবা-বিভাবরী আলোকিত ও পুনরুজ্জীবিত রহিয়াছে।

[নবজীবন, ১২৯৩]

## বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গ-সাহিত্যের পুথম কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। দুই জনে সমসাময়িক লোক ছিলেন, সমান বিষয় লইয়াই দুই জনের কবিতা—রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহ, মানাভিমান, পূর্ব্বরাগ-অনুরাগ। কিন্তু বিষয় এক হইলেও দুই জন কবির ভাব অবশ্য সম্পূর্ণ এক নহে, দুই জনের বর্ণনার মধ্যে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। বিদ্যাপতি আপন হৃদয়ের মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, আপন রুচি-অনুযায়ী আঁকিয়াছেন, সাজাইয়াছেন; চণ্ডীদাসও নিজের মত করিয়া তাঁহাদিগকে গড়িয়াছেন, নিজের হৃদয়ের ভাব দিয়া তাঁহাদের প্ৰেম বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং হৃদয়ের একই ভাব বর্ণনা করিতে বসিলেও উভয় কবির বর্ণনা যে বিভিন্ন হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। বিদ্যাপতিও রাধার রূপ খুলিয়া বলিয়া গিয়াছেন, চণ্ডীদাসও রাধার রূপের বর্ণনা করিয়াছেন; তাই বলিয়া দুই জনের রূপ-বর্ণনা কি একই রকম? দুই জনেই রাধার রূপের সুখ্যাতি করিয়াছেন, দুই জনেই রাধাকে সুন্দরী বলিয়াছেন, সে সুন্দরী বাদ্রানাদেশের সুন্দরী—সেই কৃষ্ণ কেশওচছ, সেই মৃগলোচন, সেই চন্দ্র-বদন, কিন্তু তথাপি দুই জনের বর্ণনা—কি তফাৎ! এক বর্ণনার মর্মে মর্মে বিদ্যাপতি, আর এক বর্ণনার মর্মে মর্মে চণ্ডীদাস। লেখার সহিত গ্রন্থকার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ জড়িত।

শুধু ভাবের কথা কেন, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের ভাষারও বিস্তর পুভেদ। বিদ্যাপতি হিন্দীর ধারে ধারে ফিরিয়াছেন, তাঁহার অনেক কথা স্পষ্ট হিন্দী; চণ্ডীদাস বাদ্রালী, তাঁহার লেখায় হিন্দী বড় একটা জোর করিয়া উঠিতে পারে নাই, তবে প্রাচীন বাদ্রালার হিন্দীর সহিত সম্পর্ক আছে যে, ইহা বুঝা যায়। বিদ্যাপতি বাছিয়া বাছিয়া



মধ্যে মধ্যে শ্রুতিমধুর কথা সংগ্রহ করেন, তাঁহার সাজ-সজ্জার একটু পারিপাট্য আছে ; চণ্ডীদাস সাদাসিধা, ভাব আগিতেই ছল করিয়া লিখিয়া যান, অন্যদিকে তাঁহার বড়-একটা লক্ষ্য থাকে না। বিদ্যাপতি যেন কিছু গুছাইয়া বসিয়াছেন ; চণ্ডীদাসের কোন দিকে খেয়াল নাই।

বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসকে পুেমের কবি বলা যাইতে পারে। পুেমের সুরে চণ্ডীদাস যেমন গাহিতে পারিয়াছেন, বিদ্যাপতি তেমন পারেন নাই। চণ্ডীদাসের কবিতার সর্বত্রই পুেমের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। সুরের পুতিই তাঁহার এক মাত্র টান নহে। একটা উচ্চ ভাবের পুতি তাঁহার লক্ষ্য আছে—পুেম আর মোহ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ তাহা তিনি জানেন। চণ্ডীদাস তা বলিয়াছেন,

“ পিরীতি না কহে কথা ।

পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে

পিরীতি মিলায় তথা ॥”

বাস্তবিক, পুেম কি যেখানে সেখানে মিলে ? পুেমের দুয়ারে যে প্রাণ বলি দিতে পারে, সেই পুেম পায়। আপনাকে পুেমে চালিয়া দিতে হইবে, পুেমে আর আপনার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। যাহারা সুরের জন্য পুেম চাহে, তাহাদের কপালে সুর উঠে না।

“ সুরের লাগিয়া যে করে পিরীতি

দূর যায় তার ঠাক্রি ॥”

আমাদের বর্তমান একজন কবিও তাহাই বলিয়াছেন, “এরা সুরের লাগি চাহে পুেম, পুেম মেলে না।” চণ্ডীদাস পিরীতিকে সকল রসের সার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,

“ পিরীতি রসের সার ।

পিরীতি রসের রসিক নহিলে

কি ছার পরান তার ॥”

বিদ্যাপতিও পুেমের উপরে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের মত উচ্চভাবের কথা তাঁহার মন্তব্যে পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি কহিয়াছেন,

“ পুেম কারণ জীউ উপেবয়ে

জগজন কো নাহি জানে ।”

পুেমের অন্য জীবন উপেক্ষা করে, বিদ্যাপতি স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি চণ্ডীদাসের উপরি-উদ্ধৃত কবিতায় পুেমের মহান্ ভাব যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যাপতির লেখায় কি এ ভাব তেমন পরিস্ফুট হইয়াছে ? চণ্ডীদাসের কথার ধরণে একটা সরল সুন্দর ভাব আছে, বিদ্যাপতিতে তাহা নাই। কিন্তু পাঠকেরা একেবারে হতাশ



হইবেন না, বিদ্যাপতির দুই একটি গান যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ গৌরব, অন্য কোনও সাহিত্যে বোধ করি তেননাটি নাই।

চণ্ডীদাস প্রেমের আলা বৈশ বুবোন, আলা যাহারা সহিতে পারে না তাহারা প্রেমের রাজ্যে বাস করিবার অযোগ্য। অননই ত প্রেম, সুখের মাঝে কি প্রেম তেনন ফুটিতে পায় ?

“ যিহ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি ।  
যার যত আলা তার ততই পিরীতি ॥ ”

চণ্ডীদাস আর এক স্থলে বলিয়াছেন,

“ সদা আলা যার, তবে ত তাহার  
মিলয়ে পিরীতি ধন । ”

কিন্তু থাক্, শুধু শেষ দুই লাইনের মন্তব্যটুকু দেখিয়া দুই জন কবির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ-রূপে উপলব্ধি করা যায় না। দুই জনের রূপ-বর্ণনা, দুই জনের মিলন-বিরহের ভাব-প্রকাশ, দুই জনের উপমা-অলঙ্কার, এ সকল বিশেষ করিয়া মিলাইয়া দেখিতে হইবে। তবেই না দুই জন কবির স্বাতন্ত্র্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে ? চণ্ডীদাস যে প্রেমধনে ধনী, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় না থাকিতে পারে, কিন্তু আরও কিছু না বলিলে— আরও ভাল করিয়া বিদ্যাপতির রচনার সহিত তাঁহার লেখার তুলনা না করিলে আমরা দুইজন কবির প্রাণ বরিতে পারি না।

চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির সহিত তুলনায় আমরা দুঃখের কবি বলিতে পারি। চণ্ডীদাস যে তাঁহার লেখায় অনবরত দুঃখের কথা পাড়িয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার রচনায়, হয়ত অজ্ঞাতসারে, কেমন একটা দুঃখের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। লেখা দেখিয়া মনে হয়, কবির জীবনে তেমন সুখের প্রসাদলাভ ঘটে নাই। প্রাচীন কবিদিগের সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ চিন্তে আমরা কিছু বলিতে পারি না—যেখানে পণ্ডিতদিগেরই পদস্থলন-সম্ভাবনার অসম্ভাব নাই, সেখানে আমরা জোর করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করি কিরূপে ? কিন্তু বোধ হয়, চণ্ডীদাসের জীবনে দুঃখ-কষ্টের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে। মোক্ষ তাহা হোক বা না হোক, তাঁহার হৃদয় দুঃখভাবগিজ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আপাততঃ সে কথা লইয়া তর্ক করিতে বসিবার আবশ্যকতা দেখি না। কথাটার তর্কের বিশেষ কিছু নাইও।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার রূপে হৃদয় হারাইয়াছেন, রাধার সৌন্দর্য্যে কোনও পবিত্র মহান্ ভাবের বিকাশ দেখিয়া নহে, রাধার রাঙ্গা অধরে, নলিন নয়নেই তিনি আকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম—যদি ইহাকেও প্রেম বলিতে হয়—রূপজ-মোহ মাত্র। অতীন্দ্রিয় ভাবের এখানে সম্পূর্ণ অভাব। এ প্রেম যৌবনের জোয়ারেই টিকিয়া থাকে, তাহার পর যৌবনাবসানে মরিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ গুণের অথবা উচ্চ ভাবের ধার দিয়াও যান নাই। ভোগলালসা



পরিতৃপ্তি বৈ তাঁহার অপর কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় না। এখন দেখিতে হইবে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ রাধার সৌন্দর্য্য কিরূপ দেখিয়াছেন।

বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ ‘রাধার বাহ্যসৌন্দর্য্য’ বৈ কিছুই দেখেন নাই। তিনি রাধার প্রত্যেক অঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়াছেন—অধরের রাঙিমা, নয়নের চাহনি, চরণের গজেন্দ্র গমন। রাধা হাসিয়া কথা বলিতেছেন, সে হাসির সৌন্দর্য্য কিরূপ? না, শরৎ পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার সকল বাহ্যসৌন্দর্য্য এক করিয়া মোটামুটি ভাবে প্রায় দেখেন নাই। কেবল দু’এক জায়গায় রাধাকে এক করিয়া দেখিয়াছেন মাত্র। সেখানে রাধার সহিত নিকলঙ্ক চন্দ্রের তুলনা করিয়াছেন। অন্য উপমাও এক আধটি আছে। কিন্তু সকল উপমাই রাধার বাহিরের জিনিসে—তা’ চন্দ্রেই হোক, বিদ্যুতেই হোক, আর যাহাতেই হোক। শ্রীকৃষ্ণের উপর সে সৌন্দর্য্যের প্রভাব একটা শ্লোকে বেশ ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সে শ্লোকটি,

“সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।

নেঘ-মালা সঙ্গে তড়িত-লতা জন

হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥” ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণও রাধার বাহ্যসৌন্দর্য্য-মুগ্ধ। তিনিও রাধার বদনকমল, হরিণনয়ন দেখিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ বিদ্যাপতির কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধাকে দেখিয়াছেন ভাল করিয়া। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার তাঁহার প্রতি লক্ষ্যই অধিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, সমস্ত রাধাকে দেখিবার—তেমন বিশেষ করিয়া দেখিবার—তাঁহার সুবিধা হইয়া উঠে নাই, কিন্তু খানিকটা রাধাকে তিনি বেশ করিয়া দেখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ রাধার আড়নয়নে ঈষৎ হাসি লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত রাধাকে—আপাদমস্তক—তিনি দেখিতে ভুলেন নাই। রাধাকে ভাগে ভাগে অঙ্গে অঙ্গে ছাড়া এক করিয়াও তিনি অনেকটা দেখিয়াছেন। বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস রাধার মধ্য হইতে দেখিয়া তুলনা দিয়াছেন। যেমন,

“হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,

পসারী পসারল যেন ॥”

এখন এই পূর্ব্বরাগে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কিরূপভাবে রাধাকে দেখিয়াছেন, দেখিতে হইবে। দুই জনের রাধাই হাবভাবশূন্য নহেন। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা ফিকির-কৌশলে দক্ষা অধিক। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ দেখিয়াছেন, রাধার হাসির চাহনি পর্য্যন্ত। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণ দেখিয়াছেন আরও চের। রাধা হাসিয়া তাঁহার পানে ফিরিয়া দেখেন, দূরে গিয়া সখীদিগের ডাকিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণের পানে চাহিয়া লয়েন, ইত্যাদি। শুধু ইহাই নহে, মুক্তাহার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সখীদিগকে



ঝুজা কুড়াইতে বলেন, এই অবসরে তাঁহার শ্যাম-দর্শন হয়। এ রাধা চণ্ডীদাসের রাধা অপেক্ষা পাকা। চণ্ডীদাসের রাধার এতটা কৈ ত শুনা যায় না।

কিন্তু শুধু শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের উপর নির্ভর করিয়া রাধা-সম্বন্ধে এত কথা বলা কি ভাল দেখায়? নায়িকার পূর্বরাগটাও মনোযোগসহকারে দেখা আবশ্যিক। রাধিকাসুন্দরীও ত শ্রীকৃষ্ণে মজ্জগুল। বিদ্যাপতির রাধিকা, চণ্ডীদাসের রাধিকা দুই জনেই শ্যামের রূপে মুগ্ধ, দুই জনেই বাঁশীর সুরে আকুল। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার কথায় এই আকুলতা যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যাপতির রাধায় তেমন হয় নাই। বিদ্যাপতির রাধা সখীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর কথা বলিতেছেন,

“ কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর।  
বাঁশী নিশাস গরনে তনু ভোর ॥  
হঠ সঞ্জে পৈঠয়ে শুবণক মাঝ।  
তৈধনে বিগলিত তনু-মনোলাজ ॥” ইত্যাদি।

আর চণ্ডীদাসের রাধিকা? এক কথায় তাঁহার সব বলা হইয়াছে—“বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা?” তাহিত, এত নাম থাকিতে বাঁশীতে রাধা নামই বাজে কেন? রাধাপেক্ষা কি সংসারে আর মিষ্ট নাম নাই? তাহা ত নয়, নাম ত ঢের আছে। কিন্তু—কিন্তু মাধবের নিকট রাধা বৈ আর নাম নাই। তাই না? তাহা নয়ত কি?

বিদ্যাপতির কবিতায় অনেক কথা বলিয়া একটা ভাব প্রকাশ হইয়াছে, চণ্ডীদাস ভাবটুকু ছুঁইয়া গেছেন মাত্র। আর যেখানে অনেক কথা তিনি বলিয়াছেন, সেখানে ভাবেরও প্রায় বিস্তৃতি লক্ষিত হয়। এই আকুলতার ভাব-প্রকাশক তাঁহার একটা গান আছে। তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিই। পাঠকেরা গুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, এ গান মর্ম্ম বিধিয়া উঠিয়াছে কি না।

“সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।  
কাণের ভিতর দিয়া, মরনে পশিল গো,  
আকুল করিল মোর প্রাণ।  
না জানি কতেক মধু,  
শ্যাম-নামে আছে গো,  
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।  
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,  
কেমনে পাইব সই তারে?  
নাম-পরতাপে যার  
ঐছন করিল গো,  
অঙ্গের পরশে কিবা হয়?  
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,  
যুবতী ধরম কৈছে রয়?”



পাগরিতে করি মনে,      পাগরা না যায় গো,  
কি করিব, কি হবে উপায় ?  
কহে ছিন্ন চণ্ডীদাসে,      কুলবতী কল নাশে,  
আপনার যৌবন যাচায় ॥”

এ আকুলতা, হাসি বাঁশী বাদ দিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নাট্যিকার পূর্বরাগে ঝারকের যে রূপ-বর্ণনা আছে, তাহা দেখিলেও বুঝা যায়, বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস কত উচ্চস্তরের কবি। বিদ্যাপতির বর্ণনায় কেনন যেন একটা ভাবের আঁটসাঁটি আছে বলিয়া বোধ হয়। সব সময়ে ভাবগুলি যেন আপনি আসে নাই—বিদ্যাপতির সংস্কৃত সাহিত্যে দখল ছিল বলিয়া আসিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসে ভাবের কি স্বাভাবিক স্ফুর্তি! হৃদয়ের কি স্বতঃ উচ্ছ্বাস! লেখনী-হস্তে কড়িকাঠের পানে চাহিয়া তাঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। তিনি জ্যোৎস্নাকে চাহিলেন, তাঁহার সন্মুখের কাগজের উপর জ্যোৎস্না ফুটিয়া পড়িল। তিনি কৃষ্ণকে সাজাইতে কোটি যুগ চাহিলেন, তাঁহার কৃষ্ণের অঙ্গুলি-উপরে যুগযুগান্তর প্রতিবিম্বিত হইল। বিদ্যাপতি অধরের রাঙিমা, বদনের ছাঁদটা লইয়াই প্রায় সন্তুষ্ট। চণ্ডীদাস অধরের রাঙিমায় ডুবিতে চাহেন, অধরের হৃদয়ে বসিয়া তাঁহাকে চুম্বনের সুখ অনুভব করিতে হইবে। বিদ্যাপতি বলিলেন, মুখখানি ত বেশ, চাঁদই বা লাগে কোথায়? চণ্ডীদাস বলিলেন, তাহা ত বটেই, কিন্তু শুধু তাহা দেখিয়া কি ফল, একবার চাঁদের হৃদয়ে পুবেশ করিয়া দেখ—দেখিবে, চন্দ্র নিংড়াইয়া যে সারের নার বাহির হইবে, ঐ মুখখানি তাহা দিয়া গঠিত। বিদ্যাপতি দূরে দাঁড়াইয়া বলিলেন; চণ্ডীদাস আপনাকে সেই সৌন্দর্য্যে হারাইয়া বলিলেন।

পাঠকেরা এতক্ষণ মনে করিতেছেন, চণ্ডীদাসের দিকে আমরা কিছু চলিয়া পড়িয়াছি, নহিলে বিদ্যাপতির বিরহ-বর্ণনার এখনও উল্লেখ করা হইল না কেন। আমরা একেবারে কাহারও দিকে চলিয়া পড়ি নাই, তবে ক্রমে ক্রমে সকল কথা বলিব, একেবারে চারিদিক লইয়া আলোচনার বিশেষ সুবিধা বোধ হয় না। বিদ্যাপতির বিরহ ছাড়িবার জিনিস নহে। তাঁহার বিরহের কতকগুলি গান বড়ই চমৎকার ভাবনায়। স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন,

“ সজল নয়ান করি, ॥      পিয়া পথ হেরি হেরি  
তিল এক হয় যুগ চারি ॥”

প্রিয়তমের পথ চাহিয়া দিন আর কাটে না। সময় ত আগেকার মতই চলিয়াছে, আগেকার মতই দিন আসে যায়, কিন্তু রাধার কত যুগ কাটিয়া গেল। পথ পানে চাহিয়া থাকিলে কি তবে যুগ যুগ কাটিয়া যায়? যায় বৈকি। দিন হু হু করিয়া চলিয়া যায়, তবু দিন কুরায় না। রাধারও তিলে তিলে যুগ কাটিয়া যাইতেছে, তাই



তাঁহার দিন কাটিতেছে না। আর এই দিন কাটে না বলিয়াই তাঁহার সজ্জননয়ান।  
রাধার “তিন এক হয় যুগ চারি।”

রাধা যে শুধু সজ্জন নয়নে পথ চাহিয়াই থাকেন, তাহা নহে। বিরহের মধ্যে  
অভিশাপ লাগিয়া আছে। কিন্তু অভিশাপ কাহাকে? কালকে বুঝি? কালকে  
হইলে ত রক্ষা ছিল, কিন্তু রাধা কালকেই বিরহের কারণ ঠাহরেন নাই, তাঁহার লক্ষ্য  
সচেতন পদার্থে। রাধার অভিশাপ শুনিলেই তাহা বুঝা যায়।

“নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস,” পড়ুক তাহার পাশ  
পিয়া নোর যার পাশ বৈসে।”

তাহার পাশে এই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ুক। এ কি সহজ কথা? তাহার বুকে  
শেল বিঁধাইয়া দিলে বুঝি প্রাণের আশ মিটে না, দীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার কোমল হৃদয়  
থাক হইয়া যাক—সে যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিয়া মরুক। রাধা, রাধা, তুমি তাহার হৃদয়ে  
ছুরিকা বিঁধাইয়া দাও, তাহার হৃদয়ের শোণিতে তোমার বিরহ-জ্বালার উপশম কর,  
কিন্তু এ অভিশাপ দিও না গো। এ অভিশাপ তাহাকে—কাহাকে কে জানে?—  
তাহাকে দিও না।

চণ্ডীদাসের রাধাও আগেভাগে অভিসম্পাত করিয়া বসেন। কিন্তু তাঁহার  
আবার এ রোগ কেন? কারণ অবশ্যই আছে।

“সই কেমনে ধরিব হিয়া ?

আমার বঁধুয়া                      আন বাড়ী যায়  
আমার আকিনা দিয়া।

। সে বঁধু কানিয়া                      না চায় ফিরিয়া,  
এমতি করিল কে ?

আমার অন্তর                      যেমন করিছে,  
তেমতি হউক সে ॥

যাহার লাগিয়া                      সব তেয়াগিনু,  
লোকে অপযশ কর।

সেই গুণনিধি,                      ছাড়িয়া পিরীতি,  
আর জানি কার হয় ?

আপনা আপনি,                      মন বুঝাইতে,  
পরতীত নাহি হয়।

পরের পরাণ                      হরণ করিলে  
কাহার পরাণে ময় ?

যুবতী হইয়া,                      শ্যাম ভাঙাইয়া,  
এমতি করিল কে ?

আমার পরাণ                      যেমতি করিছে,  
তেমতি হউক সে।”



পাঠকেরা চণ্ডীদাসের রাধার অভিষাপের সহিত বিদ্যাপতির রাধার অভিষাপের তুলনা করিয়া দেখিলে দুই জনের মধ্যে একটা বিশেষ পুভেদ দেখিতে পাইবেন। দুইজনেরই অভিষাপের মর্ম কি এক নয়? মর্ম একই বটে, দুই জনেই সেই “পিয়া মোর বার পাশে বৈসে” তাহাকে অভিষাপ দিতেছেন। দুই জনেরই শাপের মূল এক। কিন্তু দুই জন এক ভাবে অভিষাপ দিলেও দুই জনের কি তফাৎ! একজন বলিলেন, তাহার পাশে এই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ুক, তাহার হৃদয়ে আর কিছুই বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ নাই, কেবল এই মর্গভেদী অনন্ত যাতনাময় নিশ্বাস সেখানে কাঁদিয়া বেড়াক। আর একজন বলিলেন, আমার হৃদয় যেক্রপ করিতেছে তাহার হৃদয়ও সেইরূপ হোক। তোমার হৃদয় কি করিতেছে তুমিই জান, আমরা তাহা জানিতে চাহি না, কিন্তু পরের হৃদয় তুমি ভাঙিতে চাহ কেন? তোমার হৃদয়ের স্বখশান্তিটুকু কি তাহাকে দিতে পার? কৈ তাহাত চাহ না। তাহা চাহিবে কেন? তবে আর অভিষাপ কিসের? তোমার দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার হৃদয়ে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিয়া মরুক, ইহাই না তোমার বাসনা? তুমি সেই রাধা—বিদ্যাপতির হাত হইতে চণ্ডীদাসের হাতে আসিয়াছ মাত্র, কিন্তু তুমি সেই।

সে যাহা হোক, বিদ্যাপতির বিরহ গানগুলিতে কেমন একটা ভাব আছে। তাহার “এ ভরা বাদর” শুনিলে বর্ষাকালের বিরহের ভাব কেমন যেন হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাহার “সময় বসন্ত, কান্ত রহ” দূরদেশে” শুনিলে বসন্তের বিরহও তেননি কুটিয়া উঠে। কিন্তু বিরহের অথবা মিলনের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বিদ্যাপতির কবিতার মর্মগত একটা কি ভাব আছে, আনাদিগকে দেখিতে হইবে। চণ্ডীদাসের কবিতায় পিরীতি ভরপুর। তাহার কবিতা পিরীতিময়। তাহার ভাব, “পিরীতি নগরে বসতি করিব, পিরীতে বাঁধিব ঘর।” তিনি পিরীতি পিরীতি করিয়া মাতিয়া গিয়াছেন। তাহার গানগুলিতে এত পিরীতি আছে যে, সকলগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলে একখানি রীতিমত পুঁথি হয়। বিদ্যাপতির কবিতাকে চণ্ডীদাসের তুলনায় যৌবনাচছনু বলা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের কবিতায় যৌবনের অভাব দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যৌবনাচছনু নহে। আর বিদ্যাপতিতে কেমন একটা অতৃপ্তির ভাব দেখা যায়। তাহার এই অতৃপ্তির একটা গান একেবারে বিখ্যাত। সে গান আনাদের,

“জনন অবধি হাম                      রূপ নেহারিনু,  
নয়ন নাহি তিরপিত ভেল।  
সোই মধুর বোল                      শুবণ হিঁ শুননু,  
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥  
কত মধুযানিনী                      রভসে গোঁয়াইনু,  
না বুঝনু কৈছন কেল।  
মাখ লাখ যুগ                      হিয়ে হিয়ে রাখনু,  
ভবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥”



এ গানটি আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করি নাই, মধ্যে খানিকটা তুলিয়া দিয়াছি মাত্র।  
বিদ্যাপতির কবিতায় আরও স্থানে স্থানে এই ভাবের বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার  
একটি বাসন্তী বিরহের গানেও আছে,

“অনিমিত্ত নয়নে নাহ-মুখ নিবশিতে  
তিরপিত না ছোয় নয়ান।”

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কথা বলা হইয়াছে। আর অধিক  
বকাবকি করিয়া পাঠকগণের বৈর্যচ্যুতি করিব না। এখন সংক্ষেপে ইঁহাদের সম্বন্ধে  
দুই চারিটি কথা বলিয়া শেষ করা যাক। বিদ্যাপতির কবিতা দেখিলে তাঁহাকে  
পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক, তাঁহার লেখায় সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়া দেখা  
যায়। তাঁহার উপরে জয়দেবের বিশেষ প্রভাব। চণ্ডীদাস ঠাকুরের কাহারও বড়  
প্রভাব দেখা যায় না। জয়দেব তিনি পড়িয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহার  
লেখায় জয়দেবের তেমন প্রভাব ত কৈ লক্ষিত হয় না। চণ্ডীদাসের লেখার স্থানে  
স্থানে তাঁহার নাট্যরসাস্বাদন-ক্ষমতারও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। মানময়ী রাধার  
নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দোতা দেখিলেই আমাদের কথা সপ্ৰমাণ হইবে। চণ্ডীদাসের  
ছন্দ প্রায়ই কিছু ছুটন্ত; বিদ্যাপতি কিছু ধীর। কিন্তু লেখা দেখিয়া চণ্ডীদাসকে  
যেমন সহজে চেনা যায়, বিদ্যাপতিকে তেমন সহজে ধরা যায় না। চণ্ডীদাস আপনার  
লেখায় ফুটিয়াছেন অধিক।

[ভারতী, ১২৯৬]

## প্যারীচাঁদ মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বান্দালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বান্দালা সাহিত্যের  
এবং বান্দালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। কথাটা বুঝাইবার জন্য বান্দালা  
গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্তব্য।

একজনের কথা অপরকে বুঝানো যে ভাষা-মাত্রেরই উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক।  
কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প  
লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল। সংস্কৃতে কাদম্বরী-পুণেতা  
এবং ইংরাজিতে এমর্গনের রচনা প্রচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক যে, বহু কষ্ট স্বীকার  
না করিলে, কেহ তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কোন রস পায় না। অন্যে তাঁহার গ্রন্থ



পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, একরূপ যে-লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ-পুণ্যন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ-বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। মহা-পুতিভাষালী কবিগণ তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ উন্নত ভাব-সকল তদুপযোগী উন্নত ভাষা ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না ; এই জন্য অনেক সময়ে, মহাকবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কার-স্বরূপ পদ্যে সে সকলকে বিভূষিত করেন।\* কিন্তু গদ্যের একরূপ কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ-সাতজন-মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্বে, বাঙ্গালার সচরাচর পুস্তক-রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না ; কেন-না, হস্তলিখিত গদ্য-গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহাদের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য-বাঙ্গালা-গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পরে যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিনু। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিনু ভাষায় পরিণত হইয়াছিল ; একটির নাম সাধু ভাষা, অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা, অর্থাৎ সাধু ভিনু অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্বলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য-অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিনু অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না—'খদির' বলিতেন ; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'মি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ধূতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না—'রত্না' বলিতে হইবে। কলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময়ে 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিনু 'শুশুক' শব্দ নুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানেন না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যখন এইরূপ ছিল, তখন তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা

\* করি যদি ভাষার উপর প্রকৃতরূপে প্রভু স্বাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে মহাকাব্যও অতি প্রাচীন ভাষায় রচিত হয়। সংস্কৃতে রামায়ণ ও কালিদাসের মহাকাব্য-সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু একরূপ সুখবোধ্য কাব্যও সংস্কৃতে আর নাই।



বলা বাহুল্য। একরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ পুণীত হইলে, তাহা তখনই বিনুপ্ত হইত ; কেন-না, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা পুথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার-প্ৰাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্যা নহে। বিশেষতঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি স্নমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই একরূপ স্নমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল পুকার কথার এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল পুকার ভাব পুকাশ করা যাইত না এবং সকল পুকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্য ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন পুথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন পুকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেননই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার-সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিনু বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই পুগব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, জাতিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতালপঞ্চাশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্তী। বাঙ্গালি লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্তপুসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুসৃত, অতএব তাঁহারা পুশংসা ব্যতীত অপুশংসার পাত্র নহেন ; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।

এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি-কর্তৃক ব্যবহৃত, পুথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-পুণ্যনে ব্যবহার করিলেন ; এবং তিনিই পুথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক



‘আলালের ঘরের দুলাল’ নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আলালের ঘরের দুলাল বাদ্দ্দালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাদ্দ্দালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাদ্দ্দালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি-না সন্দেহ।

আমি এমন বলিতেছি না যে, আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আদর্শ-ভাষা। উহাতে গাভীরোঁয়ের এবং বিগ্গানের অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব-সকল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কি-না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাদ্দ্দালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে-বাদ্দ্দালা সর্বজন-মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃত-ন্যায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্ভেদ, এ ভাষার তাহা সহজ ও গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাদ্দ্দালি জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাদ্দ্দালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাদ্দ্দালা ভাষার এক সীমায় তারাগুরুদের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ-ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাদ্দ্দালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ-দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে, একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা-দ্বারা আদর্শ বাদ্দ্দালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাদ্দ্দালা গদ্যের স্রষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাদ্দ্দালা গদ্য যে-উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাদ্দ্দালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, বাদ্দ্দালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি আলালের ঘরের দুলাল। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি।

অতএব বাদ্দ্দালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। এই কথাই আমার বক্তব্য।



# বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে কালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্যরূপে স্বধাতাও হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সম্মান-আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিক্রপ গুলি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের স্রুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে-লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারই আপন ধ্বংস গোপন করিবার পুরাণে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্য-ভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ট হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ধ্বংসী, তাহার হিসাব বিচিহ্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, তখন সাহিত্য-প্রভৃতি-সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্তমান কালের নূতন ভাব-প্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যের যেমন প্রাচীনত্ব উপস্থিত, আমাদের সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্য সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্বের কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই স্রুতি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলে-বন্ধাওলি, সেই বালক-ভুলোনো কথা—কোথা হইতে আগিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আঘাতের প্রথম বর্ষার মত “সমাগতো রাজবদু-নুতধ্বনিঃ।” এবং মুম্বলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিনী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে-একটি আশার আনন্দ নূতন হিলোলিত



হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়াছিলেন ; সেই জন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয় । মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই । সে জীবনের বেগ আর নাই । কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক । প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনও স্থায়ী হইতে পারে না । সেই নব আনন্দ নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্তমানের তুলনা করাই অন্যায় । বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয়, সে-রাগিণী চিরদিনের নহে । সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্তব্যমিশ্রিত দুঃখস্বখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবৃত্তিত বিরহমিলন—তাহার পর হইতে গভীর গভীরভাবে নানাপথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর নহবৎ বাজিবে না । তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে ।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যে-দিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করিয়াছিলেন, সেই দিনের সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ উৎসব আমাদের মনে আছে । সেদিন আর নাই । আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । আজ কোনো দিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোনো দিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে ।

এইরূপ হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যিক । কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল, সে-কথা স্মরণ করিতে হইবে । আমরা আত্মাভিমানে সর্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই ।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না । কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই । এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে, রামমোহন রায় তাহারও পথ-প্রদর্শক । যখন নবশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃত-প্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন ।

বঙ্গদেশ অন্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহেন না । রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রাণিট্‌স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন । আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে । বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে । এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে ।



মাতৃভাষার বন্ধাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙালীর যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে-কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয়, তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জন করা যাইতে পারে, সে-কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এই জন্য কেবল জ্ঞানীলোক ও বালকের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা-সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞানিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা রেভেরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পূর্ব্বতন এন্ট্রেন্স-পাঠ্য বাংলা-গ্রন্থে দস্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য্য, কতটা মহিমা প্রচলিত ছিল, তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফুটিল পাইত না। যেখানে মাতৃভাষায় এত অবহেলা, সেখানে মানবজীবনের গুরুতা, শূন্যতা, দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বন্ধিনচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিত বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন, তাহা তাঁহারই পুসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরাজীতে দুইছত্র লিখিয়া অভিমানে স্কীত হইয়া উঠিতেন। ইংরাজি-সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মতো বালির বাঁধ নির্মাণ করিতেছেন, সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বন্ধিনচন্দ্র যে সেই অভিমানে সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিশ্বজ্ঞানের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কী হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতাসম্বন্ধেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির পুলোমন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরিচিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা-উদ্যম-ক্ষমতাকে পুরণ করা কত বিশৃঙ্খল এবং কত সাহসের বলে হয়, তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্ব বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজ্ঞাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্য-গর্ব্ব সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।





তখন পূর্বে যাঁহার। অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহার। বঙ্গভাষার যৌবন-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন, তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সন্মুখে বর্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ-খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপূতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মহাহ্রয়ের কৰ্ম্ম। চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছু নাই; তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণ-শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কৰ্ম্ম, তাহা এখনকার সাহিত্য-ব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে-শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না, তখন আপনাকে নিয়মব্রূতে বদ্ধ করা মহাসম্বলোকের দ্বারাও সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবে যে-কার্য্য করিলেন, তাহা অত্যাশ্চর্য্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চ-নীচতা, তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহার। কাক্সনজ্জ্বার শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহার। জানেন সেই অবভেদী শৈলগুণাটের উদয় রবিরশ্মি-সমুজ্জ্বল তুঘারকিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তর গিরিপারিঘদবর্গের কত উজ্জ্বল সমুদিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শুদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন, অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শুদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত, তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ড বিধান করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্শ দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরো কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিন্তা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোকে যে এক লক্ষে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে



অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখন দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময়ে সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠন-কার্য্যে আর এক হস্ত নিবারণ-কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি আলাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সম্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুক্ল বৃত্তান্তানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপূরণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হোক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না, তাহা নহে; কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজ্ঞেয় বল, কর্তব্যের পুতি নিষ্ঠা এবং নিজের পুতি বিশ্রাস ছিল। তিনি জানিতেন, বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিনাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যুহ হইতে তিনি অনায়াসে নিজ্রমণ করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল তিনি অম্মানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনো দিন তাঁহাকে রথ-বেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই।

সাহিত্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং কর্ম্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা—যেন যথালভের মতো।

কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার পুতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ পুস্ত্রত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্দ্রস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, গাঙ্গনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে; তিনি দপ হারীও ছিলেন। এখন যাহার বঙ্গসাহিত্যের সারথী স্বীকার করিতে চান, তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যাঙ্গিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ





ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অগ্রাবাহ্য আছে, সে-আবাহ্যে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী পুতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে একরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি, বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের পুতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথকীকরণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসন্দেহে করিয়াছেন যে, এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বিশেষত দুই শত্ৰুর মাঝখান দিয়া তাঁহাকে পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছে। একদিকে, যাহারা অবতার মানেন না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পুতি দেবদ্বারোপে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অন্যদিকে, যাহারা শাস্ত্রের পুত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারের পুত্যেক পৃথাকে অগ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাও বিচারের লোহাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া কাটিয়া কুদিয়া কুদিয়া মহত্তম মনুষ্যের আদর্শ-অনুগারে দেবতা-গঠনকার্য্যে বড় পুণ্য হন নাই। একরূপ অবস্থায় অন্য কেহ হইলে কোনো এক পক্ষকে সর্ব্বতোভাবে আপন দলে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সাহিত্যমহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের পুতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের পুতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি বাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত পুতল আছে। যথার্থ করনা, যুক্তি সংঘম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র, কিন্তু তাহা অদ্রুত আতিথ্যে অদ্রুতরূপে স্ফীতকার। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প, তাহারা সাহিত্যের পুরা এই পুণ্ড্রিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে—কারণ, ইহা দেখিতে পুকাও কিন্তু পুস্তপক্ষে অত্যন্ত লবু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরিপরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্য মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়া পড়েন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।

এইরূপ অপরিমিত অসংযত করনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কৃষ্ণচরিত্রে উদ্ধামভাবে আবেগে তাঁহার করনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। পুণ্যম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসম্বরণ-পূর্ব্বক যুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। বাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পুতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, বাহা লিখেন নাই তাহাতেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।

বিশেষত বিষয়টি এমন, যে, ইহা কোনো সাধারণ বাঙালী লেখকের হস্তে পড়িলে তিনি এই সুযোগে বিস্তর হরি হরি, মরি মরি, হারি হারি, অশ্রুপাত ও পুবল অদ্রুতঙ্গী



করিতেন এবং কল্পনার উচ্ছ্বাস, ভাবের আবেগ এবং হৃদয়াতিশয্য প্রকাশ করিবার এমন অনুকূল অবসর কখনই ছাড়িতেন না ; সুবিচারিত তর্ক দ্বারা, স্বকঠিন সত্যনির্ণয়ের স্পৃহা দ্বারা পদে পদে আপন লেখনীকে বাধা দিতেন না ; সর্বজনগন্য সরল পথ ছাড়িয়া দিয়া সুস্বাদু বুদ্ধি দ্বারা স্বকপোলকল্পিত একটা নূতন আবিষ্কারকেই সর্বপ্রাধান্য দিয়া তাহাকেই বাস্তবচর্য্য এবং কল্পনাকুহকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেন, এবং নিজের বিশ্বাস ও ভাষাকে যথাসাধ্য টানিয়া বুনিয়া আশে পাশে দীর্ঘ করিয়া অধিক পরিমাণ লোককে আপন মতের জালে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

বস্তুত আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস-উদ্ধারের দুরূহ তার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন ! এক দিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মগূহণে যুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্যদিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার-সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সঙ্কোচ ; একদিকে রীতিনীতি পরিচয়ের অভাব, অন্যদিকে অতিপরিচয়জনিত অভ্যাগ ও সংস্কারের অন্ধতা ; যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয়সঙ্কটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশো-নুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে বল্লার ইন্দ্রিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে, সেই বল্লার আকর্ষণে তাহাকে সর্বদা সংযত করিতে হইবে। এই সকল ক্ষমতা-সামঞ্জস্য বঙ্কিমের ছিল।—সেই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ পুরাণ সংগৃহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন বঙ্গসাহিত্যের বড় আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে-আশা সফল হইতে দিল না, এবং আমাদের ভাগ্যে যাহা অসম্পন্ন রহিয়া গেল, তাহা যে কবে সমাধা হইবে কেহই বলিতে পারে না।

বঙ্কিম এই যে সর্বপ্রকার আতিশয্য এবং অসঙ্গতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতিগত। যে-কেহ তাঁহার রচনা পড়িয়াছেন, সকলেই জানেন, বঙ্কিম হাস্যরসে সুরসিক ছিলেন। যে পরিহার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসঙ্গতি প্রকাশ হইয়া পড়ে, হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি রশ্মি। কতদূর পর্য্যন্ত গেলে একটি ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া উঠে তাহা সকলে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু যাহারা হাস্যরস-রসিক তাঁহাদের অন্তঃকরণে একটি বোধশক্তি আছে যদ্বারা তাঁহারা সকল সময়ে নিজের না হইলেও অপরের কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যে সুসঙ্গতির সুক্ষ্ম সীমাটুকু সহজে নির্ণয় করিতে পারেন।

নির্ভুল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্যরসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাঙ্গনে বসিয়া শূন্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ানি করিয়া সভাঙ্গনের মনোরঞ্জন করিত। আদিরসেরই সহিত যেন তাহার কোনো একটি সর্ব-উপদ্রবসহ বিশেষ কুটুস্থিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিক্রম প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্ভ বিদুষকটি





যতই প্রিয়পাত্র থাক্ কখনও সম্মানের অবিকারী ছিল না। যেখানে গভীরভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত, সেখানে হাস্যের চপলতা সর্বপ্রথম পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নত করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে, কেবল পুঙ্খনুপুঙ্খের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল ও মনোহর হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে-বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুত উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগৃত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসঙ্গতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সুক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যিক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্যের একটি সুন্দর সম্মিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীরপুরুষের মনে যে রূপ একটি সসম্মত সম্মানের ভাব থাকে, তেমনই সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্তমান লেখক যে-দিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপূর্ণতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুণ্ডে কলেজ-রিয়ুনিয়ন্ নামক মিলন-সভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভালো স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধনওলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকোতুকপুরুষ মুখ গুহ্মধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান-পরিহিত বন্ধের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আয়তনহীন বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতুহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে, প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক বার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী-স্নেহের কোমলহাস্যে অত্যন্ত কমনীয়



হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু পুথন দশ নে সেই যে তাঁহার মুখের উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল স্ত্রীক্ষু পুৰনতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব-উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পণ্ডিত ভারতগভানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে-রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্দ্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া অতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন। বঙ্কিমের সেই সসঙ্কোচ পলায়ন-দৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাক্রিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশুর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন, বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে-সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনো প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হোক, ঠিক স্ক্রুটি-শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে-সময়কার অসংযত বাগ্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বঙ্কিত হইয়া ইতরতার পুতি বিদ্বেষ, স্ক্রুটির পুতি শ্রদ্ধা এবং শীলতা-সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধ রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা পুকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশুর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরধাণে আবদ্ধ, তাহা যেন কোন কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বন্ধভাষা কেবল একতার। যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম সঙ্কীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণায়ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বমতায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অন্দের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত কোড়িসঙ্গিনী বন্ধভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুঃখের জীবনযজ্ঞের অবসানে নিবিবকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল পুসনুতা, একটি সর্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্ন-রৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহ-সুশীতল জননীকোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ-পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই পুতিভাজ্যোতির্ময় সৌম্য পুসনুমুষ্টি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য।



বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শ প্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়ী-রূপে প্রতিষ্ঠিত হোক। পুস্তকের মুক্তি স্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গ-হৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। ইংরেজ এবং ইংরেজের আইন চিরস্থায়ী নহে; রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, সমাজনৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্তিত হইতে পারে; যে-সকল ঘটনা যে-সকল অনুষ্ঠান আজ সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে, কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে; কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অনূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সাধনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চিরসৌন্দর্যের অক্ষয় আকর উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যাহা-কিছু অমর এবং আমাদেরকে যাহা-কিছু অমর করিবে, সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার, প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আমাদের নিকট যাহা পুশংগিত কালক্রমে শিক্ষা, কৃতি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তর পুরুষের নিকট তাহা নিম্নিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে ভাবমন্ডাকিনীর অবতারণা করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য-স্রোতঃস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভগ্নরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন—ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ-কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা কচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের স্নহৃদ, এবং স্নহৃদা স্নকলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সম্রাটের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সারাহু আসিবার পূর্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিমিত প্রতিভা-রশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যাকাশ ক্রীণতর জ্যোতিকমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিম দিগন্তসীমায় অকালে অন্তমিত হইলেন।



# বিহারীলাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত নির্জনে নিভূতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক-সমাজের দ্বারবর্তী হইত না।

কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজ্ঞানবাণী ভাবনিমগ্ন কবির সঙ্গীত-কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, তাহাদের নিকটে আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।

বঙ্গদর্শন-প্রকাশ হইবার বহুপূর্বে কিছুকাল ধরিয়া অবোধবন্ধু নামক একটি মাসিক পত্র বাহির হইত। তখন বর্তমান লেখক বালক-বয়স-প্রযুক্ত নিতান্ত অবোধ ছিল। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তিসহকারে যখন বোধোদয় হইল, তখন উক্ত কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে পত্রগুলি কতক বাঁধানো কতক-বা খণ্ড আকারে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আলমারির মধ্যে রক্ষিত ছিল। অনেক মূল্যবান গ্রন্থাদি থাকাতে সে আলমারিতে চপলপ্রকৃতি বালকদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষণে নির্ভয়ে স্বীকার করিতে পারি,—অবোধবন্ধুর বন্ধুত্ব-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সে নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছিলাম। এই গোপন দুর্দর্শের জন্য কোনোরূপ শাস্তি পাওয়া দূরে থাক, বহুকাল ধরিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখনো বিস্মৃত হই নাই।

এই ক্ষুদ্র পত্রে যে-সকল গদ্যপ্রবন্ধ বাহির হইত, তাহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। তখনকার বাংলা গদ্যে সাধুভাষার অভাব ছিল না, কিন্তু ভাষার চেহারা ফোটে নাই। তখন বাঁহারা মাসিক পত্রে লিখিতেন তাঁহারা গুরু সাজিয়া লিখিতেন; এই জন্য তাঁহারা পাঠকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই এবং এই জন্যই তাঁহাদের লেখার যেন একটা স্বরূপ ছিল না। যখন অবোধবন্ধু পাঠ করিতাম তখন তাহাকে ইন্ধুলের পড়ার অনুবৃ্ত্তি বলিয়া মনে হইত না। বাংলা ভাষার বোধ করি সেই পুথন মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল, যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদ-বৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণ-সঞ্চারের ইতিহাস বাঁহারা পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাত-সূর্য্য বলা যায়, তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারি বলা যাইতে পারে।

সে প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুণ্ডে বিচিত্র কলগীত কুজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উমালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।



ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই পুখম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।

রাত্রির অন্ধকার যখন দূর হইতে থাকে, তখন যেমন জগতের মূর্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে—সেইরূপ অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং পদ্যে যেন প্রতিভার প্রত্নমুকিরণে মূর্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়া গেল,—

“সর্বদাই হু হু করে মন,  
বিশু যেন মরুর মতন ;  
চারি দিকে ঝালাপালা,  
উঃ কি অলসত আলা !  
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ-মতন।”

আম্নিক বঙ্গসাহিত্যে এই পুখম বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্ম-নিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা বিরল, এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।

বিহারীলাল তখনকার ইংরাজিভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণ নাগঙ্গুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভূতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাহার সেই স্বগত উজ্জ্বলিত, দেশহিত অথবা সভ্যমানবজ্ঞানের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এই জন্য তাহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।

পাঠকদিগকে এইরূপে বিশ্রুতভাবে আপনার নিকটে টানিয়া আনিবার ভার পুখম অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং অবোধবন্ধুর কবি বিহারীলালের কাব্যে অনুভব করিয়াছিলাম। পোল-বর্জিনিতে ( *Paul and Virginia* ) যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির নিকট-পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম, বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মনে আছে, নিম্ন-উদ্ধৃত শ্লোকগুলির বর্ণনায় এবং সঙ্গীতে মনশ্চকের সমক্ষে সুন্দর চিত্রপট উদ্ঘাটিত হইয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিত :—

“কভু ভাবি কোন স্বপ্নার,  
উপলে বন্ধুর যার ধার ;  
প্রচণ্ড প্রতাপ-ধ্বনি,  
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি  
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার ;—



গিয়ে তার তীরতরু-তলে,  
 পুরু পুরু নদর শাঘলে,  
 ডুবাইয়ে এ শরীর,  
 শব-সম রব স্থির—  
 কান দিয়ে জল-কলকলে ।  
 যে সময় কুরঙ্গিণীগণ,  
 সবিস্ময়ে মেলিয়ে নয়ন,  
 আমার সে দশা দেখে',  
 কাছে এসে চেয়ে থেকে  
 অশ্রুজল করিবে মোচন ;—  
 সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে,  
 তাহাদের গলা জড়াইয়ে,  
 মৃত্যুকালে মিত্র এলে  
 লোকে যেমি চক্ষু মেলে,  
 তেমিতর থাকিব চাহিয়ে ।”

কবি যেমন—‘হ হ’—করার কথা লিখিয়াছেন তাহা কি প্রকৃতির, বলিতে পারি  
 না । কিন্তু এই বর্ণনা পাঠ করিয়া বহির্জগতের জন্য একটি বালক-পাঠকের  
 মন হ হ করিয়া উঠিত । ঋণার ধারে জলশীকর-সিক্ত স্নিগ্ধশ্যামল দীর্ঘকোমল ঘনকাশের  
 মধ্যে দেহ নিমগ্ন করিয়া নিস্তরুভাবে জল-কলধ্বনি শুনিতে পাওয়া একটি পরম  
 আকাঙ্ক্ষার বিষয় বলিয়া মনে হইত ; এবং যদিও জ্ঞানে জানি যে, কুরঙ্গিণীগণ কবির  
 দুরূখে অশ্রুপাত করিতে আসে না এবং সাধ্যমতে কবির আলিঙ্গনেও ধরা দিতে চাহে  
 না, তথাপি এই নির্ঝরপাশে ঘনশ্রুতটে মানবের বাহ্যপাশবন্ধ মুক্ত কুরঙ্গিণীর দৃশ্য  
 অপেক্ষ সৌন্দর্য্য হৃদয়ে সম্ভববৎ চিত্রিত হইয়া উঠিত :—

“কতু ভাবি পল্লীগামে যাই,  
 নাম-ধাম সকল লুকাই ;  
 চাঘীদের মাঝে রয়ে,  
 চাঘীদের মত হয়ে,  
 চাঘীদের সঙ্গেতে বেড়াই ।  
 প্রাতঃকালে মাঠের উপর,  
 শুষ্ক বায়ু বহে ঝরু ঝরু ।  
 চারি দিক্ মনোরম,  
 আনোদে করিব শ্রম ;  
 স্তম্ভ সফূর্ত হবে কলেবর ।  
 বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,  
 শাদা সোজা গুম্য গান ধরি,



সরল চাখার গনে,  
 পুনোদ-পুফুল মনে  
 কাটাইব আনন্দে শব্দরী।  
 বরষার যে ঘোরা নিশায়,  
 সৌদামিনী নাতিয়ে বেড়ায়;  
 ভীষণ বজ্রের নাদ,  
 ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,  
 বাবু সব কাঁপেন কোঠায়;  
 যে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,  
 নড়বোড়ে পাতার কুটীরে,  
 স্বচ্ছন্দে রাজার নত  
 ভূমে আছি নিদ্রাগত;  
 প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।”

কলিকাতার ছেলে পল্লীগামের এই সুখময় চিত্রে যে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কিছুই নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, অসন্তোষ মানবপুষ্কৃতির সহজাত। অটালিকার অপেক্ষা নড়বোড়ে পাতার কুটীরে যে সুখের অংশ অধিক আছে, অটালিকা-বাসী বালকের মনে এ মায়া কে জন্মাইয়া দিল? আদিম মানবপুষ্কৃতি। কবি নহে। কবিকে যিনি ভুলাইয়াছেন, সেই মহামায়া। কবিতায় অসন্তোষ-গানের বাহুল্য দেখা যায় বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু দোষ কাহাকে দিব? অসন্তোষ মানুষকে কাজ করাইতেছে, আকাঙ্ক্ষা কবিকে গান গাওয়াইতেছে। সন্তোষ এবং পরিতৃপ্তি যতই প্রার্থনীয় হোক্ তাহাতে কার্য্য এবং কাব্য উভয়েরই ব্যাঘাত করিয়া থাকে। অ যেমন বর্ণমালার আরম্ভ এবং সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত, অসন্তোষ ও অতৃপ্তি সেইরূপ সৃজনের আরম্ভে বর্তমান এবং সমস্ত মানবপুষ্কৃতির সহিত নিয়ত সংযুক্ত। এই জন্যই তাহা কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কবিদিগের মানসিক ক্রিপ্ততা বা পরিপ্রাকশক্তির বিকারবশত নহে। কৃষক-কবি যখন কবিতা রচনা করে, তখন সে মাঠের শোভা, কুটীরের সুখ বর্ণনা করে না—নগরের বিষয়াজনক বৈচিত্র্য তাহার চিত্ত আকর্ষণ করে—তখন সে গাহিয়া উঠে,—

“কি কর বানিয়েছে সাহেব কোম্পানি!  
 কলেতে ধোঁয়া ওঠে আপনি—সজনী।”

কলের বাঁশী যাহারা শুনিতেছে মাঠের ‘বাঁশের বাঁশরী’ শুনিয়া তাহারা ব্যাকুল হয় এবং যাহারা বাঁশের বাঁশরী বাজাইয়া থাকে কলের বাঁশী শুনিলেই তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। এই জন্য সহরের কবিও সুখের কথা বলে না, মাঠের কবিও আকাঙ্ক্ষার চাঞ্চল্য গানে পুকাশ করিতে চেষ্টা করে।

সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারীলালের আর একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা। ভাষার পুতি আমাদের অনেক কবির কিয়ৎ পরিমাণে অবহেলা আছে।



বিশেষত মিত্রাকর ছন্দের মিলটা তাঁহারা নিতান্ত কায়ক্রেমে রক্ষা করেন। অনেকে কেবলমাত্র শেষ অক্ষরের মিলকে যথেষ্ট জ্ঞান করেন এবং অনেকে ‘হয়েছে,’ ‘করেছে,’ ‘ভুলেছে’ প্রভৃতি ক্রিয়াপদের মিলকে মিল বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। মিলের দুইটি প্রধান গুণ আছে : এক তাহা কর্ণ তৃপ্তিকর, আর এক অভাবিতপূর্ব্ব। অসম্পূর্ণ মিলে কর্ণের তৃপ্তি হয় না, সেটুকু মিলে স্বরের অনৈক্যটা আরও যেন বেশি করিয়া ধরা পড়ে এবং তাহাতে কবির অক্ষমতা ও ভাষার দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। ক্রিয়াপদের মিল যত ইচ্ছা করা যাইতে পারে—সেক্ষেপে মিলে কর্ণে প্রত্যেকবার নূতন বিস্ময় উৎপাদন করে না, এই জন্য তাহা বিরক্তি-জনক ও ‘একধেয়ে’ হইয়া উঠে। বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই। তাহা পুরহমাণ নির্ব্বিরের মতো সহজ সঙ্গীতে অবিশ্রাম-স্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণ পীড়ক হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত—অক্ষমতাজনিত নহে। তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে কোথাও এ কথা মনে হয় না যে, এইখানে কবিকে দায়ে পড়িয়া মিল নষ্ট বা ছন্দ ভঙ্গ করিতে হইয়াছে।

কিন্তু উপরে যে ছন্দের শৌকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, বঙ্গসুন্দরীতে সেই ছন্দই প্রধান নহে। প্রথম উপহারটি ব্যতীত বঙ্গসুন্দরীর অন্য সকল কবিতার ছন্দই পর্য্যায়ক্রমে বারো এবং এগারো অক্ষরে ভাগ করা। যথা,—

“স্বঠাম শরীর পেলব নতিকা,  
আনত স্বপ্না-কুসুম-ভরে :  
চাঁচর চিকুর নীরদ-মালিকা  
লুটায় পড়েছে ধরণী ‘পরে।’”

এ ছন্দ নারী-বর্ণনার উপযুক্ত বটে—ইহাতে তালে তালে নূপুর ঝঙ্কত হইয়া উঠে। কিন্তু এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে যুক্ত অক্ষরের স্থান নাই। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লেখকের এবং পাঠকের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। অক্ষরের মাত্রাগুলিকে কিয়ৎপরিমাণে ইচ্ছামত বাড়াইবার কমান্বয়ের অবকাশ আছে। প্রত্যেক অক্ষরকে এক-মাত্রার স্বরূপ গণ্য করিয়া একেবারে এক-নিশ্বাসে পড়িয়া যাইবার আবশ্যক হয় না। দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার কথা স্পষ্ট হইবে :—

“হে গারদে দাও সেখা !  
বাঁচিতে পারিনে একা, •  
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয় ;  
কি বলেছি অভিমানে  
ওনো না ওনো না কাণে,  
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যথার সময়।”



ইহার মধ্যে পুরা যুক্ত অক্ষর নাই। নিম্নলিখিত শ্লোকে অনেকগুলি যুক্তাক্ষর আছে, অথচ উভয় শ্লোকই সুখপাঠ্য এবং শ্রুতিমধুর :—

“পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,  
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,  
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন ঘনিবারে পারে ;  
সম্মুখে সাগরাধরা  
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা  
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।”

এই দুইটি শ্লোকই কবির রচিত সারদামঙ্গল হইতে উদ্ধৃত। এক্ষণে বঙ্গসুন্দরী হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করা যাক্ :—

“একদিন সেব তরুণ তপন  
হেরিলেন স্বরনদীর জলে—  
অপরূপ এক কুমারী-রতন  
খেলা করে নীল নলিনীদলে।”

ইহার সহিত নিম্ন-উদ্ধৃত শ্লোকটি একসঙ্গে পাঠ করিলে প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে :—

“অঙ্গুরী কিনুরী দাঁড়াইয়ে তীরে  
ধরিয়ে ললিত করুণ তান ;]  
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে,  
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।”

‘অঙ্গুরী কিনুরী’ যুক্ত অক্ষর লইয়া এখানে ছন্দোভঙ্গ করিয়াছে। কবিও এই কারণে বঙ্গসুন্দরীতে যথাসাধ্য যুক্ত অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না, সে ছন্দ আদরণীয় নহে ; কারণ, ছন্দের স্বাক্ষর এবং স্বনির্ভেদিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন স্থললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে ; তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তদ্রূপ-কর্মক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্লান্ত করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র-সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ স্বনির্ভেদিত্র্য এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।

আর্য্যদর্শনে বিহারীলালের সারদামঙ্গল-সঙ্গীত যখন প্রথম বাহির হইল, তখন ছন্দের প্রভেদ মুহূর্ত্তেই প্রতীয়মান হইল। সারদামঙ্গলের ছন্দ নূতন নহে, তাহা প্রচলিত ত্রিপদী, কিন্তু কবি তাহা সঙ্গীতে-সৌন্দর্য্যে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গসুন্দরীর



ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, সেই মিষ্টতা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন, কিন্তু সারদামঙ্গলের গীতগোন্দর্য্য অনুকরণসাধ্য নহে।

সারদামঙ্গল এক অপক্লপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম, তখন তাহার ভাষায়, ভাবে এবং সঙ্গীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম পাইলাম, অমনি তাহা আকার-পরিবর্তন করে। সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোনো রূপকে স্থায়িতাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব পূর্ববী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাঙ্গাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।

এই জন্য সারদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা অরসিক লোকের নিকট ভালরূপে প্রমাণ করা বড়ই কঠিন হইত। যে বলিত, আমি বুঝিলাম না, আমাকে বুঝাইয়া দাও, তাহার নিকট হার মানিতে হইত।

কবি যাহা দিতেছেন, তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য পাঠককে পুষ্পত হওয়া উচিত; পাঠক যাহা চান, তাহাই কাব্য হইতে আদায় করিবার চেষ্টা করিতে গেলে অধিকাংশ সময়ে নিরাশ হইতে হয়। তাহার ফল হয়, যাহা চাই তাহা পাই না এবং কবি যাহা দিতেছেন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সারদামঙ্গলে কবি যাহা গাইতেছেন তাহা কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সঙ্গীত-সুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু সমালোচনা-শাস্ত্রের আইনের মধ্য হইতে ছাঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহার অনেক রস বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সঙ্গুকাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি ঋণ কবিতার সমষ্টিক্রমে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়ত সরস্বতী-সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে যে রূপ ধারণা আছে, কবির সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিতেছেন, তিনি নানা আকারে, নানা ভাবে, নানা লোকের নিকট উদ্ভিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্য্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং দয়া-স্নেহ-প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন। ইংরাজ কবি শেলি যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

" Spirit of beauty, that does consecrate  
With thine own hues all thou dost shine upon  
Of human thought or form."

তাহাকে বলিয়াছেন,—

" Thou messenger of sympathies,  
That wax and wane in lovers' eyes."

সেই দেবীই বিহারীলালের সরস্বতী।





সারদামঙ্গলের আরম্ভের চারি শ্লোকে কবি সেই সারদাদেবীকে মূর্তিমতী করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে, বাল্মীকির তপোবনে সেই করুণাকৃপিণী দেবীর কিরূপে আবির্ভাব হইল, কবি তাহা বর্ণনা করিতেছেন। পাঠকের নেত্র-সম্মুখে দৃশ্যপট যখন উঠিল তখন তপোবনে অন্ধকার রাত্রি।

“ নাই চন্দ্র সূর্য্য তারা,  
অনল-হিলোল-ধারা,  
বিচিত্র বিদ্যুত-দাম-দ্যুতি ঝলমল;  
তিমিরে নিমগ্ন ভব,  
নীরব নিস্তব্ধ গর,  
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল।”

এমন সময়ে উষার উদয় হইল।—

“ হিমাক্রি-শিখর পরে  
আচক্ষিতে আলো করে  
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য-তপোবনে !  
বিকচ নয়নে চেয়ে  
হাসিছে দুধের মেয়ে,—  
তামসী-তরুণ-উষা কুমারী-রতন।

কিরণে ভুবন ভরা,  
হাসিয়ে জাগিল ধরা,  
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগদ্বনাগণে।  
হাসিল অম্বরতলে  
পারিজাত দলে দলে,  
হাসিল মানস-সরে কমল-কানন।”

তপোবনে এক দিকে যেমন তিমির রাত্রি ভেদ করিয়া তরুণ উষার অভ্যুদয় হইল, তেমনি অপর দিকে নিষ্ঠুর হিংসাকে বিদীর্ণ করিয়া কিরূপে করুণাময় কাব্যজ্যোতি প্রকাশ পাইল, কবি তাহার বর্ণনা করিতেছেন,—

“ অহসে অরুণোদয়,  
তলে দুলেদুলে বয়  
তমসা তটিনী-রাধী কুলুকুলু শব্দে;  
নিরবি লোচনলোভা  
পুলিন-বিপিন-শোভা  
যমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মত্তে।



শাধি-শাধে রসস্থবে  
 ফৌক-ফৌকী মুখে মুখে  
 কতই সোহাগ করে বসি' দু-জনায়,  
 হানিল শবরে বাণ,  
 নাশিল ফৌকের পূণ,  
 রুবিরে আপু ত পাখা বরণী লুটায় ।

ফৌকী পুর-সহচরে  
 ঘেরে ঘেরে শোক করে,  
 অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে—  
 চক্ষে করি' দরশন  
 জড়িমা-জড়িত মন,  
 করুণ-হৃদয় মুনি বিশ্বলের প্রায় ;  
 সহসা ললাটে-ভাগে  
 জ্যোতির্গরী কন্যা জাগে,  
 জাগিল বিজলী যেন মীল নবধনে ।

কিরণে কিরণময়  
 বিচিত্র আলোকোদয়,  
 নিয়মান রবিচছবি, ভুবন উজলে ।  
 চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,  
 সমুজ্জ্বল শান্তিময়  
 ঋষির ললাটে আজি না জানি কি অলে !

কিরণ-মণ্ডলে বসি'  
 জ্যোতির্গরী স্বরূপগী  
 যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে  
 নামিলেন ধীর ধীর,  
 দাঁড়ালেন হ'য়ে স্থির  
 মুকুন্দনেত্র বালুীকির মুখপানে চেয়ে ।

করে ইন্দ্রধনু-বালা,  
 গলায় তারার মাল্য,  
 গীমন্তে নক্ষত্র অলে, ঋতুমে কানন ;  
 কর্ণে কিরণের ফুল,  
 দোদুল চাঁচর চুল  
 উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে চাকিয়ে আনন ।

\* \* \* \* \*

করুণ ক্রন্দন-রোল  
 উত উত উতোরোল,  
 চমকি' বিশ্বলা বালা চাহিলেন কিরে,





হেরিলেন রক্তমাখা  
 মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,  
 কঁাদিয়ে কঁাদিয়ে ক্রৌঞ্চ ওড়ে ঘিরে' ঘিরে' ।  
 একবার সে ক্রৌঞ্চীরে  
 আরবার বান্ধুকিরে  
 নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী ।  
 কাতরা করুণা-ভরে,  
 গা'ন সৰু সুরে,  
 ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিদ্যাদিনী ।  
 সে শোক-সংগীত-কথা  
 শুনে কঁাদে তরু-লতা,  
 তমসা আকুল হয়ে কঁাদে উভয়ায় ।  
 নিরখি' নন্দিনী-ছবি  
 গঙ্গাদ আদি কবি,  
 অন্তরে করুণা-সিঁদু উথলিয়া যায় ।"

সারদাদেবীর এই এক করুণামূর্তি । তাহার পর ২১ শ্লোক হইতে আবার একটি কবিতার আরম্ভ হইয়াছে । সে কবিতায় সারদাদেবী ব্রহ্মার মানস-সরোবরে স্তব্ধ-পদ্মের উপর দাঁড়াইয়াছেন এবং তাহার অসংখ্য ছায়া বিশুব্রহ্মাণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে । ইহা সারদাদেবীর বিশুব্রহ্মাণ্ডী সৌন্দর্য্যমূর্তি ।—

“ব্রহ্মার মানস-সরে  
 কুটে চল চল করে  
 নীল জলে মনোহর স্তব্ধ-নলিনী,  
 পাদপদ্ম রাখি তায়  
 হাসি হাসি ভাসি যায়  
 ঘোড়শী রূপসী বামা পুণিমা-মামিনী ।  
 কোটি শশী উপহাসি  
 উথলে লাবণ্যরাশি,  
 তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে ;  
 আচ্ছিতে অপরূপ  
 রূপসীর পুতিরূপ  
 হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অধরে ।”

এই সারদাদেবীর, এই Spirit of Beautyর নব-অভ্যুদিত করুণা বালিকামূর্তি এবং সর্বত্র-ব্যাপ্ত স্তব্ধ-ঘোড়শীমূর্তির বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন,—

“তোমারে হৃদয়ে রাখি  
 সদানন্দ মনে থাকি,  
 শ্যামান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে ;



গিরিমালা, কুন্তল,  
গৃহ, নাট-নিকেতন,  
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে।

\* \* \* \*

যত মনে অভিলাষ,  
তত তুমি ভালবাস,  
তত মন-পূর্ণ ভোরে আমি ভালবাসি ;  
ভক্তিভাবে একতানে  
মজ্জেছি তোমার ধ্যানে ;  
কমলার ধন-মানে নহি অভিলাষী।”

এই মানসীকপিণী সাধনার ধনকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়া কবি প্রথম সর্গ সমাপ্ত করিয়াছেন।

তাহার পরের সর্গ হইতে প্রেমিকের ব্যাকুলতা। কখনো অভিমান, কখনো বিরহ, কখনো আনন্দ, কখনো বেদনা, কখনো ভৎসনা, কখনো স্তব। দেবী কবির প্রণয়িনীরূপে উদিত হইয়া বিচিত্র সুখ-দুঃখে শতধারে সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছেন। কবি কখনো তাঁহাকে পাইতেছেন, কখনো তাঁহাকে হারাইতেছেন—কখনো তাঁহার অভয়-রূপ, কখনো তাঁহার সংহারমূর্ত্তি দেখিতেছেন। কখনো তিনি অভিনানিনী, কখনো বিঘাদিনী, কখনো আনন্দময়ী। এইরূপ বিঘাদ, বিরহ, সংশয়ের পর কবি হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী দেবীর সহিত আনন্দ-মিলনের চিত্র আঁকিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

কবি যে সূত্রে সারদামঙ্গলের এই শেষের কবিতাগুলি গাঁথিয়াছেন তাহা ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কি-না জানি না—মধ্যে মধ্যে সূত্র হারাইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়, কিন্তু এ কথা বলিতে পারি, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত একরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। বর্তমান সমালোচক এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্য-শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে বলা যায় না ; কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়িতাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ ; ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপুকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক। এই পুসঙ্গে আমার এই কাব্যগুরু নিকট আর একটি ধন স্বীকার করিয়া লই। বাল্যকালে বাল্যীকি-পুতিভা নামক একটি গীতি-নাট্য রচনা করিয়া ‘বিদ্যজ্ঞান-সমাগম’ নামক সম্মিলন-উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটি প্রীতিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।





আজ কুড়ি বৎসর হইল সারদামঙ্গল আখ্যদর্শন পত্রে, এবং ঘোল বৎসর হইল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; ভারতী পত্রিকায় কেবল একটিমাত্র সমালোচক ইহাকে সাদর-সম্ভাষণ করেন। তাহার পর হইতে সারদামঙ্গল ঘোড়শ বৎসর অনাদৃত ভাবে প্রথম সংস্করণের মধ্যেই অজ্ঞাতবাস যাপন করিতেছে। কবিও সেই অবধি আর বাহিরে দর্শন দেন নাই। যিনি জীবন-রঙ্গভূমির নেপথ্যে প্রচলিত থাকিয়া দর্শক-মণ্ডলীর স্ততিধ্বনির অতীত ছিলেন, তিনি আজ মৃত্যুর যবনিকাস্তরালে অপসৃত হইয়া সাধারণের বিদায়-সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলেন না; কিন্তু এ কথা সাহসপূর্বক বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শত-সহস্র রচনা যখন বিনষ্ট এবং বিস্মৃত হইয়া যাইবে, সারদামঙ্গল তখন লোকস্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে, এবং কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমালা ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাগনে বাস করিতে থাকিবেন।

[১৩০১]

## মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

• রমেশচন্দ্র দত্ত

বাল্যকালে শুনিতাম, ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। শুনিতাম, বাঙ্গালা ভাষায় ভারতের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব আর হয় নাই, তাঁহার ন্যায় মৌলিকতা অন্য কোনও কবির নাই, তাঁহার ন্যায় মধুরত্ব ও লালিত্যও অন্য কবির নাই।

এখনও অনেকে ভারতচন্দ্রকে বঙ্গদেশের প্রধান কবি মনে করেন। মাননীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে, এক্ষণে কবি এখনও বঙ্গদেশে হয় নাই। অন্যান্য বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকেরও মত এই যে, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন; আধুনিক কবি মধুসূদন দত্তও ভারতের নিকটে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না।

আমরা অদ্য এ বিষয়ে কোনও সমালোচনা করিব না। ভারতচন্দ্র কি দরের কবি, তাহার নিষ্পত্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে যাহারা ভারতচন্দ্রের মৌলিকতার প্রশংসা করেন, তাহারা একবার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কবিতা পড়িবেন, এইটি আমাদের প্রার্থনা। গুণাকর পত্রে-পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী; কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে-পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কবিকঙ্কণের কাব্য সরল,



স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য ; গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং অনেক স্থানে অপাঠ্য। আমরা এ বিষয়ে অন্য কয়েকটি উদাহরণ দিতে ইচ্ছা করি।

সতী ও দক্ষযজ্ঞের কথা লইয়া উভয় কবির কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। শঙ্করের নিকট অনুমতি না পাইয়া, সতী অভিমানিনী হইয়া দক্ষালয়ে চলিলেন, এই কথা উভয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম সতীর অভিমানের স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়াছেন, গুণাকর ভারতচন্দ্র এই স্থলে সতীর দশ রূপের বিস্তীর্ণ বর্ণনা দিয়া আপনার চাতুর্য্য ও পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন :—

“ অনুমতি দেহ হর, ’ যাইব বাপার ঘর,  
যজ্ঞ মহোৎসব সেধিবারে ।  
ত্রিভুবনে যত বৈলে, চলিলা বাবার পাশে,  
তনয়া কেমনে পুণ ধরে ॥  
চরণে ধরিয়া সাধি, কৃপা কর কৃপানিধি,  
যাব পক্ষ দিবসের ভরে ।  
চিরদিন আছে আশ, যাইতে বাপের বাস,  
নিবেদন নাহি করি ভরে ॥  
পর্বত-কন্দরে বসি, নাহি পাশে সুপড়গী,  
গীমন্তে সিল্পুর দিতে সখী ।  
এক দিন যথা যাই, ছুড়াইতে নাহি ঠাই,  
বিধি মোরে কৈল জগদুঃখী ॥  
সুন্দর-সূত্র-করে, আইলুঁ তোমার ঘরে,  
পূর্ণ হৈল বৎসর ছয় সাত ।  
দূর কর বিসম্বাদ, পূরহ আমার সাধ,  
মায়ের রক্তনে খাব ভাত ॥  
পিতা মোর পুণ্যবান্, করিবে অনেক দান,  
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার ।  
আমি আগে পাব মান, আভরণ পরিধান,  
ভেদবুদ্ধি নাহিক ব্যাপার ॥  
সতীর বচন শুনি, কহিলেন শূলপাণি,  
শুন পুিয়ে আমার বচন ।  
বাপ-ঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল,  
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন ॥  
যাইবারে অনুমতি, নাহি দিল পশুপতি,  
হৈমবতী হৈলা কোপবতী ।  
আপন স্বভাবে রামা, চলিলা বুকুটি-তীনা,  
একাকিনী বাপের বসতি ॥



হইয়া উন্মত্তবেশা, যান চণ্ডী মুক্তকেশা,  
না শুনিয়া শিবের বচন ।  
হরের আদেশ পেয়ে, পিছে নন্দী যায় ধেয়ে,  
বুম্ভেতে করিয়া সাজন ॥”

—মুকুন্দরাম

“ নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন ।  
যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন ॥  
শঙ্কর কহেন বটে বাপঘরে যাবে ।  
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে ॥  
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্শ্ব ।  
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্শ্ব ॥  
সতী কন মহাপুত্রে হেন না কহিবা ।  
বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥  
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ ।  
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥  
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তরা ।  
শবারুঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণ পুরা ॥  
গলিতকুণ্ডলধারা মুণ্ডমালা গলে ।  
গলিতকুণ্ডল মুণ্ড বানকরতলে ॥  
আর বানকরেতে কৃপাণ ধরশাণ ।  
দুই ভুজ দক্ষিণে অভয় বরদান ॥  
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে ।  
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥ ১ ॥  
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ ।  
ভার্য্যরূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ॥  
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা ।  
সর্পবান্ধা উর্দ্ধ এক জটা-বিভূষণা ॥  
অর্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল ।  
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ॥  
নীলপদ্ম বস্ত্র কাতি সমুণ্ড ধর্য্যর ।  
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥ ২ ॥”

—ভারতচন্দ্র

দক্ষের শিব-নিন্দার কথাও সেইরূপ । মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক ; যথা—

“ পরিধান বাঘছাল, গলায় হাড়ের মাল,  
বিভূতি-ভূষণ শোভে অঙ্গে ।  
শূণ্যানে যাহার স্থান, কেবা তার করে মান,  
পুত ভূত চলে যার সঙ্গে ॥”



ভারতচন্দ্রের বর্ণনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং স্বাৰ্থ; যথা—

“সভাজন শুন,  
বয়সে বাপের বড়;  
কোন গুণ নাই,  
যেথা সেথা ঠাই,  
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।”

দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের বর্ণনায়ও কবিস্বয়ের বিভিন্নতা বিশেষ লক্ষিত হয়। মুকুন্দরাম সহজ কথায় লিখিয়াছেন—

“লয়ে নানা রত্ন  
চলে যজ্ঞ নাশিবারে।  
দক্ষের নিজ পুর  
ভাঙ্গিয়া করে চুর,  
কেহ নিবারিতে নারে ॥  
ব্রাহ্মণে ধরিয়া,  
পুণি লয় কাড়িয়া,  
ভোর দিয়া ভুল বাঞ্চে।  
ব্রাহ্মণে না মার,  
পৈতা দেখাইয়া কান্দে ॥  
বেগে হোথা ধায়,  
দানা ধরে তায়,  
পাড়িয়া উপাড়ে দাড়ি।  
ভাঙ্গিল দশন,  
ছিঁড়িল বসন,  
শ্রাবের মারিয়া বাড়ি ॥”

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা সকলেই জানেন। তাঁহার কথার বিন্যাস ও ভাষার লালিত্য বিস্ময়কর—

“মহারত্ন-রূপে মহাদেব গাজে।  
ভতস্তম্ভ ভতস্তম্ভ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥  
লটাপট জটাজুট সংঘট গঙ্গা।  
ছলছল টলটল কলকল তরঙ্গা ॥  
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ গাজে।  
দিনেশ-পুতাপে নিশানাথ গাজে ॥  
\* \* \* \* \*  
ভূতনাথ ভূতনাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।  
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অষ্ট অষ্ট হাসিছে ॥  
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।  
ঘোর রোল গগুগোল চৌদ্ধ লোক কাঁপিছে ॥  
মার মার ঘের ঘোর হান হান হাঁকিছে।  
হপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে ॥  
অষ্ট অষ্ট ষট্ ষট্ ঘোর হাস হাসিছে।  
হন হান খুন খান ভীমশব্দ ভাসিছে ॥  
উর্ধ্ব বাহ যেন ব্রাহ চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।  
লক্ষ লক্ষ ভূমিকম্প নাগকূর্ষ্ম লাড়িছে ॥”



এই শব্দবিন্যাস যদি কবিত্ব হয়, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি জগতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

তৎপরে উমার জন্ম-কথা উভয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভব-নামক অতুল্য কাব্যে কবিগুরু কালিদাস যে সকল কথা বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কানদেবের ভগ্না হওন, রতির বিলাপ ইত্যাদি বৃত্তান্ত বঙ্গীয় কবিদ্বয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। দুই-একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

“ কানকান্তা কান্দে রতি কোলে করি মৃত পতি  
ধূলায় ধূসর কলেবর ।  
লোটায়ে কুন্তল-তার, তাজি নানা অলঙ্কার  
সম্মানে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর ॥  
পড়িয়া চরণ-তলে, রতি সক্রোধে বলে,  
প্রাণনাথ কর অবধান ॥  
তিলেক দারুণ হৈয়া, পাসরিলা নিজ জায়া,  
দূর কৈলা সোহাগ সম্মান ॥  
জাগিয়া উত্তর দেহ, রতিরে সংহতি লহ,  
পাসরিলা পূর্বের পিরীত ।  
তুমি নাথ যাবে যথা, আমি আগে যাব তথা,  
তবে কেন কৈলা বিপরীত ॥  
মোর পরমায়ু লয়ে চিরকাল থাক জীয়ে,  
আমি মরি তোমার বদলে ।  
যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি পাইব আমি,  
রহিব তোমার পদতলে ॥ ”

—মুকুন্দরায় ।

“ পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা হাঁদে,  
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে ।  
কপালে কঙ্কণ নারে, কধির বহিছে ধারে,  
কান-অঙ্গ-ভগ্না লেপে অঙ্গে ॥  
আলুখালু কেশ-বাগ, ঘন ঘন বহে শ্বাস,  
সংসার পুরিল হাহাকার ।  
কোথা গেল প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,  
তোমা বিলা সকলি আধার ॥  
তুমি কাম আমি রতি, আমি নারী তুমি পতি,  
দুই অঙ্গ একই পরাণ ।  
পুথনে যে প্রীতি ছিল, শেষে তাহা না রহিল, ]  
পিরীতির এ নহে বিধান ॥



যথা যথা যেতে প্রভু,                      নোরে না ছাড়িতে কভু,  
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা ।  
মিছে পুন বাড়াইয়া,                      ভাল গেলা ছাড়াইয়া,  
এখন বুঝি নিছে খেলা ॥  
না দেখিব সে বদন,                      না হেরিব সে নয়ন,  
না শুনিব সে মধুরবাণী ।  
আগে মরিবেন স্বামী,                      পশ্চাতে মরিব আমি,  
এত দিন ইহা নাহি জানি ॥”

—ভারতচন্দ্র ।

কবিগুরু কালিদাসের অনুসরণ করিয়া মুকুন্দরাম গৌরীর তপস্যা-বর্ণনা করিয়াছেন । তপস্যা-স্থানে মহাদেব দ্বিজবেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন :—

“অখাজিনাঘাটধরঃ পুগন্ভবাণু  
অলনিব ব্রহ্মময়েন তেজসা ।  
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনঃ  
শরীরবন্ধঃ পুধ্বশশুনো যথা ॥”

—কুমারসম্ভব ।

কালিদাসের মহাদেবের ন্যায় মুকুন্দরামের দ্বিজরূপী মহাদেবও গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

“কহ নিরুপমা,                      কার বোলে রামা,  
বাঞ্ছিতা তুমি জটাদরে ।  
হইয়া সুলক্ষ্মী,                      ভজহ তিথারী,  
দরিত্র বর দিগন্তরে ॥  
শুন গো চন্দ্রমুখি,                      তোমারে আমি দেখি,  
রূপেতে তুবনমোহিনী ।  
কতেক আছে বর,                      তুবনে মনোহর,  
ইচ্ছিতা বুড়া বর আপনি ॥”

অবশেষে মহাদেব নিজ-রূপ ধারণ করিলেন । হরগৌরীর বিবাহ হইল । মহাদেবের বেশ দেখিয়া মেনকা খেদ করিলেন । পরে মহাদেব সুলক্ষ্মী রূপ ধারণ করায় মেনকা তুষ্ট হইলেন । এ সমস্ত কথা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র—উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন ।

পরের সৌভাগ্য দেখিলে নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা অনেকেরই মনে উদয় হয় । মহাদেবের সুলক্ষ্মী রূপ দেখিয়া অনেক অভাগিনী নারী আপনাদিগের মন্দ-ভাগ্য-সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মুকুন্দরামের সেই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা আবশ্যিক :—

“দেখিয়া বহুরূপ যতেক যুবতী ।  
একে একে নিন্দা করে আপনার পতি ॥



এক নারী বলে সই মোর গোদা পতি ।  
 সদা কোয়া-অরের ঔষধ পাব কথি ॥  
 ভাস্কর্য্যে মাসে পায়ে পঁকুই দুর্ব্বার ।  
 গোদে তৈল দিতে মোর উঠয়ে নেকার ॥  
 ফোলে যদি গোদর কোয়া অর করে বল ।  
 কত বা বাঁটির আর ওকড়ার ফল ॥  
 পুতুর দোষের নাহি উপায় কে করে ।  
 কাটনার কড়ি কত জোগাব ওঝারে ॥  
 দাদনি না দেয় এবে মহাজন হবে ।  
 টুটিল সূতার কড়ি উপায় কি হবে ॥  
 দুপণ কড়ির সূতা এক পণ বলে ।  
 এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগী-কপালে ॥  
 চক্ষু খায়ে বাপ বিয়া দিল হেন বরে ।  
 মিথ্যা রাত্রি জেগে মরি কি কব গোদারে ॥  
 গোদের গেঁজের ফোড়া হয় বিপরীত ।  
 পুণিমা হইলে তার বেরয় শোণিত ॥  
 আর জন বলে পতি বঞ্চিত-দশন ।  
 ঝোলঝাল বিনা তার না হয় অশন ॥  
 কঠিন বাঙ্কন আমি যেই দিন রাক্ষি ।  
 মারয়ে পিঁড়ির বাড়ি কোণে বসে কালি ॥  
 আর জন বলে সই মোর কর্ত্তব্য মন্দ ।  
 অভাগিয়া পতি মোর দুটি চক্ষু অন্ধ ॥  
 কোন দেশে দুঃখী নাহি সই মোর পারা ।  
 কোলে কাছে থাকিতে সদাই হয় হারা ॥  
 কেহ বলে মোর পতি বড়ই নির্ভয় ।  
 কত বা পুণিব দিয়া মা-বাপের ধন ॥  
 আর জন কহে সখি মোর পতি ধোঁড়া ।  
 নড়িতে চড়িতে নারে ঘর করে জোড়া ॥  
 আর সতী বলে সখি মোর পতি কুঁজা ।  
 কুঁজ ভাল হইলে পুণিব দশতুজা ॥  
 চিত্ত হয়ে শুভে নারে মরি মরি করে ।  
 আড়াই হাত প্লাদ করে নেতের ভিতরে ॥  
 লোকের গঞ্জনা আর সহিতে না পারি ।  
 সংসার ছাড়িয়া অমি হব দেশান্তরী ॥  
 আর জন বলে সই মোর স্বামী কালা ।  
 অন্যের সংসার ভাল মোর বড় আলা ॥  
 ঠায়ে ঠায়ে কথা কহি দিনে পতি মৃত্যু ।  
 রাত্রি হৈলে থাকে যেন পশুর শয়নে ॥







দারুণ দৈবের গতি, হইনু অবলা জাতি,  
অহি সঙ্গে হয়ে গেল বেলা ।  
বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আরি,  
তাহে হইল সতিনী পুন্না ॥  
সতীনের সম্মান, আপনার অপমান,  
অভিনানে নাহি মেলি আঁখি ।  
দেখিয়া দারুণ সত্য, বিবাহ দিলেন পিতা,  
পিতৃকুলে হইনু বিমুখী ॥  
আমার কণ্ঠের গতি, উগ্র হইল মোর পতি,  
পাঁচ মুখে মোরে দেয় গালি ।  
তাহে সতীনের আলা, কতেক সহিবে বালা,  
পরিভাষে হয়ে গেলু কালী ॥  
পুত্রের সম্পদ বড়, সাত সতীনেতে জড়,  
অনুকণ জড়াল কোন্দল ।  
কি মোর কপালে এল, খাইয়া ধুতুরা ফল,  
আচম্বিতে হইল পাগল ॥  
বিভূতি মাখেন গায়, ঝিমিকে ঝিমিকে যায়,  
ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল ।  
ভুজঙ্গ-বেষ্টিত অঙ্গ, বাজায় উদুর শৃঙ্গ,  
গলায় শোভিছে হাড়মাল ॥  
কি হবে বিষয়-স্বপ্ন, তাহে পতি পরাধীন,  
তারে বলে তবে কান-অরি ।  
সাত সতিনীরা নারে, বুঝিয়া না শাস্তি করে,  
সাত সত্য পরাণের বৈরী ॥  
যে ঘরে সতিনী রয়, কানানলে পুণ ময়,  
যেনন লাগয়ে বিষ-আলা ।  
বিধি মোরে হৈল বাম, না গগিনু পরিণাম,  
বনবাণী হইনু একলা ॥  
এবে বিধি হৈল সখা, বীর-সঙ্গে পথে দেখা,  
সত্য করি আনে নিজ ঘরে ।  
শুন গো ব্যাধের ঝি, তোমারে বুঝাব কি,  
এবে আমি যাব কোথাকারে ॥”

এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র পাট্টনীর নিকট অনুপূর্ণার পরিচয়-দান  
ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

“ঐশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঐশ্বরী ।  
বুঝই ঐশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥  
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ।  
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥



গোত্রের পুধান পিতা মুখবংশজাত ।  
 পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশজাত ॥  
 পিতামহ দিলা মোরে অনুপূর্ণ নাম ।  
 অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥  
 অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ ।  
 কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥  
 কু-কথায় পক্ষমুখ কণ্ঠভরা বিষ ।  
 কেবল আমার সঙ্গে হৃদয় অহনিশ ॥  
 গঙ্গা নামে সত্য তার তরঙ্গ এমনি ।  
 জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর নিরোমণি ॥  
 ভুত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে ।  
 না মরে পাশাপ বাপ দিলা হেন বরে ॥  
 অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই ।  
 যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥ ”

চণ্ডীর পুসাদে যখন কালকেতু নূতন নগর নির্মাণ করিয়া রাজা হইলেন, তখন তাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হইতেছে দেখিয়া চারি দিক্ হইতে চতুর চাটুকারগণ ছুটিয়া আসিল । তাহাদিগের মধ্যে তাঁড়ুদত্ত নামক একজন ধূর্ত কায়স্থের কবি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক বর্ণনা সাহিত্য-ভাণ্ডারে দুস্তাপ্য :—

“ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে তাঁড়ুর শালা,  
 আগে তাঁড়ুদত্তের পুয়াণ ।  
 ফৌটা-কাটা মহাদত্ত, ছেঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব,  
 শুবণে কলম লম্ববান ॥  
 পুণাম করিয়া বীরে, তাঁড়ু নিবেদন করে,  
 গম্বু পাতিয়া খুড়া খুড়া ।  
 ছেঁড়া কহলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি,  
 ঘন ঘন দেয় বাহ নাড়া ॥  
 আইলু বড় প্রীতি আশে, বসিতে তোমার দেশে,  
 আগেতে ডাকিবে তাঁড়ু দত্তে ।  
 যতেক কায়স্থ দেখ, তাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ,  
 কুল শীল বিচার মহত্তে ॥  
 কহি আপনার তত্ত্ব, আমল হাঁড়ার দত্ত,  
 তিন কুলে আমার মিলন ।  
 ঘোষ ও বস্তুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্যা  
 মিছে কৈল কন্যা-বিতরণ ॥  
 গঙ্গার দুকুল পাশে, যতেক কায়স্থ বৈসে,  
 মোর ঘরে করয়ে ভোজন ।  
 ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার, দিয়া করে ব্যবহার,  
 কেহ নাহি করয়ে রক্ষন ॥



বহু পরিবার বেনা, দুই জায়া চারি শালা,  
চারি পুত্র বহিনী শাওড়ী ।  
ছয় জামাই ছয় চেড়ি, সেই হেতু ছয় বাড়ী,  
ধান্য দিবে নাহি দিব বাড়ী ॥  
হাল-বলদ দিবে খুড়া, দিবে হে বিছন পুড়া,  
ভেনে খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে ।  
আমি পাত্র তুমি রাজা, আগে কর মোর পূজা,  
অবশেষে তাঁড়ুরে জানিবে ॥ ”

ভারতচন্দ্র বর্ণনায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কিন্তু একরূপ স্বাভাবিক বর্ণনা ভারতচন্দ্রের  
গৃহের মধ্যে কোথায় পাইব ?

বিদ্যাসুন্দরে হীরা মালিনীর বর্ণনা পাঠ করিয়া সেকালের পাঠকগণ বিনোদিত  
হইতেন । কিন্তু মুকুন্দরাম শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যানে দুর্বলা-নাম্নী এক দাগীর  
যে চরিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন, হীরা মালিনী তাহারই ছায়া অবলম্বনে অঙ্কিত । শ্রীমন্ত  
সদাগরের পিতা ধনপতি সদাগর । তাহার দুই স্ত্রী, লহনা ও খুলনা । দুই সপত্নীর  
মধ্যে প্রথমে পরম প্রীতি ছিল, কিন্তু খুড়া দাগী দুর্বলা কালসপের ন্যায় তাহাদের মধ্যে  
যাইয়া বিচ্ছেদ-সাধন করিল ; বড় সপত্নী লহনার নিকট যাইয়া বলিল :—

“ শুন শুন মোর বোল শুন গো লহনা ।  
এবে সে করিলে নাশ আপনি আপনা ॥  
মাপিনী বাঘিনী সত্য পোষ নাহি মানে ।  
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে ॥  
কলাপিকলাপ জিনি খুলনার কেশ ।  
অর্ধ পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ ॥  
খুলনার মুখশশী করে চল চল ।  
মাছিতায় মলিন তোমার গওহল ॥  
ক্ষীণমধ্যা খুলনা যেমন মধুকরী ।  
যৌবনবিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী ॥  
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কত দিন ।  
খুলনার রূপে হবে কামের অধীন ॥  
অধিকারী হবোঁ তুমি রতনের ধামে ।  
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥ ”

এইরূপ পরামর্শ পাইয়া লহনা ক্রমে খুলনার পুতি বিরক্তমনা হইলেন এবং অনেক  
অত্যাচার করিতে লাগিলেন । কিন্তু চণ্ডী লহনাকে স্বপ্ন দেওয়ায়, লহনা পুনরায় ছোট  
সপত্নীর পুতি প্রসন্ন হইলেন । দুই সপত্নীর মধ্যে পুনরায় প্রীতি হইয়াছে, স্বামী



বিদেশ হইতে ঘরে আসিতেছেন, খুলনার কপাল ফিরিয়াছে, তখন দুর্ব্বলা দাসী ছুটাছুটি করিয়া বড় মার নিন্দায় ছোট মার মনস্তৃষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হইল :—

“আর শুনেছ ছোট মা সাধু আইল ঘরে ।  
বাহির হইয়া শুন বাজনা নগরে ॥  
পোয়াইল আজি যে তোমার দুঃখনিশা ।  
ভবানী-পুসাদে তোর পূর্ণ হইল আশা ॥  
আমারে আপনা বলে’ রাখিবে চরণে ।  
দুর্ব্বলা অন্যের দাসী নহে তোমা বিনে ॥  
তোমার পুণের অরি পাপমতি বাঁজী ।  
সাধুর নিকটে তার আলাইব পাঁজী ॥  
দোষ মত যদি না করহ পুতিকার ।  
কি জানি ঘটায় পাছে দুঃখ পুনর্ব্বার ॥  
যত দুঃখ পাইলা তুমি মোর মনে বাধা ।  
তোমার হইয়া আমি কহিব সে কথা ॥  
দোনার ছাট ধুঞা বাস রাখ বাসঘরে ।  
সাধুর চক্ষের বালি করি লহনারে ॥ ”

আবার তাহারই পর বড় মার নিকট আসিয়া ছোট মার নিন্দা আরম্ভ করিল :—

“আর শুনেছ বড় মা সত্য চরিত ।  
হেন বুদ্ধি সাধুর কাছে বলে বিপরীত ॥  
যেই সদাগরের পাইল ভেরী-গাড়া ।  
আনিল ভাণ্ডার হইতে আভরণ-পেড়া ॥  
অঙ্গদ কঙ্কণ হারে ভূষিত করি গা ।  
যৌবন-গরবে ভুমে নাহি পড়ে পা ॥  
যেই সদাগর আইল আপনার বাসে ।  
মোহন কাজল পরি বৈসে তার পাশে ॥  
আড় নয়নে কহে কথা অম্বতের কথা ।  
কোথায় নাহিক দেখি এমন ঠোঁটাপনা ॥  
উহার শোভা গৌর গায়ে নবীন যৌবন ।  
গুরুজন দেখি অঙ্গে না দেয় বসন ॥  
তুমি বড় ভগিনী জ্যেষ্ঠ সতীন ভূষি ।  
স্বামী ভোটবারে নাহি লয় অনুমতি ॥  
অব্যাজে দেখায় রূপ যৌবন-সম্পদ ।  
অন্য স্বামী হৈলে তার গলে দিত পদ ॥ ”

তাহার পর সাধু ঘরে আসিলে মহা হলুদুল পড়িয়া গেল, রক্তনের আয়োজন হইতে





নাগিল, দুর্বলা হাটে খাদ্য ক্রয় করিতে গেল, তাহার বর্ণনা না দিয়া আমরা কান্ত থাকিতে পারিলাম না :—

“দুর্বলা বাজারে যায়, পাছু দশ ভারী ধায়,  
কাহন পকাশ লয়ে কড়ি ।  
কপালে চলন চুয়া, হাতে পান মুখে ওয়া,  
পরিধান তসরের শাড়ী ॥  
দুর্বলা হাটেতে যায়, উভমুখে লোক চায়,  
ঐ আইসে সাধু ঘরের ধাই ।  
বুঝিয়া এমন কাজ, যার আছে তয় লাজ,  
তাল বস্ত রাখিল লুকাই ॥  
লাউ কিনে কচি কুমড়া, শও-মূলে পলাকড়া,  
পাকা আম কিনে বোঝা-মূলে ।  
বিশা দরে ছেনা কিনি কিনিল নবাত চিনি,  
গণ্যে পণ-মূলে পান নিলে ॥  
মুলা দিয়া পণ দশ, কিনিল জীষন্ত শশ,  
জরঠ কমঠ কিনে রুই ।  
খরসুলা কিনে কই, কিনিল মহিষা-দই,  
কামরান্না কিনে কুড়ি দুই ॥  
চাঁপাকলা মঠমান, সরস ওরাক পান,  
কিনিলেক কর্পূর চলন ।  
শাক বেগুন সারকচু, খাম-আলু কিনে কিছু,  
বিশা দুই কিনিল লবণ ॥  
বাছি কিনে তাল-শাঁশ, হিঙ্গু জিরা রসবাগ,  
চই মেথি জোয়ানি মহরী ।  
মুগ মাঘ বরবাটি, কিনিল সরল পুঁঠি,  
সের দরে হুত ঘড়া-পুরি ॥  
রক্তন-গন্ধান জানে, চিতল বোয়ালি কিনে,  
শোল পোনা কিনিল চিঙ্গড়ী ।  
চতুর সাধুর দাসী, আট কাহণেতে খাসী,  
তৈল সের দরে দশ বুড়ি ॥  
কুড়ি-মূলে নারিকেল, কুলি করঞ্জা পানিকল,  
কাঁটাল কিনিল দুই কুড়ি ।  
কিছু কিনে ফুলগাছা, করুণা কনলা টাবা,  
সেরে জুখি কিনে ফুলবড়ি ॥  
ভোলা-মূলে ভেজপাত, কীর কিনে বিশা গাত,  
আদা বিশা-দরে দশ বুড়ি ।  
মান ওল কিনে সারি, দুগ্ধ কিনে তার চারি,  
তার দুই কিনিল কাঁকড়ি ॥



নির্গাণ করিতে পিঠা,      বিশা-দরে কিনে আটা,  
 খণ্ড কিনে বিশা গাত আট ।  
 বেসাতি দুর্বলা জানে,      অবশেষে হাঁড়ি কিনে,  
 মাগো নয় তবে কিছু ভাট ॥  
 কিনিয়া রন্ধন-সাজ,      অঙ্কনিত লয় ব্যাজ,  
 হরিজা চুবড়ি তরি কিনে ।  
 স্নান করি দুর্বলা,      খায় দধি খণ্ড কলা,  
 চিড়া দই দেয় ভারী জনে ॥  
 আগে পাছে ভারী জন,      দুয়া আসে নিকেতন,  
 উপনীত সাধুর মন্দিরে ।  
 চতুরা সাধুর দাসী,      আগে ভোট দিয়া খাসী,  
 পুণাম করিল সদাগরে ॥”

এই স্থানে আমরা প্রবন্ধ সাদ্র করিলাম । আসলটি উৎকৃষ্ট কি নকলটি উৎকৃষ্ট, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন । আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, মুকুন্দরামের নায়ক-নায়িকার ন্যায় নর-নারী আমরা প্রতিদিন বিশু-সংসারে দেখিতে পাই । ধনপতির ন্যায় বিষয়ী, লহনা ও খুলনার ন্যায় সপত্নী, ভাঁড়দত্তের ন্যায় প্রবঞ্চক, দুর্বলার ন্যায় দাসী—আমরা সংসারে সর্বদাই দেখিতে পাই । সংসার দেখিয়া মুকুন্দরাম নায়ক-নায়িকা চিত্রিত করিয়াছেন । ভারতচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ চতুর, বাক্যবিন্যাসে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ; কিন্তু তাঁহার নায়ক-নায়িকাগুলি কি সংসারের নর-নারী ? হীরার ন্যায় চতুরা মালিনী, সুল্লরের ন্যায় বিলাসপরায়ণ নায়ক, বিদ্যার ন্যায় বিলাসিনী নায়িকা সংসারের সচরাচর নর-নারী নহে ।

মুকুন্দরাম সংসারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন ; ভারতচন্দ্র সমাজবিশেষের রসিকতা বর্ণনা করিয়াছেন ।

[ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০১ ]

## নবীনচন্দ্র

পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়

সমাজ-দেহে জীবনীশক্তি বর্তমান থাকিলে, উহাতে বাহিরের একটা নূতন বলের সঞ্চার হইলে, সে সমাজ-দেহ যতই কেন মূর্খ হউক না, উহা কিছু কালের জন্য আবার সজীব হইয়া উঠে । ভাগ্য প্রসন্ন থাকিলে এই সজীবতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পুনরুত্থান সম্ভব হয়, নহিলে এই কিছু কালের সজীবতা পরিণামে পুণাচরিত্র স্ববিরতায় পর্য্যবসিত হয় । সমাজ-তত্ত্বের এই সিদ্ধান্তকে মান্য করিয়া ভারতেতিহাসের দুই





কালের দুইটি বিপ্লবের পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা কবি নবীনচন্দ্রের বঙ্গসাহিত্যে স্থান ও মান—এই দুই বিষয় বুঝিতে পারিব।

পুথন ইসলাম ধর্মের ও মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া ভারতের হিন্দুসমাজের ও সাহিত্যের বিপ্লব ঘটে। সেই বিপ্লবের ফলে এক পক্ষে গোরক্ষনাথ, রামানন্দ, নানক ও শ্রীচৈতন্য ধর্মপুচারক-ও সমাজ-সংস্কারক-রূপে অবতীর্ণ হন; অন্য পক্ষে, সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস, বিহারীদাস প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণ আর্য্যাবর্তে, আর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, মুকন্দরাম, গোবিন্দদাস, জয়ানন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি কবিগণ মিথিলায় ও বঙ্গে আবির্ভূত হন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইহারাই পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্তে বিঘম বিপ্লব উষিত করিয়াছিলেন। ভারতে ইসলাম ধর্মপুচারকের ফলে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত হইল। হিন্দুসমাজ-দেহে যাহারা চিরকাল নীচ ও অস্ত্যজ হইয়া ছিল, ইসলামের কৃপায় তাহারা শ্রেষ্ঠের সমান হইয়া উঠিল। যে চণ্ডাল হিন্দু থাকিলে কখনই কোন উচ্চ জাতির সহিত একাগনে বসিতে পাইত না, সে মুসলমান হইলেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সহিত একাগনে বসিতে পাইত। ফলে, হিন্দুসমাজের ভিত্তি-স্বরূপ শিল্পকুশল শূদ্র-জাতি-সকল দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল। সমাজে একটা বিঘম বিপ্লব উপস্থিত হইল। অন্য দিকে সাদী, হাফেজ, ফর্দৌসী, ওমর খায়ম প্রভৃতি মুসলমান কবিগণের কাব্য ও গাথা নূতন ভাব ও নূতন তত্ত্ব হিন্দুর সম্মুখে আনিয়া দিল। হিন্দুর ভাব-বিপ্লবও ঘটিল। এই বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমাজের মনীষিগণ ইসলাম-শক্তির সহিত একটা আপোশ করিতে উদ্যত হইলেন। গোরক্ষনাথ জাতি-নির্বিশেষে শৈব ধর্মের পুচার আরম্ভ করিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করিলেন যে, মহাদেব সদাশিব নিরাকার, নির্বিকার ঈশ্বর। তাঁহাতে রূপের আরোপ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয় না। চিহ্ন-বা পুতীক-স্বরূপ এক খণ্ড পুস্তর লিঙ্গ-বিধায় পূজিত হইবে। আর এই মহাদেবের মন্দিরে ও উপাসনায় উচ্চ-নীচ নাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্র নাই। রামানন্দও বৈষ্ণব ধর্মকে এই হিসাবে সর্বজাতির সেব্য করিতে চাহিলেন। তিনি ভক্তির পথ অবলম্বন করিয়া মোচ্ছ, শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলকেই এক সূত্রে বাঁধিতে চাহিলেন। হরিভক্ত, রামভক্ত, মোচ্ছ-চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণের পূজ্য হইবে—ইহাই রামানন্দের আদেশ; কেন-না, ভক্তির পথ সকলেরই গম্য ও সেব্য। গুরু নানক ব্যবহার-ধর্মী বা moralityকে ভক্তিতে ডুবাওয়া, সন্যাসের সহিত নিশাইয়া, ইসলাম ও হিন্দুধর্মের আপোশে শিখধর্মের স্রষ্টি করিলেন। শেষে বাঙ্গলায় শ্রীচৈতন্য শুদ্ধ হরিভক্তি-প্রবাহের প্রভাবে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া এক নবীন ধর্মের স্রষ্টি করিলেন। ঈশ্বরপ্রেম ও মধুর রসকে আশ্রয় করিয়া তিনি আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইলেন।

এইভাবে ইসলামের সহিত হিন্দুধর্মের কতকটা আপোশ হইল। হিন্দুসমাজে কতকটা সামঞ্জস্যের ভাব দেখা দিল। পক্ষান্তরে, সাহিত্যেও এইরূপ বিপ্লব ঘটিল।



এই ভাবেই তাহারও সামঞ্জস্য হইয়াছিল। তবে এই সময়ে ভাবপুৰাহ পশ্চিম হইতে বঙ্গে আসিয়াছিল। সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস প্রভৃতির হিন্দী পদাবলী, গীত ও মহাকাব্য-সকল পাঠ করিয়া বাঙ্গালার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির লেখা পড়িলে মনে হয়, যেন বাঙ্গালায় হিন্দীর প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে তুলসীকৃত রামায়ণের অনেক ছত্র, অনেক শ্লোক আদত পাওয়া যায়। সুরদাসের গীত-নহরী হইতে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সর্বস্ব পাওয়া যায়। এখন এক-একটি পদ তুলিয়া আশ্চর্য্য সন্মিলনের পরিচয় দিবার সময় নহে। তবে যাহারা হিন্দুস্থানী কবিদের লেখা পড়িয়াছেন, সেই সঙ্গে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম প্রভৃতিও পড়িয়াছেন, তাহারা এই কথার যথার্থ স্বীকার করিবেন। একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, এ দেশে ইংরেজের অভ্যুদয়ের পূর্বে বাঙ্গালী হিন্দুস্থানের সহিত সম্বন্ধ-চুষ্ট হন নাই,—বাঙ্গালী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দিষ্ট হন নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত হিন্দুকে পদমর্যাদা বজায় রাখিতে হইলে হিন্দী, উর্দু ও ফার্সী লিখিতে হইত। তখন বাঙ্গালী-মাত্রই হিন্দী বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন। বাঙ্গালা ভাষাও হিন্দী হইতে এখনকার মত এতটা পৃথক্ হইয়া যায় নাই। এই হেতু মনে হয়, বাঙ্গালার কবি হিন্দুস্থানের কবিকে আদর্শ করিয়া কাব্য-গাথা লিখিতেন।

সে যাহা হউক, এই জাতীয় নবোন্মেষের সময়ে যেমন ধর্ম্মে হিন্দু ও মুসলমানের বিশ্রাস-সামঞ্জস্য ঘটয়াছিল, তেমনই সাহিত্যেও হিন্দু-ও মুসলমান-রুচির সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছিল। ভক্তি যেমন ধর্ম্মপক্ষে সামঞ্জস্যীকরণের উপাদান ছিল, তেমনই রূপজ মোহ, লালসা ও ভক্তির জন্য আত্মদান সাহিত্যের ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছিল। সাহিত্যে ইসলাম-রুচি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে এই রুচির বিকট বিকাশ হইয়াছে। কবিকঙ্কণের কাঁচলীর বর্ণনা, আর কবি শ্যামদাসের শ্রীনতীর কাঁচলীর বর্ণনা ভাবে ও ভাষায় প্রায় একরূপ। এ বর্ণনা ইসলাম-রুচি-জাত। এমন ভাবে নারীর আভরণের বর্ণনা হিন্দুর পুরাতন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। হিন্দুর সমাজ-দেহের এই যে অভ্যুদান, ইহাকে ইংরেজিতে Indo-Islamic Renaissance বলা যাইতে পারে।

ইংরেজের অভ্যুদয় প্রথমে বাঙ্গালা দেশেই হয়। বাঙ্গালীই প্রথমে ইংরেজের সভ্যতার ও বিদ্যার পরিচয় পায়। সে পরিচয়ে বাঙ্গালী একটা নূতন সামগ্রী পাইল, উহা European Individualism — উচ্চ-নীচ নাই, পূজা-হেয় নাই। পুরুষকান সকলেরই আয়ত্ত; তাহার প্রভাবে সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ পদ পাইতে পারে। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন পুরুষকান-তত্ত্ব তুলিয়া গিয়া বাঙ্গালী এই পুরুষকারের মোহে মুগ্ধ হইয়াছিল। মুগ্ধ হইবার একটু হেতুও ছিল। ফরাসী-বিপ্লবের পরে ইউরোপ ফরাসীর অনুশীলিত ও প্রচারিত নূতন সাম্যবাদ পাইয়াছিল। সেই সাম্যবাদের উপটোকন প্রথমেই ইংরেজ বাঙ্গালীকে দিয়াছিল। এই সাম্যবাদ ও এই পুরুষকারের মোহে বাঙ্গালী প্রথমে দলে দলে খ্রীষ্টান হইতে লাগিল। নবাবী আমলে বরং জাতি-



বিচার ছিল, উচ্চ-নীচের পার্থক্য ছিল, সমাজে বিধি-নিষেধ ছিল। ইংরেজ এ দেশে আসিয়া সে সব উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। ফরাসীদের নিকট হইতে ধার করিয়া **Liberty, Fraternity ও Equality**—এই তিন মহামন্ত্র ইংরেজ বাঙ্গালীকে শিখাইলেন। হিন্দুসমাজে এই নবীন শিক্ষার প্রভাবে একটা বিপ্লব ঘটিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার ও খ্রীষ্টান ধর্মের সহিত আপোশ করিয়া সমাজ-সংস্কার উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম গড়িলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষা-পুণালীর সাহায্যে দেশীয় ছাঁচে পাশ্চাত্য ভাব ও কথা এ দেশে পুচুর পরিমাণে আমদানী করিলেন। পাশ্চাত্য-হিগাবে তিনিই প্রথম সমাজ-সংস্কারক হইলেন। পক্ষান্তরে, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এক দিকে, আর বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব অন্য দিকে, সাহিত্যের পথে স্বদেশীয় আবরণে এ দেশে পাশ্চাত্য ভাব-তত্ত্বের আমদানী করিলেন। ইহারাি আধুনিক **Indo-European Renaissance** এর প্রচারক- ও পুর্নর্জক-স্বরূপ।

প্রথমেই, ইংরেজের সাহিত্যে যাহা আছে, আমাদের বাঙ্গালা-সাহিত্যে যাহা নাই, তাহারই আমদানী আরম্ভ হইল। মাইকেল মিলটনের অনুকরণে অমিত্রাক্ষরে মহাকাব্য মেঘনাদবধ রচনা করিলেন। এ কাব্যে পাশ্চাত্য **Individualism** পূর্ণ-পরিষ্কৃত। আদিম মহাভারত বা বিষ্ণুপুরাণে যেমন কার্তবীৰ্য্যার্জুন, হিরণ্য-কশিপু, ভীষ্ম প্রভৃতি পুরুষার্থ-পূরণ চরিত-কথা আছে, ইসলাম-যুগে অদৃষ্টবাদের প্রাবল্যে তন্ত্রির আত্ম-নিবেদনের আধিক্যে জাতীয় সাহিত্যে ঐরূপ চরিত-কথার অভাব হইয়াছিল। মাইকেল সে অভাব পূর্ণ করিলেন,—রাবণ, মেঘনাদ প্রভৃতির পুরুষার্থ-পূরণ চরিতের অঙ্কন করিয়া জাতীয় সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিলেন। কবি হেমচন্দ্র এই **Individualism**কে বা পুরুষকারকে দেশহিতৈষণায় পরিবর্তিত করিলেন; তাঁহার কবিতাবলী, গাথা ও বৃত্তসংহারে দর্শীচির চরিত্র ইহার পরিচায়ক। খাঁচী **Patriotism** ইউরোপের সামগ্রী—এ দেশের নহে। কবি হেমচন্দ্র উহা এ দেশে কবির ভাষায় ফুটাইয়াছিলেন।

কবি নবীনচন্দ্র প্রথমে মাইকেল ও হেমচন্দ্রের ভাবমোহে পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য—পলাশীর যুদ্ধ। উহাতে **Patriotism** অতি মধুর-ভাবে বর্ণিত ও বিন্যস্ত আছে।

এই সময়ে এ দেশের ডাক্তার কংগ্রেজের মুখে অগস্ত কোম্তের (**Auguste Comte**) মতের আমদানী হয়। সে **Humanitarianism** আমাদের চক্ষে সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইল। সে **Humanitarianism** এর প্রভাবে ভারতের নানা জাতি ও নানী ধর্মের সমন্বয় সম্ভব মনে হইল। এই সময়ে আবার **Nationalism** বা জাতীয়তার প্রথম বিকাশ বাঙ্গালায় হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় ভাবকে দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া বিলাইবার চেষ্টা করিতেছেন—ইউরোপের **Culture**—তত্ত্বটাকে কালী আদমীর শাস্ত্রগন্ধত করিতে উদ্যত



হইয়াছেন, হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণকে ভারতের বিস্মার্ক বানাইয়া খাড়া করিতেছেন। পঞ্চাশত্রে ভূদেববাবু অপূর্ব মনীষার পুতাবে হিন্দুর খাঁটি সমাজতত্ত্ব ও পারিবারিক তত্ত্বকে ইংরেজি বুদ্ধিতে নিকলঙ্ক বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছেন।

ঠিক এই সময়ে কবি নবীনচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য Humanitarianismকে মহাভারতের গল্পের হাঁচে ফেলিয়া নূতন Nationalism এর সৃষ্টি-পুষ্টি করিয়া, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও পুভাস এই তিনখানি কাব্য-গ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর অভিনব মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। কোলরিজ-পুন্ড্র 'লেক'-কবিগণের Susquehanna'র স্বপ্ন, কোন্‌তের বিশৃঙ্খলিততার তত্ত্ব, অর্থাৎ Humanitarianism, এবং টেনিসনের লক্‌গুলি হলে বিশৃঙ্খলিততার বিবৃতি—এই সবগুলি সম্প্রতিত করিয়া আমাদের সনাতন মহাভারতের ছাঁচে ফেলিয়া নবীনচন্দ্র তিনখানি কাব্যগ্রন্থের রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রৌঢ় শরতের শেফালী-বর্ষার ন্যায় তাঁহার ভাষা আপনি আসে, আপনি ফুটে, আর আপন সৌরভে দশ দিক্ আমোদিত করিয়া দেয়। তাই তাঁহার এই তিনখানি কাব্য উদ্দেশ্য-মূলক ও সিদ্ধান্ত-বিন্যাসক হইলেও ভাষার গুণে অনেকের আদরের হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে ও ধর্মতত্ত্বে যাহা শিখাইয়াছেন, সূত্র ও ভাষ্যাকারে যাহার বিন্যাস করিয়াছেন, উপকথার ছলে দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারাম—এই তিনখানি উপন্যাসে যাহার আংশিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নবীনচন্দ্র তাঁহার তিনখানি কাব্যে সেই সকল তত্ত্বই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা সার্থক হউক আর নাই হউক, এই চেষ্টার জন্যই তিনি নূতন যুগের শেষ মহাকবি; কেন-না, মনে হয়, বাদ্শা ভাষায় আর তাত্ত্বিক কাব্যের প্রয়োজন নাই। তাই এখনকার কবিগণ Lyrics, Idylls লিখিয়া তাঁহাদের কাব্যশক্তির পর্যাবসান করিতেছেন।

ইসলাম ধর্মের সংঘর্ষের জন্য পূর্বে যে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, তাহাতে ভাব-প্রবাহ পশ্চিম হইতে পূর্বে বা বাদ্শায় আসিয়াছিল। খ্রীষ্টান ধর্মের সংঘর্ষে ও ইংরেজের অধিকার-বিস্তার-হেতু যে বিপ্লব এখন ঘটিয়াছে, তাহাতে ভাবপ্রবাহ বাদ্শা হইতে যুক্তপ্রদেশে ও পূর্বে যাইতেছে। কাশীর হিন্দুস্থানী কবি হরিশ্চন্দ্র পুথনে হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের কবিতা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর হইতে বাদ্শার ও বাদ্শালীর নাটক, নভেল ও কাব্যগ্রন্থসকল বর্ষে বর্ষে হিন্দীতে ভাষান্তরিত হইয়া পুচারিত হইতেছে। কাল-মাহাত্ম্যে ভাবের উজান গতি হইয়াছে।

এই সময়ে বলা ভাল যে, ইসলাম-সভ্যতার জন্য যে ক্রটি আমাদের সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল, তাহার অনেকটা অপনোদন হইয়াছে। হিন্দুর সহজ-বুদ্ধি অতীন্দ্রিয়বাদ-প্রসারিণী বা Transcendental, তাই স্বরদাস ও চণ্ডীদাস প্রেমটাকে ভগবানের পারিজাত-হারে পরিণত করিয়াছিলেন। বর্তমান কালের ইংরেজি-নবীন বাদ্শালী কবিগণ বুউনিং ও গেটের লেখায় উহারই সমাক্ পরিচয় পাইয়া, বাদ্শা সাহিত্যে প্রকারান্তরে সেই সকলের আনদানী করিতেছেন। ইহার ফলে ক্রটি অনেকটা



পরিণত হইয়াছে। কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে ইউরোপের এই বিচিত্র Transcendentalism এর কতকাংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কবি নবীনচন্দ্রের কাব্য-শক্তির পরিচয় দিবার এখনও সময় আসে নাই। তবে বঙ্গ-সাহিত্য ও সমাজে তাঁহার স্থান ও মান কেমন তাহার পরিচয় যথাশক্তি প্রদত্ত হইল। তিনি বর্তমান অভ্যুত্থানের শেষ মহাকবি—শেষ ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্ৰমুখ বৈষ্ণব কবিগণ কবিতার পুতাবে ও কাব্যগ্ৰন্থ-প্ৰচারে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম উদ্দেশ্য না হউক, তদনুরূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পুরাণে কবি নবীনচন্দ্র ইদানীং কবিতাগ্ৰন্থ-সকল লিখিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ ইহাই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয়।

[ সাহিত্য, ১৩১৫ ]

## কবি হেমচন্দ্র\*

পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়

কবি হেমচন্দ্র বাঙ্গালার নবীন যুগের প্ৰবর্তনার কালে জন্মগ্ৰহণ করিয়াছিলেন। ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ তিনি ভূমিষ্ঠ হন। সে সময়ে বঙ্গদেশে নবীন ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার বন্যা আগিয়াছিল। সে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতায় ফরাসী-বিপ্লবজাত সিদ্ধান্তসকল অতিমাত্রায় বাঙ্গালায় আমদানী হইতেছিল। সে আমদানীর ফলে—“কালস্রোত তখন কেবলই ভাঙ্গিতেছিল; ভাঙ্গিব বলিয়া ভাঙ্গিতেছিল, গড়িব বলিয়া ভাঙ্গিতেছিল। হেমবাবুর জন্ম-সময়ে কোন-কিছু ভাঙ্গিতে পারিলেই কৃতবিদ্যা আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সমাজ ভাঙ্গিতে হইবে, ধর্ম ভাঙ্গিতে হইবে, প্রথা ভাঙ্গিতে হইবে, চরিত্র ভাঙ্গিতে হইবে, সদাচার ভাঙ্গিতে হইবে। এমন কি, অন্যাকারে অত্যাচারে স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া অকালে কালস্রোতে ডুবিতে পারাও যেন সেই সময়ে গৌরবের বিষয় বলিয়া ধারণা হইত।” জন্ম মল্লী রূসোর জীবন-কথা লিখিতে যাইয়াও এই কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে,—ফরাসী-বিপ্লব সমাজ-দেহের সংহার-মুক্তি, যেখানে প্ৰবেশলাভ করিয়াছে, সেইখানেই ভাঙ্গিয়াছে; অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া সমাজের জন্য যেন এক নূতন বেদী গড়িয়া দিয়াছে। সেই বেদীর উপর সমাজ স্বীয় কুক্ষিগত পুচ্ছশক্তি পুতাবে নিজেকে দেশ-কাল-পাত্রের অনুকূল নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এই গড়নে পুতোক দেশের পুতোক জাতির Genius বা পুষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই জন্ম মল্লীর সিদ্ধান্ত।

\*অক্ষয়চন্দ্র সরকার-প্ৰণীত “কবি হেমচন্দ্র” গ্রন্থ।



শাস্ত্রে বিধিনিষেধ-দ্বারা সুরক্ষিত, গোঁড়ানী বা Conservatism-দ্বারা সুরক্ষিত, স্থিতিশীল, সনাতন হিন্দুসমাজ কেন এমন আন্গা হইয়া গিয়াছিল, যাহার জন্য কেবল ইংরেজি শিক্ষার আমদানীতে বাঙ্গালায় এমন ভাঙ্গন ধরিল—সে কথাটা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র ফুটাইয়া বলেন নাই। তিনি কেবল ফলটুকু ধরিয়া লইয়াছেন; কোন্ কারণ-পরস্পরার জন্য এমন ফললাভ হইল, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই। গ্রন্থ এই ক্রটি আছে। ক্রটি বলিলাম এই জন্য যে, সে বিশ্লেষণ তিনি ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আর কেহ ঠিকভাবে করিতে পারিবেন না। একা তিনিই এই প্লাবন-পক্ষে পাঁকাল মাছ হইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন; ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মনীষার শীতল আশ্রয়ে থাকিয়া তিনিই নিঃসঙ্গভাবে এই পরিবর্তন-লীলা দেখিতে পারিয়াছেন। তাঁহার ‘সনাতনী’ সে দর্শনের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ‘কবি হেমচন্দ্র’ গ্রন্থেও তিনি স্থানে স্থানে আকার-ইচ্ছিতে ধরা দিয়াছেন। অতএব ইংরেজের আমলের গোড়ার ও মধ্য যুগের ইতিহাস-কথা কবি হেমচন্দ্রের বিশ্লেষণ ফুটাইয়া না তোলাতে গ্রন্থকার আনাদিগকে অজ্ঞাতে একটু কঁাকি দিয়াছেন।

হেমচন্দ্র ইংরেজি আমলের মধ্য-যুগের অবতার-স্বরূপ। সে যুগের দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা—সকলই তাঁহাতে পরিস্ফুট। সে যুগ না বুঝিলে যুগাবতারকে বুঝান যায় না। তাই হেমচন্দ্রের শেষ-জীবনের নিরাশার তত্ত্ব, অন্ধতা-জন্য বিশ্বস্ততার ভাবটা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই। মনে হয়, তেমন নির্ভর কঠোর ভাবে সকল সত্য কথা প্রকাশ করিয়া তত্ত্ব বুঝাইবার সময় এখনও হয় নাই। যাহা হউক, সরকার মহাশয় তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কেন-না, মনস্বী লেখক হেমবাবুকে ধরিয়া যে সকল কথার উত্থাপন করিয়াছেন, সে সকল কথার এখন যত অধিক আলোচনা হইবে, ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। তাহাতে সাহিত্যসেবীদিগের সাহিত্যসেবার পথ প্রশস্ত হইবে; আমরা অনেকে নিজেকে ও সমাজকে চিনিতে পারিব।

সর্বাপেক্ষা শেষের কথাটির আলোচনা করিব; সেটা জাতিবৈবরের কথা। সাহিত্য-সম্রাট্ ৩৬ক্লিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১২৮০ সালের ১১ই কান্তিকের ‘সাধারণী’ পত্রিকায় জাতিবৈবরের আলোচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন—

“সাধারণ বাঙ্গালীর অপেক্ষা সাধারণ ইংরেজ যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যেখানে একপ ভারতম্য, সেখানে যদি শ্রেষ্ঠ পক্ষ নিষ্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শনিত-বল হইয়া থাকিতে পারেন, নিকট পক্ষ তাঁহাদের নিকট বিনীত, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান হইয়া থাকিতে পারেন, তবেই উভয়ে প্রীতির সম্ভাবনা। . . . . অতএব ইংরেজেরা যদি আমাদের পুতি নিষ্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শনিত-বল হইয়া আচরণ করিতে পারেন, আর আমরা যদি তাঁহাদিগের নিকট নম্র, আজ্ঞাকারী ও ভক্তিমান হইতে পারি, তবে জাতি-বৈবর দূর হইতে পারে। . . . . আজ্ঞাকারী আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি, এবং হইতেও পারিব না; কেন-না আমরা প্রাচীন জাতি।\* অদ্যাপি মহাভারত-রামায়ণ পড়ি, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা-



অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতের অতুল্য ভাষার ঈশ্বর-আরাধনা করি। যত দিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি, তত দিন বিনীত হইতে পারিব না। মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতি-বৈর আমাদের পুঙ্ক্ত অবস্থার ফল।

“যত দিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জ্যেতু-সদ্বন্ধ থাকিবে, তত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও পূর্ব গৌরব মনে রাখিব, তত দিন জাতি-বৈর-শমতার সম্ভাবনা নাই; এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত দিন যেন আমাদের মধ্যে এই জাতি-বৈরিতার পুভাব এমনই প্রবল থাকে। যত দিন জাতি-বৈর আছে, তত দিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরতাবের জন্যই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি। ইংরেজের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহাসিত হইলে যত দূর আমরা তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইবার যত্ন করিব, তাঁহাদিগের কাছে বাপু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে তত দূর করিব না; কেন-না, সে গায়ের আলা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্বীপক। উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।”

এই জাতি-বৈর ভাবটা ইংরেজি-শিক্ষাজাত। আমাদের নবীন বঙ্গসাহিত্যের মেদমজ্জা এই জাতি-বৈর। বঙ্গলাল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই এই জাতি-বৈরের ছড়াছড়ি করিয়াছেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, এই তিনই ফরাসী-বিপ্লব-জাত। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বকাল পর্য্যন্ত এই তিন কথার মোহে মুগ্ধ হইয়া ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়ের বহু জনেই দেশ-শাসন করিবার চেষ্টা করিতেন। এই তিন কথার পুভাব বুঝিয়া সে কালের ইংরেজি-শিক্ষার প্রচলনও এ দেশে হইয়াছিল। গৃহকার সত্যই বলিয়াছেন যে,—জাতি-বৈর আমাদেরও ছিল, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চতুর্পাশীর আটচালার লুকাইয়া ছিল। ইহার তেমন জাঁক ছিল না বটে, পরন্তু পুণ্য গভীরতা ছিল। পুণ্যতা ছিল বলিয়াই চাকুরি-নবীশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এখনও টিকি-চটি ছাড়িতে পারে নাই। এই জাতি-বৈরে পেট্রিয়াটিজমের গরম-মশলা দিয়া উহাকে বঙ্গলালই প্রথমে জাঁকাইয়া তোলেন। পরে হেমচন্দ্র সে জাঁক কোণী গুণে বাড়াইয়া দেন। এখন উহা ভাষার স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। গৃহকার বলিতেছেন—

“কিন্তু ঐ কাছারি-কলেজ পর্য্যন্ত। হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে এ কথা পৌছে নাই। হাটে হাটুরিয়া জানে না, হেমবাবু কে? মাঠে চাষা হেমবাবুর নামগন্ধ শুনে নাই। স্নান-ঘাটের পল্লী-মুখতী বুঝে না যে ‘ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়।’ বাটে লম্বা-লাঠিতে গামছা-বাঁধা কত লোক চলিয়াছে—জানে না, ভারত কাহাকে বলে। দাশরথির পুসার হেমবাবু পান নাই।”

হেমবাবু কেন, কোনও বাঁবুই পান নাই। আজ নীলকণ্ঠের গান হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে সুপ্রচলিত; রবীন্দ্রনাথের বা দ্বিজেন্দ্রলালের গান হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে কেহ করিতে চাহে না। কেহ বলে, ভিখু পাই না; কেহ বলে, গৃহস্থ শুনে না। তাই আমি স্বানাস্তরে বলিয়াছিলাম,—স্রোতের শেহনার মতন এই যে ইংরেজি-গদ্য সাহিত্য-সমাজ-মাগরের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে—যাহার জন্য আমরা এতটা মাথা-কোটা-কুটি করিতেছি—একটা তুফান উঠিলে, ঢেউয়ের মুখে উহা কোথায়



তলাইয়া যাইবে। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র ইচ্ছিতে আমাদের এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

“কিন্তু এই যে দৃষ্টি, এই যে উৎসাহ—সমস্তই বানরের। তবে বানরের দ্বারা গীতা-উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই গীতাহারা হইয়া শূঁরাবের বাদরে আদর।”

অথাৎ নিছক অনুচ্চীর্ণা-জাত যাহা, তাহা কখনই টেক্‌সহি হয় না। যাহা সমাজের নিম্নতর স্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ-লাভ করিতে না পারে, তাহা কুংকারে উড়িয়া যায়। জল ঘোলাইতে হইলে তলার জল উপরে তুলিতে হয়; কেবল টোপা-পানা নাড়িলে জল ঘোলান হয় না। কথাটা ঠিক; আমরা অবনত-মস্তকে এ দিক্‌দিক্‌ মাথায় করিয়া লই। কিন্তু আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব—যে বানর-কটক সমুদ্র-বন্ধন করিয়াছিল, লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিল, গীতার উদ্ধার করিয়াছিল, তাহার কি নকল-নবীশ ছিল? বানর হইলেও তাহার একনিষ্ঠায় দেব-নর-পরাজয়ী। সে বানর, আর এই বানর! হিন্দীতে আছে—‘ক্যা কহে রান অব বদীয়া বিচে ডোরী!’

জাতি-বৈরের উপর জাতীয় জীবন। কাজেই এইবার জাতীয় জীবনের কথাটা কহিতে হয়। গুণ্ডকার বলিতেছেন—

“প্রথমত, ‘বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন’—এই কথাটাই আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। ‘ভারতীয় জাতীয় জীবন’ কংগ্রেস-কর্ত্তারা বুঝিয়া থাকিবেন, আমরা কিছুই বুঝি না। সেই ভারতীয় জাতীয় জীবনের অংশ যদি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন হয়, তাহা হইলে সে ত আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। তা না বলিয়া, যদি হিন্দু-জীবনের অংশ বলিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহাতেও বিশেষ সুবিধা হয় না। কতটুকু অংশ? যতটুকু বাঙ্গালার ভূগোলের মধ্যে? বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যে? তবে কাশী কি আমাদের জাতীয় জীবনের কিছু নয়? রাম-লক্ষ্মণ? তাঁহারাও কি কিছু নয়? সে আবার কিরূপ জাতীয় জীবন হইল? তা ত বুঝিলাম না।

“আগল কথা—‘জাতীয়তা,’ ‘জাতীয় জীবন,’ ‘দেশহিতৈষিতা’ প্রভৃতি বাক্যগুলি একটু বুঝিয়া-সুঝিয়া ব্যবহার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে,—নতুবা ‘কার্য্যক্ষেপে’র মত সকলেই ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করিবে, কেহ কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিবে না—সেটা কিছু নয়। মরা কথার ওরূপ ব্যবহার চলে, তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু জাতীয়তা বলিয়া যদি কিছু জীবন্ত জিনিষ করিতে, রাখিতে বা বুঝিতে চাও, তাহা হইলে, ‘কার্য্যক্ষেপে’র মত করিলে চলিবে কেন? আর একটি কথা—দেশ-হিতৈষিতা। সে কিরূপ পদার্থ? দেশহিতৈষিতা কি বলে যে, কাশী-পুরী-শ্রীধাম হইতে নান্দা-মুশিদাবাদ ভাল? তা ত আমরা বুঝি না। তবেই হইল,—আমরা হইলাম বর্ণাশ্রমবাদী, অধিকার-ভেদবাদী হিন্দু। কাজেই ঐ কথাগুলি আমাদের জন্য নহে। আমরা ব্যবহার করি তোতাপাখীর মত। সে ব্যবহারে কোন কাজ হয় না।

“আমাদের কথা—কার্য্য হয় ধর্মে। সংকার্য্য হয় ধর্ম্মমূলে। কিন্তু ইহকালেই ধর্ম্মের শেষ নহে। ধর্ম্ম ইহকাল-পরকাল ব্যাপিয়া অবস্থিত। সেই ধর্ম্ম-রক্ষা করাই সকলের কর্ত্তব্য। আমাদের আর বিতীয় কর্ত্তব্য নাই। তাহাতে জাতীয়তা আসে আত্মক, পেট্রিয়টিজ্‌ম্ পড়ে পড়ুক। বাস্তবিক সকলই উহাতে আসে। মনুষ্যের সকল উপাদানই ধর্মে। স্বধর্ম্ম-রক্ষা করিতে পারিলেই মনুষ্যের দ্বিতী ও পুষ্টি হয়।



“বহুকাল হইতে চীনানান চীন অর্থাৎ স্বদেশ-রক্ষা করিতেছে। স্বর্গ-রক্ষা করিতে পারে নাই; জাতি-রক্ষা করিতে পারে নাই। স্বর্গে চীন কখন কনকুগীয়, কখন তান্ত্রিক, কখন বৌদ্ধ, অথচ ক্মি-কীট-‘এপি’-ভোজী। জাতিতে চীন হুন-তুরস্ক-মোগল-মিশ্র। কিন্তু দেশ—খাস চীন; এলাকা—মহাচীন। এ একরূপ দেশহিতৈষিতা।

“স্বর্গ আছে, জাতি আছে, পুরাণ আছে, শাস্ত্র আছে, দেশ নাই—যুদীর। স্বর্গ আছে বলিয়াই দেশান্তরী হইয়াও যুদী জানে জানবান্, ধনে ধনবান্, দীর্ঘায়ু, স্বচ্ছন্দ, সবল, স্থলর। যুদী পালেস্তীনের ব্যাধ হইতে সমুদ্রদিগকে ঋণদান করে। যুদী সঙ্গীত-পটু, ভাষ্য-নিপুণ, চিত্র-বিশারদ।”

কথাটা খুব মোটা করিয়া বলা হইয়াছে বটে। তবে জাতি-বৈরের বেদীর উপর যখন জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা, তখন উহা ইংরেজের Nationalism এর মত আকাশকুসুমবৎ যুগরোচক Nationalism; উহা কাজে নাই, কথায় আছে। তোমার যাহা আছে, আমারও তাহাই আছে—এইটুকু ইংরেজকে বুঝাইবার জন্য এই জাতীয় জীবনের উৎপত্তি। হেমচন্দ্র স্বয়ংই তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

“এই কৃষ্ণজাতি পূর্বে যবে  
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,  
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান,  
অগাধ শরীরে পাইল পরাণ;  
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া  
উৎসাহ-হিরোলে সে শ্বনি শুনিয়া  
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।”

লেখবিজ্ঞ যে বাঙ্গালীকে গারোদিগের সামিল করিয়াছিল, উহা তাহারই উদ্ভব। সে উদ্ভব এখন Shibboleth বা পরিচয়ের শূবাঘ দাঁড়াইয়াছে। ঐ পর্য্যন্ত। তবে আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র একটা বড় কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন—

“তুমি ম্যাপ দেখাইয়া বল,—‘ঐ দেখ, ইংরেজি কতদূর বিস্তৃত’; আমি ইতিহাস খুলিয়া দেখাইয়া দিই—বলি,—‘ঐ দেখ বৈদিকী সংস্কৃত ভাষা কতদূর হইতে প্রবাহিত হইতেছে।’ তোমার দেশে বিস্তৃতি, আমার কালে বিস্তৃতি।”

—কথাই ত এই। আমি হিন্দু, আমি চাহি স্থিতি; এক জন্ম আমার কাছে পরিমাপ-যোগ্য কালই নহে। আমি স্থিতি চাহি বলিয়াই আমি পরকালে বিশ্রামী; আমি স্থিতি চাহি বলিয়াই আমার জীবন-মরণ নববস্ত্র-গ্রহণ ও জীর্ণ-বস্ত্র-পরিত্যাগের তুল্য সামান্য ব্যাপার। আমি স্থিতি চাহি বলিয়াই দেহের জন্য আমি কখনই চিন্তিত নহি, আমার দেহ আমার কর্ণের যন্ত্র-স্বরূপ। আর তুমি ইউরোপ, তোমার দৃষ্টি গতির দিকে, উন্নতির পুতি। সে উন্নতি দেহের পূর্ণ অপেক্ষা করে; তাই তুমি দেহ লইয়া কেবল বিবৃত, তোমার জ্ঞান, বিজ্ঞান, পদার্থ-বিদ্যা—সকলেরই বিনিয়োগ ভোগ্যতন দেহের তুষ্টি-পুষ্টির পুতি। দেহান্তবুদ্ধ তুমি, তোমার ব্যাপ্তি, দেশের বিস্তৃতি ধরিয়া; কর্মান্তবুদ্ধ হিন্দু আমি, আমার ব্যাপ্তি কাল লইয়া। আমি যুগে



যুগে আছি, যুগে যুগে থাকিব ; তোমার দেহ ভাঙিলে, জলবুদ্বুদ তুমি অজ্ঞের সাগরে ডুবিয়া যাইবে।

এইবার হেমচন্দ্রের কবিতার কথা বলিব। গ্রন্থকার আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র প্রায় সাতাইশ বর্ষ পূর্বে 'নবজীবনে' লিখিয়াছিলেন—

“ বলিতে একটু দুঃখ হয়, একটু সন্দোহও হয়,—কিন্তু কথাটা ঠিক যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার শেষ কবি। মহাসুদন বাঙ্গালার মিল্টন, হেমচন্দ্র পিটার, নবীনচন্দ্র বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ শেলি,—বেশ কথা ; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার কি ? ঈশ্বর গুপ্ত—বাঙ্গালার ঈশ্বর গুপ্ত। ঐ কথার ঈশ্বর গুপ্তের নিদা, ঐ কথার ঈশ্বর গুপ্তের পুণ্যগা। তাঁহার কবির বাঙ্গালীর নিজস্ব। সেটুকু দরিদ্রের ক্ষুদ্র মুদ্রা হইলেও তাহার নিজস্ব। আর নিজস্ব বলিয়াই বড় আদরের সামগ্রী।

“ তবে কি হেমবাবুর কবিতা আমাদের নিজস্ব নহে ? আমাদের আদরের সামগ্রী নহে ? নিজস্বও বটে, বিশেষ আদরের সামগ্রীও বটে,—কিন্তু একটু কথা আছে।

“ তোমার সহবান্ধিনী বিরলে বসিয়া একান্ত মনে মধুমলের উপর ফুল তুলিয়া একটি সুন্দর টুপি তোমার জন্য তৈয়ার করিলেন। তোমাকে দিলেন, তুমি হাসিতে হাসিতে মাথায় দিলে, হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া দশ জন বন্ধুবান্ধবকে দেখাইলে। সেই টুপিটি তোমার প্রিয়া-স্ব, তোমার নিজস্ব, তোমার কত আদরের সামগ্রী ! কিন্তু উলগুলি সমস্তই বিলাতি উল ; ফুলগুলি বিলাতি ফুল ; চিত্রের বিলাতি লতাটি বিলাতি প্যাঁচে জড়াইয়া আছে। সেই নিজস্বের ভিতর হইতে একরূপ পরস্ব পরতে পরতে উকি মারিতেছে। তাহার পর, সেই দশ জন বন্ধুবান্ধবকে লইয়া যখন ভোজনে বসিলে, তখন তোমার গৃহিণী নিজে রাঁধিয়া-বাড়িয়া স্বহস্তে পলানু পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলে নরন জুড়ায়, গন্ধে গৃহ ভুরভুর করিতেছে ; তাহাতেও পেস্তা, কিশমিশ্ পুত্তি বিদেশী ভ্রবোর আবির্ভাব আছে, কিন্তু সে কেবল মশলা বৈ ত নয়। আতপ তুলা, গব্য মৃত, সদা মাংস—অপূর্ব মিশ্রণে মিশ্রিত করিয়া গৃহিণী অনুপূর্ণার নাম লইয়া রাঁধিয়াছেন। আর পাকা সোনার বালা দু'গাছি নদীর ধাঁজে বসাইয়া সেই মে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে, ধীরে ধীরে পরিবেষণ করিতেছেন, এ সকলি—পদার্থ, প্রকরণ, তাবতঙ্গি,—আমাদের নিজস্ব। পরস্ব কিছু থাকিলেও নিজস্বের অগাধে তাহা ডুবিয়া গিয়াছে, নিজস্বের ধুহুত্রে তাহা বিলীন হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা তেমন ভুতুরে পলানু না হইলেও চল্‌চলে মাছের ঝোল ত বটে। তাঁহার কবিতা আমাদের নিজস্বের নিজস্ব, আমাদের আদরের সামগ্রী, আমরা বড় ভালবাসি।

“ গৃহিণীর স্মৃত ঐ টুপি ফেলিয়া দিয়া, গৃহিণীর পুস্তক ঐ পলানু বা মৎস্যমূপ খাইয়া দিন যাপন করিতে বলি না। তবে মাছের ঝোলের স্থানে কাটলেটকে আদর করিতে দেখিলে, সত্য সত্যই দুঃখ হয়। দিন দিন কিন্তু তাহাই হইতে চলিল। বাঙ্গালীর খাঁটি বাঙ্গালা পদ্য এখন আনাচে-কানাচে আশ্রয় লইয়াছে। ইংরাজী-গদ্য, ইংরাজী-ছন্দ,—তাহার উল ইংরাজী, তাহার ফুল ইংরাজী,—একরূপ পরস্ব পদ্য কেবল আসর জাঁকাইয়া পগার করিতেছে।—দুঃখ হয় না ? আমাদের হয় ত হয় না ; আমাদের কিন্তু হয়।”

—এ কথা ত স্বীকার করিতেই হইবে। ইংরেজি-নবীশ হেমচন্দ্র ইংরেজি ভাবে মুগ্ধ। কেবল তাহাই নহে ; ইংরেজের সাহিত্যে যাহা আছে, পাছে বাঙ্গালীর সাহিত্যে তাহা খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, এই ভয়ে তিনি অভাব-পূরণে সদা ব্যস্ত ছিলেন। মাইকেলকে মিল্টনের আসনে বসাইয়া মাইকেলের পরিচয় তিনিই বাঙ্গালীকে দিয়াছিলেন। বাঙ্গালার স্বদেশ-ভক্তির গান ছিল না, তিনিই তাহার অভাব-পূরণ করিলেন। এই অভাব-পূত্রির 'চেষ্টায়' তাঁহাকে বিদেশ হইতে অনেক সামগ্রীর



আমদানী করিতে হইয়াছিল। কিন্তু হেমচন্দ্র সে সকলকে বাঙালীর আকারে পরিণত করিয়া, হেম-স্ব করিয়া আমদানী করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কবিতায় ইংরেজিগানের ঋমটে ভাব কাণে ঠেকে না। সত্যই এ পক্ষে হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্র অপেক্ষা শক্তিধর। হেমচন্দ্রের শক্তি আমাদিগকে মগ্নমুগ্ধ করে। তাঁহার শক্তি-মগ্নবলে আমরা অনেক পরস্বকে নিজের করিয়া লইয়াছি। হেমচন্দ্র সত্য সত্যই সরস্বতীর বরপুত্র। ভাবের কোটাল যখন তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে ডাকিয়া উঠিত, তখন তিনি যেন কতকটা বিহ্বল হইয়া পড়িতেন; যেন তাঁহার মনে হইত, এ ভাষা পর্য্যাপ্ত হইতেছে না—যেন সকল কথা খুলিয়া বলা হইল না। ভাবের মুখে তিনি জ্ঞানহারা—আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। তখনই পরাধীনতার আলা শত বৃশ্চিক-দংশনের আঘাত মতন তাঁহার পক্ষে অগহ্য হইত; তখনই রাজনীতির বিধিনিষেধের বন্ধন তাঁহার অস্থিরশিল্পকে যেন চূর্ণ করিয়া ফেলিত। তাই তাঁহার কবিতার সুরে সুরে কাতরতার অশ্রু যেন মাখান—ছড়ান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া, উচ্চকুলোদ্ভব বন্দ্যবটী হইয়াও তিনি জীবনের কোনও ব্যাপারে বন্ধন সহ্য করিতে পারিতেন না। জাতির বন্ধন, সমাজের বন্ধন, সম্বন্ধের বন্ধন, বর্গের বন্ধন, রাজার বন্ধন—কোনও বন্ধনই তিনি কখনই সহিতে পারেন নাই। শৈশবে আদর পাইয়াছেন, যৌবনে ভাগ্যদেবতার কৃপায় যাহা করিয়াছেন, তাহাই সাজিয়াছে, মানাইয়াছে; তাই তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বলতা অনন্যসাধারণ ছিল। বড় অভিমানী, বড় আদরে তিনি, বার্ককে অন্ধ হইলে এই বন্ধনের ভয় তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। সে কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া আমার কাছে অনেকবার বলিয়াছিলেন। তাঁহার ‘অতৃপ্তি’-শীর্ষক কবিতায় এ কথাটা খুলিয়াই বলিয়াছেন—

“বিধাতা হে, নাহি জানি,                      প্রাণে কেন হেন গ্লানি,  
মাঝে মাঝে বিরজি-উদয়।  
ধাকিতে এ ভবনিধি,                      পরাণে কেন এ ব্যাধি,  
বল বিধি, বল হে আশায়।  
আজ নয়, নহে কাল,                      এই ভাব চিরকাল,  
কেন মন হেন তিক্ত হয়।  
কিছুই না ধরে মনে,                      অসাধ সদাই প্রাণে,  
কিছুতেই সাধ নাহি রয়।”

এই নৈরাশ্য-জন্য তাঁহার কবিতায় Pessimism ভরা আছে। সাধ নিটে না—মনের মতন করিয়া মনের কথা বলা হয় না—তাই ‘অশোক-তরু’ কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

তরুরে, আমার মন                      তাপদণ্ড অনুক্ষণ,  
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা;  
আমি, তরু, জগতের মেঘ-স্বর্ষ হারা।



জায়া, বন্ধু, পরিবার,      সকলি আছে আমার,  
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা ;—  
মনে ভাল, কেহ মোরে বাসে না তাহার।  
এ দোষ কাহারো নয়,      আমিই কলঙ্কময়,  
আমারি অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভরা,—  
আনি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা।”

ইহাই কবির আত্ম-পরিচয়। এ পরিচয়টা পারিবারিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া ফুটাইয়া তুলিব না। তাহার সহিত বাদ্রানার সাহিত্যসেবীদিগের সংগ্রহ বড় কম। তবে বুঝিয়া রাখা ভাল যে, যে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে ‘হতাশের আক্ষেপ,’ সেই উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে ‘অতৃপ্তি’র সূচনা। পাছে সেই অতৃপ্তিজাত কাতরতার প্রভাবে বাঙ্গালী বিগড়ায়, তাই তিনি ‘মন্ত্র-সাধন’ লিখিয়াছেন, আশার কথায় স্বধীবর্গকে উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যের মাপকাঠিতে হেমচন্দ্রকে মাপিলে চলিবে না ; তাহার সময়ে বঙ্গীয় ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজে ঐ দুইটার একটাও ছিল না। ঋষিতুল্য তুদের যুগোপাধায় পরে ইংরেজির আবরণে আধুনিক বাদ্রানা সাহিত্যে ঐ দুইটার আমদানী করিয়াছেন। সে আমদানীর প্রতি হেমচন্দ্র তেমন দৃষ্টিপাত করেন নাই। ‘পুচার’ ও ‘নবজীবন’ যখন এই হিন্দুয়ানীর চেউ তুলিয়াছিল, যখন বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে পুরুষোত্তমের ঘাটে যাইয়া সাগরের চেউ লইতে উপদেশ করিতে-ছিলেন, তখন হেমচন্দ্র অগাধ হইয়া আসিতেছিলেন। তবে অন্ধ হইয়া বিধাতার কশাঘাত খাইয়া, সে ভাবের একটুকু অংশ তাহার মনে জাগিয়াছিল। তখন ‘নির্ব্বাপ-দীপে কিম্ব তৈলদানম্।’

হেমচন্দ্র ও মাইকেলের তুলনায় সমালোচনার কাল যে আইসে নাই, এমন কথা আমি বলি না। আসিলেও সে কাজ এখন করে কে? তেমন কাজের কাজী থাকিলেও তেমন মাপকাঠি ঠিক করিয়া দিবে কে? যে কালে মধুসূদনের উদয়, সেই কালের পরিণতি-সময়ে হেমচন্দ্রের অভ্যুদয়। মধুসূদন যে ভাবে পরস্বকে নিজস্ব করিতে পারিয়াছিলেন, মধুসূদন যে দেশী মশলার পরস্বকে ছানিয়া নিজস্ব করিতে পারিয়াছিলেন, সে মশলার ব্যবহার হেমচন্দ্র জানিতেন কি? মধুসূদন গুরু, হেমচন্দ্র শিষ্য ; মধুসূদন ওস্তাদ, হেমচন্দ্র সাক্ষরদ। কিন্তু হেমচন্দ্র এক গুরুর শিষ্য নহেন—তিনি ভারত-চন্দ্রকেও গুরু করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গী কবিগণের ছন্দের ও ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাই হেমচন্দ্র পুরাদস্তুর মধুসূদনের অনুবর্তী হইতে পারেন নাই। তাই ‘বৃত্তসংহার’ ভাষায় ও ছন্দে কতকটা জগা-খিচুড়ী হইয়া গিয়াছে। তাই ‘বৃত্তসংহার’ মহাকাব্য হইলেও, জাতি-বৈরের ব্যাখ্যাপুস্তক হইলেও, ভাষার বাঁধুনির হিসাবে, ভাষার জমাটহিসাবে মেঘনাদের নিম্নস্তরে অবস্থিত। মেঘনাদে মিলটনের গন্ধ পাইলেও সে গন্ধ দুর্গন্ধ বলিয়া মনে হয় না। কবির শব্দসম্পদে ও ভাবৈশুর্য্যে সে গন্ধ তীব্র ও মনোমোহন বলিয়া বোধ হয়। ‘বৃত্তসংহার’ এ তেমনই দাস্তুর ইন্ফার্মেশন



গন্ধ পাওয়া যায় ; সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, কবি যেন সে গন্ধ চাকিবীর পুরাণ পাইয়াছেন ; পদে পদে যেন সেই ব্যর্থ চেষ্টায় গলদ্বন্দ্ব হইয়াছেন । এইখানে ওস্তাদে ও সাক্ষরেদে পার্থক্য ; এইটুকুতে কে ছোট, কে বড়, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় । হেমচন্দ্র জাতি-বৈরের অপরাধের ও অদ্বিতীয় কবি—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । যেখানে জাতি-বৈরের কথা, সেইখানেই হেমচন্দ্র গুরু উপর টেকা দিয়াছেন, সেইখানেই তিনি মধুসূদনের উপর চলিয়া গিয়াছেন । জাতি-বৈরের কাব্যের হিসাবে 'বৃত্তসংহার' বাঙ্গালার অদ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ—ভাবে, রসে ও ঝাঁজে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে ; এমন হয় নাই, বুঝি-বা এমন হইবে না । আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন যে,—

“সে জাতি-বৈরে পুণ-পুতিষ্ঠা করিয়া বীর-কাব্যের অভিনব পুতিমা হেমচন্দ্র বদে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—বৃত্তসংহার ।”

'দশমহাবিদ্যা'র কথা লইয়া আমরা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বিতণ্ডায় মাতিব না । বস্তুতঃ, হেমচন্দ্র 'দশমহাবিদ্যা'র ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি শাস্ত্রিকতা, অথবা চলিত মতের পুণ্ড্রতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই । দশমহাবিদ্যার রূপ-বর্ণনায় সকল তত্ত্বও একমত নহেন । নানা তত্ত্বে নানা ভাবে দশমহাবিদ্যার চিত্র-সকল অঙ্কিত হইয়াছে । সুতরাং সে পক্ষ ধরিয়াও হেমচন্দ্রকে দোষ দেওয়া চলে না । কাব্যের হিসাবে 'দশমহাবিদ্যা' বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব সামগ্রী—বড় মধুর, বড় সুন্দর, বড়ই পুণ্য । ঠিক ডার্বিন-তত্ত্বের মাপকাঠিতে উহাকে মাপিলে চলিবে না, ইভোলিউশন থিওরী ধরিয়া ঘোল-আনা বুঝিবার চেষ্টা করিলে স্থানে স্থানে বাধা পাইতে হইবে সত্য ; কারণ, উহা কেবল ডার্বিন-তত্ত্ব নহে ; কেবল তত্ত্ব নহে । লেসিঙ্কের লেওকুন যেমন ভাবোন্মোহ, তেমনই একটা ভাবের ধারা ধরিয়া উহাতে দ্বীপের—মাতৃদেহ—উন্মোহ-স্তর-বিন্যাস দেখান হইয়াছে । সে তত্ত্বের ব্যাখ্যায় এখনও সময় আইসে নাই, সে তত্ত্ব বুঝিবার আগ্রহও এখনও বাঙ্গালার কাব্যানুগোচর নব্য দৃষ্টিগোচর হয় না । কাজেই সে কথা লইয়া আলোচনার বা বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই ।

[ সাহিত্য, ১৩১৯ ]



# মহাকবি মধুসূদন

স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন রবিবার বেলা দুইটার সময়ে আলিপুরের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মধুসূদন ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে ‘সমাজ-দর্পণ’ নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—‘দুঃখের বিষয় এই, আমরা মাইকেলের অশৌচ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কারণ, ওরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ জাত্যন্তর ও সমাজচ্যুত হইতে হইবে। ..... হা মাইকেল, তোমার অস্ত্যেষ্টির সময়ে তোমার নিকটে গিয়া তোমার আত্মীয়গণ রোদন করিতে পারিল না! তুমি পরের মত বিদেশী মোচছগণের হস্তে মস্তক প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছ! তুমি কবরে যাইবার সময়ে বিজাতীয়েরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিল, আমরা সজলনয়নে দূর হইতেই কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, নিকটে যাইবার ইচ্ছা করিলেও মাইতে পারিলাম না। হিন্দু ধর্মের পারে গমন করিয়া তুমি যেন সমুদ্র-পারবর্তী জনের ন্যায় বহুদূরবর্তী হইয়া পড়িলে।’

‘সমাজ-দর্পণ’র এই খেদে তখনকার বাঙ্গালার ছবি প্রতিকলিত হইয়াছে। মাইকেলের প্রুতি বাঙ্গালীর মনের ভাবও প্রুতিবিধিত হইয়াছে। আত্মরক্ষাকল্পে আত্মস্ব, অতিসাবধান, স্বধর্মনিষ্ঠ, পরধর্মভীরু সেকালের বাঙ্গালী মধুসূদনকে জাতির মহাকবি বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, মধুসূদনের প্রুতিভার পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও ‘স্বধর্ম নিধনং শ্রেয়ঃ’ ও ‘পরধর্মো ভয়াবহঃ’ হিন্দুর সমাজস্থিতির এই দুই পরস্পর-সাপেক্ষ মূলমন্ত্র, কাল-প্রবাহে প্রুতিহত হইয়াও, সমাজে সমুজ্জ্বল ছিল। তাই মাইকেলের প্রুতিভায় মুগ্ধ হিন্দু, জাতীয় কবিকে ‘আপনার হ’তে আপনার’ বলিয়া ভাবিয়াও, ‘সমুদ্রপারবর্তী জনের ন্যায় বহুদূরবর্তী’ বিবেচনা করিয়া দূরে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমাজ-শাসন-নিয়ন্ত্রিত হিন্দুর শুদ্ধা তখন বাহিরে বিকশিত হয় নাই;—কিন্তু হিন্দু ঋষ্টান মধুসূদনের জন্য কাঁদিয়াছিল—তাঁহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়াছিল।

তাঁহার পর বহু বর্ষ অতীত-সাগরে মিশিয়াছে। সমাজের সে দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন বাঙ্গালী অকুণ্ঠিতচিত্তে সমাধিক্ষেত্রে অন্যধর্মাবলম্বীর শবের অনুসরণ করে; গির্জায় বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে। সে-কাল বিধানে শৃঙ্খলিত ছিল, এ-কাল মুক্ত। এ-কালে দাঁড়াইয়া সে-কালের বিচার করিলে অনেক কথা বুঝা যায়।

পরধর্মপ্রাপ্ত, স্ব-সমাজচ্যুত পরসমাজভুক্ত মাইকেল, সর্বপ্রকারে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন-পরিধির বহির্ভূত হইয়াও, কোন্ ওণে, কোন্ অধিকারে, কিগের প্রভাবে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, আজ তাহা ভাবিয়া দেখিলে লাভ আছে। ব্যথিত পিতার মত যে হিন্দু সমাজ, বুকুটি কুটিলমুখে উরগম্ভত অঙ্গুলীর ন্যায় স্বধর্মত্যাগী মধুসূদনকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন কোন্ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া





সেই ক্রুদ্ধ সমাজের রুদ্ধ-দ্বার ভাঙিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া গরুড়ের মত সমগ্র জাতির প্রেমামৃত হরণ করিয়াছিলেন ?

ইহা ভাবিয়া দেখিবার কথা, বুঝিয়া দেখিবার কথা।

কবি মধুসূদন বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন রঙ্গ দান করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার নামে বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে, ধন্য হইতেছে। কিন্তু কাব্য, কবিতা ও কবিত্বই তাহার কারণ নয়। যে গুণে-কাব্য, কবিতা ও কবিত্ব অমর হয়, যে ধর্মে কাব্য, কবিতা ও কবিত্ব পবিত্র, সার্থক ও ধন্য হয়, মাইকেল সেই ধর্মের অধিকারী ছিলেন।

সমবেদনা ও সহানুভূতিই কবির জীবন সার্থক করে। মাইকেল সেই সমবেদনা ও সহানুভূতির উৎস ছিলেন।

আজন্ম বিদেশী তন্ত্রে শিক্ষিত, বিজাতীয় ধর্মে দীক্ষিত, বিদেশের ভাষায়, চিন্তায়, ভাবে, সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হইয়াও মধুসূদন স্বদেশী তন্ত্র বিস্মৃত হন নাই। স্বদেশের ভাষায়, ভাবে তাঁহার—ঐশ্বর্য অনুরাগ নয়—সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। সেই সহানুভূতি ও সমবেদনার সঙ্গমে দেশবাৎসল্যের স্বর্গীয় কল্লার সহস্র দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কল্লারের সৌন্দর্য্যে, যৌরভে বাঙ্গালার সাহিত্য ও সমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল! মমতা-বুদ্ধির ‘চোখের জলের বাঁধন দিয়ে’ মাইকেল বাঙ্গালীকে ‘মায়াডোরে বাঁধিয়াছিলেন।’

যৌবনে উন্মার্গ গামী, দেশপুত্র নব-ভাবের আকস্মিক দীপ্তিচ্ছটায় অন্ধ মধুসূদন পর-ধর্মের আশ্রয়-ভিক্ষা করিয়াছিলেন।—তাঁহার উত্তর-জীবন দেখিয়া বোধ হয়, গত-জীবনের মোহ শেষ-জীবনে ছিল না। পরধর্মাশ্রিত মাইকেল স্বধর্ম-নন্দনের কল্পতরু পূরণ হইতে মেঘনাদ, তিলোত্তমা, বুজাঙ্গনা চয়ন করিয়াছিলেন; চতুর্দশপদী কবিতায় বাঙ্গালার ভাব, ভাষা ও মহাপুরুষগণের পূজা করিয়াছিলেন; কৃষ্ণকুমারী ও শশিষ্ঠায় ইতিহাসের ও পুরাণের ছবি আঁকিয়াছিলেন; বুড়ো শালিক ধরিয়া রঙ্গ করিয়াছিলেন; ‘একেই কি বলে সভ্যতা’য় কলঙ্কের কালী দিয়া বানরের বিজ্ঞপ-চিত্র টানিয়া ‘চিন্তা করিয়া’ বলিয়াছিলেন,—‘বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা নাহেবদের মতন সভ্য হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ-মাংস খেয়ে চলাচলি কল্পেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?’

ইহা আত্ম-বিশ্লেষণের ফল কি না, সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা মাইকেলের সরলতা ও অকপটতার পরিচায়ক, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

মাইকেলের ‘আত্মবিলোপে’ তীব্র অনুশোচনার ও গভীর হতাশার আন্তি ও অভিব্যক্তি দেখিয়া চোখে জল আসে :—

“আশার ছলনে তুলি                      কি ফল লভিনু, হায়,  
তাই ভাবি মনে।”

পর-ধর্ম-গৃহণেও কি সে ‘আশার ছলন’ ছিল না?



মাইকেল বিদেশী সাহিত্যের সৌখীন উদ্যান হইতে স্বদেশী সাহিত্যের মনোজ্ঞ মালক্ষে ফিরিয়াছিলেন। পর-তন্ত্রে স্বপ্ন সিংহ সহসা জাগিয়া স্ব-তন্ত্রের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। তাই তিনি মাতৃভাষাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

“হে বদ্র ! ভাঙারে তব বিবিধ রতন,  
তা গবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,  
পরধনলোভে মত্ত, করিণু বমণ  
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।  
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি,—  
অনিদ্রায় অনাহারে, গাঁপি কায়, মন,  
মজিনু বিকল তপে অবরোধে বরি ;—  
কেলিনু শৈবালে, তুলি কমল-কানন।  
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক’য়ে দিলা পরে,—  
'ওরে বাছা ! মাতৃ-কোমে রতনের রাজি,  
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?  
মা ফিরি, অজ্ঞান তুই, মা রে ফিরি ঘরে !'  
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে  
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।”

এমন স্বপ্ন ক’ জনের ভাগ্যে ঘটে ? এমন ভাবে পরদেশ-মুক্ত ভিক্ষুক-জীবন পদদলিত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া মাতৃভাষারূপ মণিজালে পূর্ণ খনির অক্ষয় ভাঙারে নুতন হীরা, মাণিক, মতি চালিয়া দিবার সৌভাগ্য কয় জন লাভ করে ?

আবার ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভারসেলস্ নগরে প্রবাসী মাইকেল ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র ‘সমাপ্তে’ আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন—

“—নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে  
শৈশবে, অবোধ আমি, ডাকিলা যৌবনে ;  
(যদিও অধম পুত্র—মা কি তুলে তারে ?)  
এবে ইন্দ্রপুত্র ছাড়ি যাই দূর বনে !”

ইহাও কি মহাকবির আত্মবিস্মৃতির পর উদ্বোধনের পরিচায়ক নহে ? মোহের ফল বিস্মৃতি ;—তাহার পর স্বপ্ন ও জাগরণ। মাইকেলের চিত্ত-নির্বাণের ‘স্বপ্নভঙ্গ’ কি সুন্দর !

পুত্রিতার বরপুত্র মধুসূদন স্বদেশের বৈভবে আব্রহেলা করিয়া, পরধনলোভে মত্ত হইয়া, পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, ‘অবরোধে বরিয়া’ বহুদিন ‘বিকল তপে’ মজিয়া ছিলেন ; নিরাশ হইয়াছিলেন।” কিন্তু অনিদ্রায়, অনাহারে, ‘সুখ পরিহরি’ রত্নের অনুঘটন করিলে, বরোধের ধ্যান করিলে, সাধকের ‘তপ’ নিষ্ফল হয় না। বাঙ্গালার কুল-লক্ষ্মী মাইকেলের সাধনায় পুগনু হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে পর-তন্ত্র ছাড়িয়া স্ব-তন্ত্র আশ্রয় করিবার ইচ্ছিত করিয়াছিলেন। মাইকেল সংক্ষিপ্ত



জীবনে কুল-লক্ষ্মীর ইঙ্গিত যথাসম্ভব পালন করিয়া গিয়াছেন। আজ — পর-  
তন্ত্র, পর-ভাব-মত্ত, আত্মবিস্মৃত, মাতৃভূমির বৈতবে বঞ্চিত, স্ব-তন্ত্রের ঐশ্বর্য্যে  
অন্ধ বাঙ্গালী! আত্ম-অনুেষণ জীবনের সার কর। ‘অবরণো বসি’ মানব-জীবন  
সাধক—সফল—চরিতার্থ হয় না। প্রতিভাশালী পুরুষসিংহ মাইকেল পর-পথের  
পথিক হইয়া অনুশোচনায় মথিত হইয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত্তকবির অভিজ্ঞতার মহাকল  
আজ তোমার। স্মরণ কর আত্মগৌরব, বর্জন কর ‘পরদেশে’ ভিক্ষাবৃত্তি, বরণ  
কর আত্ম-শক্তি। ‘নান্যঃ পন্থা বিদ্যাতে অয়নায়’।

স্বদেশী তন্ত্রে শুদ্ধাই দেশভক্তি। দেশভক্তি সোনার পাথর-বাটী নয়।  
মাইকেলের বঙ্গভূমির প্রতি সম্ভাষণ দেশ-তন্ত্রের পুথন গান—দেশভক্তির পুথন  
উচ্ছাস—স্বদেশী কবির পুথন স্বাক্ষর। মাইকেলের বঙ্গ-স্তোত্র সৌন্দর্য্য-  
পুষ্পের গুচ্ছ নয়। সে গান—মিনতি—প্রার্থনা—মার কাছে আদুরে ছেলের  
আব্দার। তাহাতে বাঁচিবার সাধ আছে, কামনা আছে। বাঙ্গালী, জাতীয় কবির  
‘কামনা’ পাঠ কর :—

“স্মৃতিতে মনের সাধ,  
ঘটে যদি পরমাদ,  
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।  
পুর্ব্বাসে দৈবের বশে  
জীবিতারা যদি ধসে  
এ দেহ-আকাশ হ’তে, নাহি খেদ তাহে।  
জন্মিলে মরিতে হবে,  
অমর কে কোথা কবে?  
চির-স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে?  
কিন্তু যদি রাখ মনে,  
নাহি না উরি শমনে—  
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে।  
সেই ধন্য নবকুলে,  
লোকে যারে নাহি ভুলে,  
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্ব জন।  
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,  
যাচিল যে তব কাছে  
হেন অমরতা, আমি, কহ গো শ্যামা জনাদে।  
তবে যদি দয়া কর,  
ভুল দেয়, গুণ ধর,  
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে।  
কৃটি যেন স্মৃতি-জলে  
মানসে, না, যথা ফলে,  
মধুময় তামরস, কি বসন্তে, কি শরদে।”



মাইকেল 'নূতন মানা গাঁথিয়া,' গোড়জন-সুখাবহ 'মধুচক্র রচিয়া' বহুদিন নশ্বর সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। আজ বিরোধ, বিদ্বেষ ও ঐহিক সুখ-দুঃখের অতীত মহাকবি মধুসূদনের স্মৃতি সপূর্ণাঙ্গ করিতেছে,—'কীর্তির্যস্য স জীবতি।' মধুসূদন বাদ্রালীর মানসে, স্মৃতি-জলে, কি বসন্তে কি শরদে, মধুময় তামরসের মত দিব্য-শ্রীমণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া আছেন। নিন্দকের—পরকীর্তিদ্বেষী পুণ্ড্রভের—সাম্প্রদায়িক নিন্দার ঝড়ে সে তামরস ঝরে নাই, ঝরিবে না।

যে মধুসূদন 'স্বর্গ, মর্ত, পাতাল—ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণা ও পদার্থসূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত' করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাব্য ও কবিত্বের বিশ্লেষণ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তাই আজ তাঁহার কাব্য ও কবিত্বের মূলমন্ত্র স্মরণ করিতেছি। মধুসূদন দেশবৎসল। 'সূত্র' তাঁহার স্মৃতি-পট হইতে কপোতাক্ষের ছবি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই:—

‘জুড়াই এ কাল আমি ভ্রান্তির ছলনে।  
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-জলে,  
কিন্তু এ মেহের তৃণা নিটে কার জলে?  
দুঃখ-স্রোতরূপী তুমি জন্যভূমি-স্থনে।’

—দেশমাতার প্রতি পুত্র-ভক্তির এমন সুন্দর ছবি, দেশাত্মবোধের এমন মমতাপূর্ণ অভিব্যক্তি বাদ্রালা সাহিত্যে আর আছে কি?

মাইকেল মহানুভূতি ও সমবেদনার উৎস, এবং তাহাই মাইকেলের বিশেষত্ব, পূর্ব তাহা বলিয়াছি। মাইকেল উদার, অকুতোভয়, সমবেদনার নিবিচার। বীর কবি বীরের ভক্ত। ব্যথিতের বেদনায় কবির প্রাণ কাঁদে। স্বর্গে, মর্তে, পাতালে মধুসূদনের মমতার অমৃতনদী বহিয়া যায়।

আদি-কবি বাল্মীকি হইতে লঙ্কর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সকল কবিই অযোধ্যার রাজ-বংশের সহিত সমবেদনা ও মহানুভূতির স্রষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সোনার লঙ্কা ছারখার হইল, রাবণের বংশ গেল; এ জন্য ভারতের কোনও কবির চিত্ত বেদনায় চঞ্চল হয় নাই,—কেহ এক বিন্দু অশ্রুজলে সে শোচনীয় নিয়তির বিধানকে স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু মাইকেল রাবণ-পরিবারেও সমবেদনা ও মহানুভূতির অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের বীরত্বে মুগ্ধ না হয়, এমন বাদ্রালী কে আছে? পুণ্ড্রভের দুঃখে বিগলিত না হয়, এমন পাষণ্ড কে আছে? যুগযুগান্তর-সঞ্চিত বিরাগের হিমাচলকে যিনি সমবেদনার অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার শক্তির গভীরতার পরিমাণ কে করিবে?

মাইকেল শুধু বীররসের কবি নন, তিনি করুণরসেও সিদ্ধহস্ত। মাইকেলের সমবেদনা, মহানুভূতি ও করুণার বাদ্রালার মরুক্ষেত্র স্নিগ্ধ হউক।



মাইকেলের দুইটি উপদেশ যেন বাঙ্গালীর মনে যুগযুগান্তর দেদীপ্যমান থাকে।  
'তিলোত্তমা-সত্তবে' মধুসূদনের নিয়াকারা দূতী বলিয়াছেন—

'বাত-ভেদে কয় আজি মানব দুর্জয়।'

তুমি সু-জয় মানব বাঙ্গালী! ইহা স্মরণ রাখিও।

মেঘনাদবধের মষ্ট সর্গ বাঙ্গালীর জীবন-বেদ হউক। অরিন্দম, কব্বুরকুলগর্ব,  
মেঘনাদ রাঘবের দাস বিভীষণকে যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর মনে  
আগুণের অঙ্করে লিখিয়া দাও। আর—

—শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি  
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি  
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ; পর পর সদা।'

আজ মধুসূদনের স্মরণে বাঙ্গালার গগনে-পবনে এই 'লাখ কথার এক কথা'  
ছড়াইয়া দাও! প্রত্যেক বাঙ্গালীর—ভারতবাসীর হৃদয়ে এই কথাটি কথা যেন গাঁথা  
থাকে। তা যদি থাকে, তাহা হইলে এ দেশে মধুসূদনের জন্ম সার্থক। তা যদি  
না হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালায় মধুসূদনের আবির্ভাব নিষ্ফল।

[সাহিত্য, ১৩২৩.]

## কুন্তিবাস

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পর কালিদাস আবার সেই রাম-চরিতেরই  
পুনরায় বর্ণনা করিলেন। রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশও শ্লোক-  
বদ্ধ মহাকাব্য। কালিদাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতে রামায়ণ ভারতের সকল  
সমাজে কীৰ্ত্তিত, গীত, অধীত ও ভক্তি-পূর্বক শ্রুত হইত। তথাপি কালিদাসের  
রঘুবংশ ভারতের বিখ্যাত সাদরে গৃহণ করিলেন। ইহার হেতু কি? একান্ত  
সুপরিচিত ও সর্বদা শ্রুত বৃত্তান্তের পুনঃ পঠন-পাঠনে এই যে আগুহ, এত যে আদর,  
তাহার একমাত্র কারণ কালিদাসের প্রাজ্ঞতা ভাষা ও ভাবের সুস্পষ্টতা। যদি ভাষা  
এত সুন্দরী এবং সম্পদশালিনী না হইত, তাহা হইলে কেবল ভাবের তরঙ্গলীলায়  
বা কল্পনার ক্রীড়ায় কালিদাসের কাব্য সুধী-সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না।



কল্পনা-বিষয়ে বাল্যীকির সহিত কালিদাসের তুলনা করিতে পুরাণ পাওয়া বৃথা। তবুও যে, কালিদাস এত পুসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার স্বমধুর ভাষা। কালিদাস ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণ উপজীব্য করিয়া কাব্যাদি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গুণ জন-সমাজে রঘুবংশাদির ন্যায় আদৃত হয় নাই। এই আদর-অনাদরের একমাত্র কারণ, ভাষাগত প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতা। কালিদাস এমন মনোহারিণী ভাষায় তদীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন যে, যে কোন সময়ে, যে কোন সমাজের লোকেই তাহা পাঠ করুক না কেন, বিমুগ্ধ হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনই ভাষাগত উৎকর্ষের নিমিত্ত কৃতিবাসের শ্রেষ্ঠতা। যে ভাষা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য গঠিত, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত, ধনী-নির্বন, পণ্ডিত-মূর্খ, ইহার একতরের উদ্দেশ্যে যে ভাষা গুণিত, তাহা কদাচ স্থায়ী বা সর্ব-বাদিসম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। সেক্ষেপ ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থাদি কখনও কাল-জয়ী হইতে পারে না। তাহাকে পুস্ত ভাষা বলা যায় না। তাদৃশী ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদি কালের তরঙ্গে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যায়; অল্প কালনধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায়-নিবিশেষে, সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা-ধমনী-কৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে “আমার” বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন, —শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্বন, পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলে সমানভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস সর্বকালানুযায়িনী, সর্বতো-গামিনী, সর্বতোব্যাপিনী ভাষায় গুণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই যেমন তাঁহার কাব্য সকল সম্প্রদায়ে সকল সময়ে, সকলের প্রিয়, মহাকবি কৃতিবাসও তদীয় অনবদ্য রামায়ণ-কাব্য সেইরূপ সর্বতোগামিনী ও সর্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রামায়ণ এত পুসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল নহে, বা ভাবও সুস্পষ্ট নহে, সেই সকল কাব্যের প্রভাব সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষা ও ভাব উভয় সম্পদে সম্পন্ন বলিয়াই কৃতিবাসের রামায়ণ কাল-জয়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃতিবাস—এই দুই জন একই কারণে অনরত লাভ করিয়াছেন।

কৃতিবাসের পরে আরও অনেক কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি রামায়ণ রচনা-পূর্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের দ্বারা যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, এ কথা নিঃসন্দোহে বলা কঠিন।

কৃতিবাস এবং তৎপরবর্তী অনেকে একই রামায়ণ-অবলম্বনে কাব্য রচনা করিলেন, কিন্তু কৃতিবাসের কাব্য আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়, সকল সমাজের আদরণীয় হইল, ইহার পুস্ত কারণ কি?



কৃত্তিবাস মহাশি বাল্মীকির রামায়ণমাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্য লিখেন নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোষ্ঠীবন্ধনে—সর্বত্রই নানা ভাবে ও নানা আকারে রাম-বিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে—কৃত্তিবাসের বহু পূর্ব হইতে—চলিয়া আসিতেছিল। ফলতঃ, লোক-মুখে স্ত্রী-পুরুষ-সমাজে রাম-সীতার কথা কীৰ্ত্তিত হইত, এখনও হইতেছে। কৃত্তিবাস তদীয় গ্রন্থ-রচনায় এই লোকপরিম্পরাগত গাথার অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল অনুবাদে বা মহাশি-চিত্রিত আলেক্ষ্যাবলীর পুনশ্চিত্রণেই যদি কৃত্তিবাস রত থাকিতেন, তাহা হইলে তদীয় কাব্য এত পুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার পরবর্ত্তী রামায়ণ-লেখকগণের অনেকের গ্রন্থে কৃত্তিবাসের ন্যায় মৌলিকতা নাই। অধিকাংশ স্থানই অনুবাদমাত্রে পর্য্যবসিত। কোনও রামায়ণকার স্বকীয় করণার চক্ষুর বৈদ্যুতী প্রভায় গ্রন্থে কচিৎ ভাস্বর করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরস্পরেই আবার করণার দৈন্যে গ্রন্থের শ্রীহানি ঘটিয়াছে। এই স্থলে কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিচন্দ্র তাঁহার রচিত রামায়ণে অঙ্গদ-বায়বীর নামে যে অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, যাহা আজ কৃত্তিবাসের বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশ গৃহে গৃহে আদৃত, সেই অধ্যায়টি বাস্তবিকই অনেকটা কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই অনুপাতে কবিচন্দ্রের গ্রন্থের অপরাংশসমূহ গ্রহণ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত অনেকে যেমন দু'একটি মনোহারিনী কবিতা রচনা করিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও করিতেন,—যে কবিতাগুলি “উদ্ভট” আখ্যায় জন-সমাজে প্রচারিত, কিন্তু ঐ উদ্ভট-কর্ত্তাদের কোনও বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ পাওয়া যায় না, চক্ষুর করণার ক্ষণিক অনুগ্রহে মাত্র দু'চারিটি হৃদয়াকর্ষিনী কবিতাতেই তাঁহাদের কবিত্ব পরিগম্য—তদ্রূপ অন্যান্য রামায়ণকারগণের অনেকেরই দু'একটি, বা কাহারও দু'চারিটি রসভাবপূর্ণ অধ্যায়-রচনার পরই কবিত্বের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে কবিতার উচ্ছলিত তরঙ্গলীলা একমাত্র কৃত্তিবাসেই পরিদৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাস জানিতেন যে, তাঁহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত, কিরূপ আলেক্ষ্যে তাঁহাদের নয়ন-রঞ্জন হইবে। কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্বদা এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই, কেবল বাল্মীকির আদর্শ তাঁহার উপজীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজন-মত অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সংকলন করিয়াছেন।

অনেক কাব্য কবির সমসাময়িক সমাজের কচিৎ এবং ছায়ার অনুসরণে নিম্নিত হওয়ায়, সেই নিয়মিত সমাজে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে কবির কাব্য, যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে পরিপূর্ণ, সে কবির কাব্য ততই



অল্পকালস্থায়ী। অন্যান্য অনুবাদকরণের রামায়ণ-গ্রন্থের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহাদের রামায়ণের যে যে অধ্যায়গুলি এই প্রকার কোন বিশেষভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণভাবে, সকল সময়ের অনুগত করিয়া লিখিত, সেই সেই অধ্যায়গুলির মর্যাদা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তরূপে কবিচন্দ্রের “অঙ্গদ-রায়বার” ও রবীন্দ্রনাথ গোস্বামীর “রাম-রসায়নে” অশোকবন-বর্ণন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, সরল ভাষা এবং সুস্পষ্ট ভাব—এই দুই দুর্লভ সম্পদে কৃতিবাসের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায় তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। যে কবি যত অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জল ভাষায় মনের ভাবরাশি তদীয় সমাজের সমক্ষে অতি সুস্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন। কৃতিবাস সেইটি অতি উদ্ভবরূপে পারিতেন বলিয়াই তাঁহার রামায়ণ অপরাপর রামায়ণ অপেক্ষা ভাবুক-সমাজের, অথবা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সমাজেরই এত প্রিয় হইয়াছে।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এই গুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃতিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকালে হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়। মহাকবি ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তররামচরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য-সহকারে রঙ ফলাইয়া সুন্দর মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়াছেন—যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবান্বিত হইয়াছে—কৃতিবাসও সেইরূপ মহামি-কৃত আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণ-সংযোগ-পূর্ব্বক, সেই সেই চিত্র বঙ্গীয় সমাজের অনুগত-ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন—অলঙ্কারের গুরু ভারে বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্রিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্বত্র এক ভাবে, ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর তর করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দৃষ্ট হয় নাই, বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অনর্থ্যাদা ঘটে নাই। অন্যান্য কবি অপেক্ষা তদীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য চিত্রনৈপুণ্যের সম্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণীসঙ্গমের ন্যায় পবিত্র ও সকলের উপভোগ্য হইয়াছে।

কৃতিবাসের রামায়ণ-রচনার প্রায় এক শত বৎসর পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব অবির্ভূত হন। চৈতন্যের আবির্ভাবের এবং তদীয় প্রেম-বন্যায় বঙ্গদেশে প্রাবৃত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হস্তলিখিত কোন কৃতিবাসী রামায়ণের পুস্তক এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদি কখনও পাওয়া যায়, তবে তখন কৃতিবাসের প্রসিদ্ধ অংশগুলির



সমাধানের উপায় অনেকটা সহজ হইবে। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বঙ্গদেশে যে ভক্তির যোত, প্রেমের বান ডাকিয়াছিল, পরবর্তী কালের রামায়ণসমূহে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যে সময়ে যে ভাব দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দেশকে বিভোর করিয়া ফেলে, সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্যাদিতেও সেই ভাবের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র সাহিত্যিককে “তন্মাবভাবিত” করিয়া তোলে। তাই পরবর্তী কালের কৃতিবাসে আমরা কি বীর কি করুণ সকল রসেই নদীয়ার ভক্তির তরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। লিপিকারগণ, সুবিধা পাইলেই, রামের স্থলে শ্যাম করিয়াছেন। পরিবর্তিত কৃতিবাসের অনেক অনাবশ্যক স্থলে অত্যন্ত বৈষ্ণবী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। কৃতিবাসের স্বকপোলকল্পিত বীরবাহু, পরবর্তী কালের বৈষ্ণব লিপিকারগণের কৃপায় দীনাতিদীন বৈষ্ণবসেবকগণের ন্যায়, কন্নয়ুগল জুড়িয়া ধরণীতে লুটায়। তুলনীতলায় মৃত্তিকায় অঙ্গরাগ করিয়া বৈষ্ণব যেমন “শ্রীবাসের আচ্ছিনায়” মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রণাম করেন, সেইরূপ রাক্ষসগণও কপিগণকে গল-লগ্নীবাসে প্রণাম করে। এইরূপ অনেক স্থলেই বৈষ্ণবীয় কোমলতার ও দীনতার চ্যম দেখিতে পাই। এ সমস্তই চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর কৃতিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সংক্রামক রোগের পরিচয় আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের দু’একটি স্থল ঈশ্বর পরিবর্তনপূর্বক, কোথাও বা প্রমাণসূত্রটিকে বদলাইয়া, সমগ্র গ্রন্থখানিকে “হিন্দু” করিয়া তোলা হইয়াছে। কৃতিবাসে পাঠবৈষম্যের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। বহুকাল পূর্বের হস্তলিখিত যে সকল পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত বর্তমান কৃতিবাসের ত মিল নাই-ই, এমন কি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীধানপুরের মিশনারিগণের দ্বারা প্রথম যে “কৃতিবাস” মুদ্রিত হয়, তাহার সহিতও বর্তমান কৃতিবাসের অনেক স্থলে আদৌ মিল নাই। মিশনারিদের পুস্তকে যেখানে আছে—

“পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি।  
দস্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি ॥”

সেই স্থানে পরবর্তী কালের সংশোধিত বটতলার সংস্করণে আছে—

“রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।  
দস্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি ॥”

পরবর্তী কালে ভাষার পরিমার্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আদিকবি কৃতিবাসও “পরিমার্জিত” হইয়াছেন। কবির কাব্য পরিষ্কৃত করিতে যাইয়া সংশোধকগণ আবর্জনারাশির দ্বারা কৃতিবাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ব্যাপারের মূলে আর একটি সত্য নিহিত আছে। আমাদের দেশে যখন যে কোনও নুতন জিনিষের আবির্ভাব হইয়াছে, আমরা তাহাকে ধীরে ধীরে পুরাতনের সহিত মিশাইয়া নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করিয়া “আপন” করিয়া লইয়াছি। আমাদের এই adaptability আছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম, আমাদের সাহিত্য এখনও টিকিয়া আছে।



শাক্ত এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লিপিকারগণের কল্যাণে কৃতিবাসের অনেক স্থলে যেমন শাক্ত-প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তেমনই বৈষ্ণব-প্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতি হইতে অনেক মনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়া আনিয়া কৃতিবাসে জুড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক নূতন কবিতার প্রণয়ন করিয়া কৃতিবাসের গ্রন্থে পুরিয়া দিয়া স্ব স্ব আত্মাভিমানের পূজা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কৃতিবাস হইতে শত শত স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—ঐতিহাসিকের সে কার্য্য হইতে আমি বিরত হওয়াই সম্ভব মনে করি।

রামায়ণী কথার আশ্রয়ে কালিদাস, ভবভূতি, রঘুবংশ, উত্তররামচরিত রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে স্থানে যেরূপ প্রয়োজন, তাঁহারা নূতন মূর্ত্তিও গঠন করিয়াছেন। কবির কল্পনা বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান। সেই গতত চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোন নিদ্রিষ্টে পথে, কোন পূর্ব-নিদ্রিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবি-কৃত সৃষ্টিতে অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্তন দেখিতে পাই। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহাধি-কৃত পথ কল্পনার দোহে অল্প-বিস্তর ছাড়িয়া অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃতিবাসও সেইরূপ নিজ-কল্পনার দ্বারা অনেক আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া তাঁহার গ্রন্থ মনোজ্ঞ করিয়াছেন, সর্বত্রই বাণীকির অনুসরণ করেন নাই। বীরবাহু, তরঙ্গীসেন প্রভৃতির সৃষ্টি তাঁহার চরম কল্পনা-শক্তির উৎকর্ষ ধাপন করিতেছে। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাগীত করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাসচঞ্চলা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুমারমণ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে কত নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিচালিত বা ব্রূ-কম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃতিবাসের স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনা কোনও নিদ্রিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও-বা নূতন পথে—যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে। তরঙ্গীসেন, বীরবাহু প্রভৃতির সৃষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।

কৃতিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও প্রতিফলনে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে, বিপণির পণ্যকুটারে, চাষার আশার কষিক্ষেত্রে—সর্বত্র—কীৰ্ত্তিত হইতেছে। আজ আর

“দক্ষিণে পশ্চিমে যার গঙ্গা তরঙ্গিণী”—

সে “ফুলিয়া” নাই, সে “ফুলিয়া”য় কৃতিবাসের সেই “চাপিয়া বসতি”র চিহ্নও নাই; কিন্তু সেই ফুলিয়া-পণ্ডিতের মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কার এখনও বাদ্যালীর “কানের ভিতর দিয়া মরমে” প্ৰবেশ করিতেছে, বাদ্যালীকে উন্মত্ত করিয়া—বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।



কৃতিবাসের এই সার্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতকগুলি কারণও দেখা যায়। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্বর। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রৌপদী, শিবী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, ঔশীনরী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেরই চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারতবাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে—প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃতিবাস এ রহস্য বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝিতেন যে, নিশীথে নিস্তরঙ্গ রজনীর সৌম্যানুষ্টি যাহার চিত্তকে অভিভূত, বা অনুভূতির বিমল কর ধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ ঐ নৈশ নীরবতার মাধুর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারে না; সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনভূমির প্রাজ্ঞল মূর্ত্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ, সে কখনও সাক্ষা সুষমার পবিত্র আলোখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই,—প্রাণ অকৃপণভাবে চালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূরপর্য্যন্ত। কৃতিবাস অকৃপণভাবে আপনার প্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে চালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কিছুই ছিল না; সমস্তই ঐ চরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার কবিতার কোথায়ও কোনরূপ বাধা দেখিতে পাই না—সর্বত্রই সমান এবং অপ্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয়, যেন এক সময়ে, এক স্থানে বসিয়া, অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, মহাকবি তাঁহার সাধের রামায়ণ-গান গাহিয়াছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার শ্রোতৃবর্গও মজিয়াছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে, যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবেন ততদিন করিবেও।

তুমি যখন অমৃতভেদী শুব্রতুম্বারশীর্ষ হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায় তখন যদি তোমার হৃদয়ে কোন প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরট শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরট হিমাচলের প্রশান্ত ভাবের, প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয়ত তোমার কল্পনা-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পারিবে। অন্যথা তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের ঐ গম্ভীর-মাধুর্য্যের বর্ণন করিবে? তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত নিজেকে মিশাইতে না পার, “তদ্ভাবভাবিত” করিতে না পার, তবে কদাচ তদ্বেশীয় ও তৎকালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার দ্বারা তদ্বেশবাসিগণের হৃদয় কদাচ বিদ্যমান হইতে পারে না। দীপক রাগের সময়ে তুমি বেহাগ পুরবীতে আলাপ করিলে, তাহা কখনও জন্মিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির স্বর্থ হয় না, বরং পীড়াই জন্মে। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, স্বর্গপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে, এ তত্ত্ব মহাকবি কৃতিবাস বুঝিতেন। এ দেশের লোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, কোন্ উপকরণ অধিক, তাহা কৃতিবাস জানিতেন, তাই তাঁহার দেশবাসিগণের হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি তদীয় কল্পনাঃ মোহন বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার, বসন্তের পিক-ঝঙ্কারের ন্যায়,



বঙ্গবাসীদিগকে বিনুগ্ধ—একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই হিগাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কৃষ্ণিবাস একই মস্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান, কতটুকু চান, তোমার বীণার কোন্ তার স্পর্শ করিলে তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হইবে, তাহার “কানের ভিতর দিয়া মরনে পশিবে”—এ জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় কলাবিদ্যাভিগাম্য হও না কেন, তোমার লেখায় বা তোমার অঙ্কিত আলেক্ষ্যে তোমার সামাজিকবর্গের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না। তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে তোমার দেশবাসী সহৃদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাঁহাদের লেখাই কালজয়ী হয়, থাকিয়া যায়; আর যাহাদের এই জ্ঞান নাই, তাঁহাদের লেখা ছিন্ন তুমারের ন্যায় অতি অল্পকালমধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। আর্য্য রামায়ণ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ইতর-ভদ্র সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, ইহার কারণ হইল পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান। কৃষ্ণিবাসের ঐ জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে দেশের অধিবাসীরা কি ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেন ও ভালবাসিতেন। তাই তিনি যদি কখনও সামান্য একটু গুন্ গুন্ করিয়া স্বরবিলাস করিয়াছেন, অমনই সেই গুন্ গুন্ ধ্বনি শতগুণে বদ্ধিত হইয়াই যেন তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিব্যসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শ্রান্ত পথিকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পথিক অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণময় দীর্ঘ দিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে, সেইরূপ প্রেমিক কবি কৃষ্ণিবাসের মোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত—আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে।

কবে কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্ব, তমসার তীরে “না নিষাদ” বলিয়া বাল্লীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে স্বরলহরী যেন বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইতেছে ও ভারতবাসীদের প্রাণে কেমন একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া দিতেছে; সেইরূপ কবে কোন্ দিন, কোন্ শুভমুহুর্ত্তে পতিতোদ্ধারিণীর তীরে বসিয়া, তাঁহারই কুলকুল গীতির সুরে সুর মিলাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়াছিলেন—আজ সে ফুলিয়া নাই, সে ভাগীরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সেই স্বপ্নময়, বৈশম্য তানের এখনও যেন শেষ নয় হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা—কিছুই





নাই, তবুও সেই রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারীর প্রাণে-প্রাণে  
গাঁথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও,—তদ্রূপ আজ সে ফুলিয়া নাই, সে জাহ্নবী  
নাই, সে কৃত্তিবাস নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাণী কদাচ  
বিস্মৃত হইবে না।

[ নারায়ণ, ১৩২৩ ]